অসুখ

ড: নজরুল ইসলাম

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৬০
মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদশিল্পী
সুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

সূচীপত্র

অসুখ

মোহাজির

মসলেম সবে দোকানের ঝাঁপটা খুলছিল। একটা শোরগোল কানে আসতে থমকে দাঁড়াল। শহরে দাঙ্গা লেগেছে। বাইরের লোক দেখলেই মারছে। বলছে, মোহাজির। মোহাজির শালোঁকে মার ডালো। মসলেমও মোহাজির। প্রাণের ভয়ে কেঁপে উঠল। ভয় চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। দেখল, একটা মস্ত মিছিল মোহাজির বস্তিটার দিকে এগিয়ে আসছে। সাপ দেখে লম্বা লাফ মেরে কোলাব্যাঙ যেমন পালায়, মসলেম তিন লাফে বস্তিতে ঢুকে পড়ল। মিছিলকে তার খুব ভয়। ছেচল্লিশ সালে এমনি একটা মিছিল কলকাতায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। তখন তার বয়স অল্প। সবে কলকাতায় এসেছে।

পাটনা জেলার বাঁকিপুরে তাদের বাড়ি ছিল। বাবা ঠাকুর রমেশ সিং-এর বাড়িতে মাহিন্দারি করত। সে চায়নি ছেলে মাহিন্দার হোক। তাই ঝোগড়ুভাইয়ার সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঝোগড়ু জ্যাকশন জুট-মিলে কুলির কাজ করত। মসলেমকেও বলে-কয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। নিজের কাছেই রেখেছিল। আলাদা একটা বাড়িও খোঁজ করছিল। কিন্তু মসলেম মুসলমান। হিন্দু বস্তিতে বাড়ি পাওয়া গেল না। মসলেমকে মুসলমান বস্তিতে চেষ্টা করতে বলল। বাড়ি খুঁজতে গিয়েই সে সালামের পাল্লায় পড়ল।

সালাম বলল, 'বাড়ি পেয়ে যাবি। তুই লিগে যোগ দে।'

'লিগে ?'

'হ্যাঁ, মুসলিম লিগে।'

মুসলিম লিগ ব্যাপারটা কী তা মসলেম ঠিক বুঝত না। গ্রামে ঠাকুর রমেশ সিং কংগ্রেস। তার মাহিন্দার হওয়ায় তার বাবাও কংগ্রেস। অতএব সেও কংগ্রেস।

সালাম বলল, 'কংগ্রেস তো হিন্দু জমিদার আর শিল্পপতিদের পাটি রে। হিন্দু কংগ্রেসের কাছ থেকে মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই আশা করতে পারে না।

'ইংরেজরা আমাদের কাছ থেকে হিন্দুস্থানের বাদশাহি কেড়ে নিয়েছে। এখন হিন্দুরা একজোট হয়ে সেই বাদশাহি কায়েম করতে চাইছে। আমরা যদি সাবধান না হই তাহলে মুসলমানের সমূহ সর্বনাশ।

'মনে রাখবি, নাশারা খ্রিস্টানরা যেমন আমাদের শত্রু, তেমনি প্রতিটি হিন্দুও আমাদের শত্রু।'

হিন্দু বলতেই তার সর্বপ্রথম ঝোগড়ু কাকার কথা মনে পড়ে। তাকে কিছুতেই শত্রু বলে মনে হয় না। গ্রামের ঠাকুর রমেশ সিং আর মিলের পে-মাস্টার পরেশ পাল থেকে ম্যানেজার মণিরাম গাঙ্গুলি—সকলকেই তার শত্রু মনে হয়। সকলেই কম পয়সা দিয়ে বেশি খাটিয়ে নিতে চায়। কিন্তু ঝোগড়ুকাকা কিছুতেই শত্রু নয়। সালামের কথা সে মানতে পারে না। কিন্তু যেদিন সে পরেশ পালকে ঝোগড়ুকাকার সঙ্গে ফিসফাস করে কথা বলতে শুনল, সেদিন তার সব ধারণা ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

সালামের কাছে শুনেছিল, পরেশ পাল হিন্দু মহাসভা করে। হিন্দু মহাসভা কী ?

'তুই একদম বুদ্ধু আছিস। হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের পাটি, যেমন আমাদের মুসলিম লিগ।'

সালামের হিসেবটা বেশ সহজ মনে হয়েছিল। পরেশ পালের কথা শুনে সেটা সত্যও

মনে হল। পরেশ পাল বলল, 'তুমি যে এত গান্ধী-গান্ধী কর, তোমার গান্ধীর কংগ্রেস তো ক্যাবিনেট মিশন-প্ল্যানের টোপ গিলে বসে আছে। প্ল্যান কার্যকর হলে যে অর্ধেক হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে যাবে, সে হুঁশ আছে ? তোমার গান্ধী দেখছি, দেশটা মুসলমানদের হাতেই তুলে দিতে চায় !'

'ও ক্যায়সে ?'

'তুম বুদ্ধু হো। আভি পুছতে হো, ও ক্যায়সে ! দেখতা নেহি, এখানে বাংলায় মুসলিম লিগ দশ বছর ধরে রাজত্ব করছে। বি. এ-এম. এ পাস করেও ভদ্রলোকের ছেলেরা চাকরি পাচ্ছে না। আর নেড়ের বাচ্চায় অফিস-আদালত ভরে যাচ্ছে ! গান্ধীর উপযুক্ত শিষ্যের মত তুমিও একটা এনে জুটিয়েছ। আভি ভাগাও উসকো।'

'লেকিন.... ।'

'লেকিন-মেকিন কুছ নেহি। হিন্দুস্থানে হিন্দুদের শাসন চলবে। মুসলমানদের এখানে থাকতে হলে হিন্দুদের শাসন মেনে থাকতে হবে। হিন্দুদের শাসন না মানতে চাইলে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। চল, উধার চল। তুমহারে সাথ আওর বাতচিত করনা হ্যায়।

পরেশ পাল ঝোগড়ুকাক্কাকে নিয়ে চলে গেল। মসলেম ছুটল সালামের কাছে। সব শুনে সালাম বলল, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম। হিন্দুদের বিশ্বাস নেই। হিন্দুদের সংগঠন কংগ্রেসকেও বিশ্বাস করা যায় না। কী করে করা যাবে ? কংগ্রেস প্রথমে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে নিল।'

'হ্যাঁ, পরেশ পালও ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের কথা বলছিল।'

'বলবে না ? সব হিন্দুদের ষড়যন্ত্র। দু'দিন না যেতেই জওহরলাল নেহরু বলতে শুরু করেছে, আমরা শুধু গণপরিষদে যোগ দিতে রাজি হয়েছি। প্রয়োজন হলে অন্য শর্তের পরিবর্তন হতেই পারে।

'ক্ষমতায় আসার আগেই যদি এরকম করে, তা হলে মুসলমানরা হিন্দু কংগ্রেসের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কী আশা করতে পারে ? সেই জন্যই লিগ কাউন্সিলের মিটিঙে জিন্নাসাহেব জোর দিয়ে বলেছেন, মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি, পাকিস্তান ছাড়া আমরা আর কোনও শর্তেই রাজি হব না।'

আলোচনার মাঝে শমসের এসে বসেছিল। শমসের কংগ্রেস সমর্থক এবং মৌলানা আজাদের ভক্ত। সে ফোড়ন কাটল, 'কিন্তু মৌলানা আজাদ যে বলছেন, দেশবিভাগ হিন্দু, মুসলমান কারো পক্ষেই মঙ্গলকব হবে না।'

'হিন্দুদের ঐ ধামাধরাটার কথা আর বলিস নে। কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে মনে করেছিল, হিন্দুরা ওকে নেতা বলে মেনে নিয়েছে। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করে হিন্দু-মুসলমানের মঙ্গল করতে গিয়েছিল। জওহরলাল সভাপতি হয়েই মুখে কেমন জুতোটি মারল ? সামান্যতম সম্মানবোধ থাকলে কংগ্রেস ছেড়ে লিগে যোগ দিত।'

'যেমন তোর জিন্না দিয়েছে ?'

'নিশ্চয় ! মুসলমান নেতাদের মধ্যে একমাত্র জিন্নাই মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। সেই জন্যই ডাইরেক্ট অ্যাকশানের ডাক দিয়েছেন। কাল ষোলই আগস্ট ময়দানে মিটিং আছে। আমরা মিছিল করে যাব। মসলেম, তুইও আমাদের সাথে যোগ দিবি !'

'কাল যে আমার ডে-ডিউটি ?'

'কাল ডিউটি-ফিউটি হবে না। মিটিং মিছিল করার জন্য লিগ সরকার সরকারি অফিস ছুটি করে দিয়েছে। মিলও চলবে না। কাল আমরা সব বন্ধ করে দেব। তুই শুধু আমাদের

সাথে থাকবি।'

মসলেমের তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সালামের মুখের ওপর আজ আর 'না' বলতে পারল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের দিন মুসলিম লিগের মিছিলে সে যোগ দিল।

সালাম এসে স্লোগান দিতে লাগল, 'নারায়ে তকবির।' সকলে যোগ করল, 'আল্লাহ আকবর।' মিছিলের মধ্যে একটা উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ল। মুহুর্মুহু স্লোগান উঠতে লাগল, 'মুসলিম লিগ—জিন্দাবাদ, লড়কে লেঙ্গে—পাকিস্তান, লেকর রহেঙ্গে—পাকিস্তান।' স্লোগানে স্লোগানে মিছিল এগিয়ে চলল।

মানিকতলা মোড়ের কাছে আসতে একটা শোরগোল পড়ে গেল। মসলেম দেখল,লোক এলোপাথাড়ি ছুটছে। এ ওকে মারছে। সে তাকে তাড়া করছে। দুমদাম করে শব্দ হচ্ছে। আশপাশের দোকান থেকে ধোঁয়া উঠছে। অবস্থা খারাপ বুঝে মসলেম পিছনের দিকে ছুটতে লাগল।

হাঁপাতে হাঁপাতে বস্তিতে ফিরে দেখল, ঝোগড়ুকাকার চোখেমুখে উদ্বেগ। তার মুখে সব ঘটনা শুনে সে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। অস্ফুটে বলে ফেলল, 'এ তুনে কেয়া কিয়া ? পরেশ পাল কি বাতকোহি সাচ্চি সাবিত কর দিয়া ?' মসলেমের বাক্‌রহিত হয়ে গেল। ঝোগড়ুর মুখেও আর কথা সরল না। কী ঘটতে চলেছে সেটা ভেবে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

দ্বিগুণ আতঙ্ক নিয়ে রাতের আঁধার নামল। কিছু মানুষের চাপা ফিসফাস কানে এল। সন্তর্পণে ফেলা তাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা ক্রমশ তাদের ঘরের দিকে এগিয়ে এল। মসলেম ভয়ে ঝোগড়ুকে জড়িয়ে ধরল। ঘরের দরজা ভেঙে ওরা ঢুকে পড়ল। একজন মসলেমকে টেনে ফেলে দিল। অন্যজন ভেঙিয়ে বলল, 'হিন্দুস্থানে শুধু হিন্দুদের শাসন চলবে ?' পাশে থেকে আর একজন তলোয়ারের এক কোপে ঝোগড়ুকাকার গলাটা কেটে দিল। মসলেম চিৎকার করে উঠতে তার মুখে দুই লাথি মারল। বলল, 'এটাকেও শেষ করে দে।' তলোয়ারওয়ালা লোকটা এগিয়ে আসার আগেই সে উঠে পড়ি কি মরি করে ছুটতে লাগল। গিয়ে উঠল মুসলমান বস্তিতে সালামের বাড়িতে। কিন্তু এ কী ? উঠোনে সালামের বুড়ো বাবার লাশ পড়ে। বাড়িতে আর কেউ নেই। সে আর কিছু ভাবতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন জ্ঞান ফিরল তখন অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নেতারা একসঙ্গে শান্তি-মিছিল করছে। শামসের বলল, 'যা ঘটেছে তা সভ্য মানুষের সমাজে কল্পনা করা যায় না। মানুষ কুকুর-বিড়ালের মত তাড়া করে মানুষকে মারছে। অনেক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও বেশি ! মাটির বুকে জাহান্নাম নেমে এসেছে।'

মসলেম ঠিক করল, এ জাহান্নামে সে আর থাকবে না। গঙ্গা পার হয়ে ট্রেনে উঠে বসল। ট্রেন থেকে নেমে দেখল, ওখানেও দাঙ্গা লেগে গেছে। জি আর পি ফাঁড়ির সামনে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তারা বলল, 'এদিকের অবস্থা ভাল না মশাই। প্রাণ বাঁচাতে চাইলে এখান থেকে কেটে পড়ুন।'

কিন্তু সে কোথায় কেটে পড়বে ? কলকাতায়ও দাঙ্গা চলছে। আর বাড়ির লোকদের কী হয়েছে তা না জেনেই বা সে যায় কী করে ? বৃদ্ধ বাবা-মা ছিল। মাত্র কয়েক মাস আগে সে বিয়ে করেছে। নববধূ দিলরুবাও তাদের বাড়িতেই ছিল। মসলেম আর ভাবতে পারল না। প্ল্যাটফর্মের ওপরই বসে পড়ল। এক প্রহর রাতে মনস্থির করে ফেলল, সে গ্রামে যাবে। নির্জন-নিস্তব্ধ পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। সড়ক দিয়ে না গিয়ে মাঠের আলপথ, ধরল।

বাড়ির ভিটেতে পৌঁছে সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না। যেখানে তাদের বাড়ি ছিল সেখানে ছাই ছাড়া আর কিছু নেই। শ্মশানের মত শুনশান। শুধু কতকগুলো ঝিঁ

ঝিঁ একটানা ডেকে প্রাণের স্পন্দন জানান দিচ্ছে। যেন কোন নরকে এসে পৌঁছেছে। ওদিক থেকে হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল। মসলেম ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে লাগল। প্রাণের ভয়ে খুব জোরে দৌড়চ্ছিল। আলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ছায়ামূর্তিটা এসে তার গলা টিপে ধরল, 'তুনে হামারা লড়কা কো মার ডালা, বহুকো বলাৎকার কিয়া। ম্যায় তুঝে ছোড়ুঙ্গা নেহি।'

কণ্ঠস্বর শুনে মসলেম বুঝল, লোকটি তার বাবা ইসলাম। সে নিজের পরিচয় দিল। বাবা তাকে চিনতে পারল না। সে আপন মনে বিলাপ করে যেতে লাগল। তা থেকে মসলেম বুঝল, দাঙ্গাকারীরা তার মাকে আর ভাইকে বাড়িতেই হত্যা করে ঘরের আগুনে নিক্ষেপ করে। দিলরুবাকে তুলে নিয়ে যায়। দুদিন পরে নদীর ধারে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার বাবা সেই সময় মনিবের বাড়িতে ছিল। তাই প্রাণে বেঁচে গেছে। কিন্তু চোখের সামনে এতগুলো পৈশাচিক হত্যার ধাক্কা সামলাতে পারেনি। উন্মাদ হয়ে গেছে। উন্মাদ বাবাকে নিয়ে সে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল।

কলকাতায় এসে বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করল। কিন্তু বাঁচাতে পারল না। মাসখানেক বিলাপ করার পর বাবা মারা গেল। মিল খুলল। মসলেম কাজে যোগ দিল। শমসের তাকে একটা বাড়িও ঠিক করে দিল।

শমসের অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শান্তি ফিরে এল না। ছোটখাট ঝুট-ঝামেলা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকল। বছর না ঘুরতেই দেশ ভাগ হয়ে গেল। সালাম আফসোস করতে লাগল, 'র‍্যাডক্লিফের বেইমানির জন্যই কলকাতা পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়ে গেল।' বেগতিক বুঝে সে রাতারাতি কংগ্রেসে ভিড়ে গেল। যারা ওরকম রঙ বদলাতে পারল না, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে পাকিস্তান রওনা হল।

মসলেম যে মুসলিম লিগের মিছিলে গিয়েছিল, সেকথা গোপন থাকেনি। একদিন পরেশ পালের লোকজন এসে ভেংচি কেটে বলল, 'খুব যে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান করছিলে! তা এখনও হিন্দুস্থানে বসে কেন? মানে মানে কেটে পড়। না হলে লাশ পড়ে যাবে।'

মসলেম ঘাবড়ে গেল। কেন যে মরতে মিছিলে গিয়েছিল? সে শমসেরের কাছে গেল। শমসের আশ্বাস দিল। কিন্তু মসলেম ভরসা পেল না। এও মনে হল, মুসলমানরা যখন দেশ ভাগ করে পাকিস্তান নিয়েছে, তার পাকিস্তানে চলে যাওয়াই উচিত! টিনের বাক্সে জামা-কাপড়গুলো ভরে নিয়ে সে শিয়ালদায় ঢাকার ট্রেনে উঠে বসল। স্থান হল বিহারি বস্তিতে। আদমজি জুট মিলে একটা কাজও জুটে গেল। সেই কুলির কাজ।

কথায় বলে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। মসলেম পাকিস্তানে এসেও কুলি হল। তবে যারা লেখাপড়া শিখে এসেছিল তারা ভাল কাজ পেল। সালামের ভাইটা এম এ পাস করে ওপারে মাস্টারিও পাচ্ছিল না। এখানে এসে কলেজের প্রফেসার হয়েছে। এখানেই বিয়ে করেছে। সুখে শান্তিতে আছে।

শান্তিতে মসলেমও ছিল। কিন্তু আবার মিছিলের অশান্তি শুরু হল। পাকিস্তানের শাসনকর্তারা নাকি শুধুমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চাইছে। মসলেম এতে কিছু অন্যায় দেখে না। উর্দু তো মুসলমানদেরই ভাষা। বাঙালিরা এটা মানতে চায় না। তারা বলছে, আমাদের ভাষা বাংলা। বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ওরা বলে, করব না। এরা বলে, ছাড়ব না। ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল বের হয়। গুলি চলে। সালাম-বরকত-রফিক-জাব্বার শহিদ হয়। দলে দলে লোক এসে সে মিছিলে যোগ দেয়। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে উদাত্ত সঙ্গীত,

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি ?

ভুলতে পারে না। দীর্ঘ সংগ্রামের পর সরকার তাদের মুখের ভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিরোধ মেটে না। শুরু হয় মুক্তি সংগ্রাম—একাত্তর সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

একটানা ধর্মঘট চলছে—অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ। মসলেম বস্তিতে বসে ছিল। একটা মিলিটারি ট্রাক এসে দাঁড়াল। কয়েকজন সামরিক পোশাক পরা লোক নেমে এল। তাদের হাতে বেয়োনেট লাগানো রাইফেল। একজনের হাতে খাপ খোলা পিস্তল। সঙ্গে কয়েকজন সাদা পোশাক পরা লোকও। তারা বস্তির সব লোককে ডেকে জড়ো করল। পিস্তল-হাতে লোকটিকে দেখিয়ে একজন বলল, 'ইনি ক্যাপ্টেন আসলাম। ঢাকা ক্যান্টনমেণ্ট থেকে আসছেন।' ক্যাপ্টেন-আসলাম প্রথম বক্তাকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ইনি রাজাকর বাহিনীর গ্রুপ কমান্ডার।' 'গ্রুপ কমান্ডার সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। ক্যাপ্টেন আসলাম বলে চলল, 'হিন্দুস্তানি দুশমন পাকিস্তানকে নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছে। কুছ গাদ্দারোঁ নে উসকে সাথ হাত মিলিয়েছে। পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। আজ দোপহর মে ঈদগাহ ময়দান মে মিটিং আছে। আপলোগ জুলুশ মে সামিল হোকে উহাঁ যায়েঙ্গে।'

সাদা পোশাকের লোকেরা বস্তির লোকগুলিকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিতে লাগল। মসলেম প্রমাদ গুণল। সে সুড়সুড় করে সরে পড়ছিল। একজন সেনা তাকে পাকড়াও করে পশ্চাদ্দেশে রাইফেলের বাট দিয়ে এমন জোরে আঘাত করল যে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ক্যাপ্টেন আসলাম এগিয়ে এসে উপদেশ দিতে লাগল, 'হামভি মুসলমান, তুম ভি মুসলমান। মুসলমানোঁ কো লিয়ে হি পাকিস্তান। বহুত শরম কি বাত, তুমি ভাগ রহে হো। মুসলমান দুশমনোঁ সে ডরতে নেহি। ডিউটি সে ভি ভাগতে নেহি।' দুজন লোক তাকে তুলে মিছিলে দাঁড় করিয়ে দিল।

গ্রুপ কমান্ডার মিছিলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে শুরু করল, 'নারায়ে তকবির'। মসলেমরা ধুয়ো দিল, 'আল্লাহ আকবর।' মিছিল চলতে শুরু করল। পিছনে পিছনে মিলিটারি ট্রাক। গ্রুপ কমান্ডার স্লোগান দিতে থাকল, 'পাকিস্তান— জিন্দাবাদ, হিন্দুস্থানি এজেণ্ট—দূর হটো।'

সন্ধ্যায় সবে তারা বস্তিতে ফিরেছে। একদল লোক এসে তর্জন-গর্জন শুরু করল। তারা নিজেদের পরিচয় না দিলেও মসলেম বুঝল, এরা মুক্তি ফৌজ। মুক্তি ফৌজের নেতা গর্জে উঠল, 'বিশ্বাসঘাতক! খান সেনাদের সঙ্গে মিছিল করতে গিয়েছে।'

'আমরা যেতে চাইনি। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

'জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কই আমাদের তো নিয়ে যায়নি। কিছু বুঝি না, না ? আমাদেরই বুকের ওপর বসে আমাদেরই সঙ্গে বেইমানি আমরা সহ্য করব না। আর কটা দিন সবুর কর। খান সেনাদের সঙ্গে তোমাদেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

এক তরফা তর্জন-গর্জন করে ওরা চলে গেল। আতঙ্কিত মসলেমরা দিন গুণতে লাগল। সাতই মার্চ মুজিবর রহমান যে ভাষণ দিলেন তাতে খানিকটা আশার আলো ছিল, 'এই বাংলায়—হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর—'।

তিনি দায়িত্ব দিয়েই খালাস। যাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল তাদের ওপর এর কোনও প্রভাব পড়ল না। ষোলই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তির ওপর

আক্রমণ শুরু হল। প্রথম দিন তাঁবুতে আগুন ধরল। পরের দিন বোমা ফাটল। মসলেম প্রাণের ভয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি দিল। স্থান হল করাচির মোহাজির বস্তিতে।

আবার অনিশ্চয়তা। আবার অনাহার নিত্যসঙ্গী। বয়সও হয়েছে। শরীর দুর্বল। অনেক ঘোরাঘুরি করেও একটা কাজ জোগাড় করতে পারল না। বাধ্য হয়ে রাস্তার পাশে একটা পানের দোকান করল। তাতে কোনরকমে পেটের খাবারটা হয়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সময় চলতে লাগল।

এরই মধ্যে আবারও মিছিল। সিন্ধি-মোহাজির হাঙ্গামা। কে একজন মোহাজির নাকি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। সিন্ধিরা তাকে সরাতে চায়। মোহাজিররা তাদের চাকরি বাকরিতে ভাগ বসাচ্ছে। তাদের তাড়াতে চায়। মোহাজিররাও রুখে দাঁড়িয়েছে। বেঁধে গেছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। 'হামভি মুসলমান—তুমভি মুসলমান' উবে গেছে। এমন শুধু 'হাম সিন্ধি তুম মোহাজির হো। মোহাজির লোগ দূর হটো।'

বস্তির মধ্যে দাঁড়িয়েই মসলেম তাকিয়ে দেখল, মিছিলটা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। মিছিলের লোকেরা চিৎকার করে বলছে, 'দেশ নেহি হ্যায় বাহারসে আনেওয়ালোঁ কা। দেশ হ্যায় দেশওয়ালোঁ কা।' বলছে, মোহাজির লোগ দূর হটো—আভি হটো জলদি হটো।'

মসলেম ভাবছে, 'হটব তো বটে, কিন্তু কোথায় হটব ? হিন্দুস্থানে ছিলাম মুসলমান। পাকিস্তানে এলাম। পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হল। বাংলাদেশে হলাম অবাঙালি। সে দেশ ছাড়তে হল। এখানে হয়েছি মোহাজির। এ দেশও আমার নয়। তা হলে আমি কোথায় যাব ? আমার দেশ কোনটা ?

কথায় কথায় মসলেম তার মনের ভাবটা মজফ্ফর খানের কাছে প্রকাশ করে ফেলল। মজফ্ফর খান সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খানের ভাবশিষ্য। আর দেশ বিভাগের ঘোর বিরোধী। সে রাগত স্বরে বলল, 'ইয়ে সওয়াল তো বুরবক জিন্না সে পুছনে থা। কমবখত জলদি মরকে বাঁচ গিয়া। কমবখত কো ইয়ে মালুম নেহি থা কি টুকরা টুকরা করনে সে নেহি, প্যার সে দেশ আপনা হোতা হ্যায়।'

ফাঁদ

বিক্রয় কর অফিসে জাল চালান জমা দেওয়ার অভিযোগে বাদল দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে সদরে নিয়ে এসেছে। সাবিরের মুখে খবরটা শুনেই উকিল তবারক হোসেনের ভিতরটা কেঁপে উঠল। বাদলের ব্যবসার খাতা সে-ই সারে। বাদলের হয়ে রিটার্ন-চালান সে-ই জমা দেয়। বাদল নিশ্চয় পুলিশকে এতক্ষণ এসব কথা বলে দিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে তার বাড়িতে পুলিশ আসতে পারে। এখন বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না। জুতো পরে সে বেরিয়ে পড়ল। স্ত্রী রেহানা এসে জিজ্ঞেস করল, 'অবেলায় কোথায় বেরুচ্ছ?' তবারক জানে, সে তপনের কাছে যাবে। তপন তাদের অ্যাসোসিয়েশানের কার্যনির্বাহী কমিনিটর সদস্য। তপনের সঙ্গে একটু ভাব রাখা দরকার। কিন্তু রেহানাকে সেকথা বলল না। পুলিস খুঁজতে এলে যদি রেহানা সত্যি কথা বলে দেয়! রেহানাকে বলল, 'একটু সাদিকের ওখানে যাব।'

তপনের চেম্বারে এসেও তবারকের অস্বস্তি গেল না। পুলিসকে বিশ্বাস নেই। কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানেও চলে আসতে পারে। কেউ আসছে দেখলেই তবারকের মনে হয়, পুলিসের লোক। এমনি একটানা অস্বস্তির মধ্যে বেলা গড়িয়ে গেল। সাঁঝের আঁধার একটু ঘন হলে তবারক একটা টরচ নিয়ে নিজের চেম্বারে গেল। আলো জ্বালাল না। ড্রয়ার খুলে রবার স্ট্যাম্পের প্যাকেটটা তুলে নিল। দরজা বন্ধ করে চুপি চুপি চেম্বারের পিছনে এল। বেড়ার পাশে খুরপিটা ছিল। সেটা দিয়ে ফুল-বাগানের এক কোণে একটা গর্ত করল। গর্তের মধ্যে প্যাকেটটা পুঁতে দিয়ে পরিপাটি করে মাটিটা চৌরুশ করল। একটা গোলাপের টব ওখানে বসিয়ে দিল। অন্য তিন কোণেও অনুরূপ তিনটি টব বসিয়ে দিল। এবার সে একটু স্বস্তি পেল। নিজের মনে মনেই যুক্তির প্যাঁচ কষল, জাল হয়েছে তো কি হয়েছে? কি প্রমাণ আছে যে সে জাল করেছে? ব্যাঙ্কের লোকেরাও তো করতে পারে!

খানিক রাতে সন্তর্পণে সে বাড়ি ফিরল। না পুলিশ আসে নি। সাবির খবর দিল, বাদল কোর্ট থেকে জামিনে ছাড়া পেয়েছে। তবারক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাদলের সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে। জানতে হবে পুলিসকে সে কী কী বলেছে। রেহানা খাবার দিল, সে জুত করে খেতে পারল না। রেহানা টিভি চালাল। তার বিরক্তিকর মনে হল। টিভিটা বন্ধ করতে বলল। রাতে বিছানাতে শুয়েও তার অস্বস্তি কাটল না। রেহানা বারকয়েক তার কাছে ঘন হয়ে এল। একবার তার কোমরের কাছে হাতও দিল। তবারক সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারল না। রেহানা আশা ছেড়ে দিয়ে ঘুমোতে লাগল। তবারকের ঘুম এল না। সবসময় মনে হতে লাগল, এই বুঝি পুলিস এসে দরজায় ঘা দেবে। সে দরজার দিকে কান খাড়া করে পড়ে থাকল।

রাতের আঁধার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দূরের মসজিদ থেকে ফজরের আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। এমন সময়ে দরজায় সত্যিই কে টোকা দিল। তবারক বুঝল, পুলিস এসেছে। সে কাঁপ মেরে পড়ে থাকল। রেহানা উঠে বসল। আরেকবার শব্দ হতেই তবারককে ঠেলে তুলল। পুলিস এলে কিভাবে সে পালাবে তবারক সেই কথাই ভাবছিল। সে চোখ মোছার ভান করতে করতে বলল, 'দেখছি, তবে পুলিস হলে দরজা খুলব না।' রেহানা আশ্চর্য হয়ে গেল, 'আমাদের বাড়িতে পুলিস আসবে কেন?' তবারক নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'না,

মানে, অনেক সময় ডাকাতেরাও পুলিসের বেশ ধরে আসে কিনা, তাই বলছিলাম ?'

'কচু বলছিলে ! ডাকাতরা তোমার মতো বুদ্ধু কিনা সকাল বেলায় এসে তোমার দরজায় খট্‌খটাবে ! আর তোমার বাড়িতে কি ধন-দৌলত আছে শুনি, যে ডাকাত আসবে ? এই বুদ্ধি নিয়ে যে তুমি কি ভাবে উকিল হলে !'

রাতের চাপা রাগটা রেহানা এইভাবেই প্রকাশ করল। তবারক এর কোনো উত্তর না দিয়ে, দরজার চোখ দিয়ে কে এসেছে দেখতে গেল। দরজা খুলে বলল, 'রেহানা, বাদলদা এসেছেন। দু কাপ চা করো।' বাদল বলল, 'চা খাব না। আমি খুব বিপদে পড়ে আসছি। আমাকে পুলিস অ্যারেস্ট করেছিল, শুনেছেন নিশ্চয়।'

— 'না তো, কেন অ্যারেস্ট করেছিল ?'

— 'ওরা বলছে, সেল্‌স ট্যাক্‌স অফিসে আমার নামে যে চালান জমা পড়েছে তা জাল। ব্যাঙ্কে ঐ চালানের টাকা জমা পড়ে নি।'

— 'হতেই পারে না। আমি নিজে হাতে ফরম পূরণ করে টাকা জমা দিয়েছি। তবে ব্যাঙ্কের লোকেরা যদি কিছু গণ্ডগোল করে থাকে তাহলে অন্য কথা।'

— 'আমিও তাই বলেছি। তবে ওরা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছে।'

— 'সে তো ভালো কথা। কবে যেতে হবে বলুন।'

— 'আজ গেলেই ভালো হয়।'

— 'কিন্তু আজ তো রবিবার। ব্যাঙ্ক বন্ধ। ব্যাঙ্কের লোকেরা কোনোরকম গণ্ডগোল করেছে কি না সেটা তো খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। আর আমার চেমবার থেকে সব চালানগুলোও নিতে হবে। আমি আগামীকাল সব ঠিক করে রাখব। আপনি মঙ্গলবার সকালে আসুন। একসঙ্গে চলে যাব।'

— 'এখন তাহলে আমি আসছি। নমস্কার।'

বাদল চলে যেতে তবারক তার স্কুটার বের করল। রেহানাকে বলল, 'অনেক দিন লালপুল যাই নি। আগেরবার আসার সময় মার শরীরটা খুব খারাপ দেখে এসেছিলাম। একবার দেখে আসি।'

— 'তুমি আগে বলো নি তো। তাহলে আমিও একবার নীলগোলা থেকে ঘুরে আসতাম। পীরপুর থেকে মীনাকে দেখতে আসার কথা ছিল, কি হল জানি নে।'

— 'সম্ভব হলে আমি নীলগোলা হয়ে আসব।'

তবারক স্কুটারে স্টার্ট দিতে দিতে বলল।

রাস্তায় যেতে যেতে ভাবল, কলকাতা গেলে হয়। হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে নিলে আর কোনো ভয় থাকে না। মামলা হতে পারে। কিন্তু দেশের যা আইন তাতে দোষীর কখনও সাজা হয় না। কিন্তু যদি জামিনের আবেদন গ্রাহ্য না হয় ? তার গিল্টি ফিলিং প্রমাণিত হয়ে যাবে। আবার জামিনও হবে না। আর কটা কেসে সে জামিন নেবে ? সে তো অনেকের খাতা সারে, অনেকের হয়ে টাকা জমা দেয়। তার থেকে থানা লেভেলে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারলেই ভালো হয়। তার ভগ্নীপতি কাশেমের কথা মনে পড়ল। কালাম দারোগার সাথে তার ছোটোবেলা থেকে ভাব। কাশেমের কথা নিশ্চয় সে ফেলতে পারবে না।

লালপুল থেকে পরের দিনই সে কাশেমের বাড়ি কালুপুর গেল। কাশেম তখন বাড়ি ছিল না। তার বোন সুরাইয়া তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। তবারকের কানে কিছুই ঢুকছিল না। কোনোরকমে হাঁ হুঁ দিয়ে যাচ্ছিল। কাশেম আসতেই সে তাকে নিয়ে একটু তফাতে গেল। সব শুনে কাশেম জানতে চাইল, 'কিন্তু এরকম হল কেন ?' তবারক তৈরি হয়ে ছিল। সে

বলল, 'অন্যান্য উকিলদের সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা তো তুমি জানোই। আমার কাছে ক্লায়েণ্ট বেশি আসে বলে ওদের চোখ টাটায়। আর আমি হক কথা বলি বলে সেল্‌স ট্যাক্স অফিসের লোকেরাও আমার ওপর সন্তুষ্ট নয়। দুই পক্ষ ষড়যন্ত্র করে এটা করেছে।'

—'কিন্তু তাতে করে আপনার জমা দেওয়া চালান জাল হল কি করে?'

— 'বুঝতেই তো পারছ, সব কাজ তো আমি নিজে হাতে করি নে। দুজন মুহুরি আছে। ওরাই ব্যাঙ্কে টাকা পয়সা জমা দেয়। হয়ত ওদের সঙ্গে সাঁট করে জাল করেছে।'

— 'তাহলে ঠিক কে জাল করেছে বের করুন। না হলে আমি বললেও কোনো লাভ হবে না। কালামকে তো খুব ভালো করে চিনি। ও নিজে সন্তুষ্ট না হলে কোনো কথা শুনবে না।'

কাশেমের কথা তবারকের ভালো লাগল না। তার একটু কিছু হলেই তবারক ছুটে আসে। আর সে এত বড় একটা বিপদে পড়েছে, কাশেম তাকে সাহায্য করল না। পরের দিন সকালেই সে লালপুল ফিরে এল। কিন্তু আজ তো মঙ্গলবার। বাড়িতে এসে তাকে না পেয়ে বাদল এতক্ষণ পুলিসকে নিশ্চয় সব বলে দিয়েছে। এখানে থাকা ঠিক হবে না। সে স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বিকেলে তবারক নীলগোলায় তার শ্বশুরবাড়ি এসে দেখল, আতঙ্কিত রেহানা তার বাবার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলছে। তার মা, ভাই এবং বোনেরা তাকে ঘিরে ধরেছে। তবারককে দেখে তারা সরে দাঁড়াল। রেহানা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে বল তো! তুমি মাকে দেখে আসি বলে চলে এলে। আর ফেরার নামটি নেই। বাদলদা সকালে এসে ফিরে গেল। তারপর পুলিস তোমাকে খুঁজছে। আমার কথা বিশ্বাসই করছে না যে, বাড়িতে নেই।....' তার শ্বশুর এগিয়ে এসে বলল, 'মা ছেলেটা এল, একটু বসে থিতু হতে দাও। তারপর কি হয়েছে জানা যাবে। এরকম হয়েই থাকে। তুমি উকিলের বউ। তোমার অত বিচলিত হলে চলে?' শ্বশুরের কথা তবারকের খুব ভালো লাগল। এই প্রথম একটা লোক তার প্রতি সহানুভূতি দেখাল। সে সব কথা তাকে খুলে বলল।

তবারকের শ্বশুর তাজ মহাম্মদ ঝানু লোক। নীলগোলা বাজারে তার একটা মনিহারি দোকান আছে। কিন্তু তার আসল কাজ স্মাগলিং। স্মাগলিঙের দৌলতেই তার দোতলা বাড়ি। দুয়েকবার হাজতবাসও হয়েছে। থানা-পুলিস, আইন-আদালত সম্বন্ধে বিস্তর অভিজ্ঞতাও আছে। সব শুনে সে বলল, 'আগাম জামিন নিয়ে নিতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু এত হই-চই-এর মধ্যে কোর্টে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি কয়েক দিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। ব্যাপারটা একটু থিতিয়ে গেলেই জামিন নিয়ে নিও। তবে সব থেকে ভালো হত কালাম দারোগাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে। কিন্তু তোমার ভগ্নীপতি তো রাজি হচ্ছে না বলছ!'

রাতের বেলা সাবির এসে খবর দিল 'বাদলের অ্যারেস্ট হওয়ার কথা শুনে আরও অনেক ব্যবসায়ী থানায় এসে এজাহার দিয়েছে। আর সবাই এসে খাতা-পত্র ফেরত চাইছে। আমি গাপ্পি-তুপ্পি দিয়ে কোনোমতে ঠেকিয়ে রেখেছি। কিন্তু আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ওরা জোর করেই নিয়ে যাবে। আপনি না গেলে রক্ষে হবে না।' শুনে তবারকের বুকের মধ্যেটা কিরকম করে উঠল। কত সুন্দর প্র্যাক্‌টিস জমে ছিল। সব নষ্ট হয়ে যাবে।

সাবির সকালের বাসেই সদরে ফিরে গেল। তবারক দুদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে তৃতীয় দিনে কালুপুরে কাশেমের বাড়ি হাজির হল। নিজে কিছু না বলে বোন সুরাইয়াকে দিয়ে বলাল। স্ত্রীর অনুরোধেও কাশেম তবারকের জন্য কালাম দারোগার কাছে যেতে রাজি হল না। তবারক অসন্তুষ্ট চিত্তে লালপুলে তাদের বাড়িতে ফিরে এল। দুদিন বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে থেকেই সে আগাম জামিনের জন্যে হাইকোর্টে যাবে।

ভোর রাতে পুলিসে বাড়ি ঘিরে নিল। পুলিস পাছে বাড়ির ভিতর ঢুকে সব কিছু তছনছ করে, সেই ভয়ে তবারক বাইরে বেরিয়ে ধরা দিল। তার অসুস্থ মা হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল। ছোটো ভাইটা কি করবে বুঝতে না পেরে তার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। তবারক উকিলকে পুলিসে ধরতে এসেছে, সেকথা শুনে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। তবারক মুখ নিচু করে গিয়ে পুলিসের গাড়িতে উঠল। তবুও ভালো যে ঘটনাটা কালুপুরে হয় নি। তাহলে গাঁয়ের লোকের কাছে তার বোন সুরাইয়ার মাথাটা হেঁট হয়ে যেত। কিন্তু না, শেষ রক্ষে হয় নি। পুলিস অফিসারদের কথা শুনে মনে হল, কালুপুর, নীলগোলা, সদরে তার বাড়ি, চেম্বার—সম্ভাব্য সব জায়গাতেই পুলিস একসঙ্গে হানা দিয়েছে। তার মানে খিটকেলের আর কিছুই বাকি থাকল না। এর থেকে সারেন্ডার করলেই ভালো হত। এত লোক জানাজানি হত না। তবারক শেষ চেষ্টা করল, 'আপনারা কি আমাকে বেল দিতে পারেন না ?'

- 'না, নন বেলেবল্ সেকশন। আমরা বেল দিতে পারি নে।' রেইড-পার্টির নেতা সাব-ইনসপেকটরটি উত্তর দিল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

কালাম দারোগা তবারককে একটা চেয়ারে বসতে দিল। দুটো চালান দেখিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকার দুটো চালান। বাদল দাসের রিটার্নের সঙ্গে পঁচিশ তারিখে আপনি এই চালান জমা দিয়েছেন। বাদল দাসের কাছ থেকে যে আপনি দশ হাজার টাকা নিয়েছেন এবং পঁচিশ তারিখে তার রিটার্ন জমা দিয়েছেন তা আপনার লেখা এই চিঠি থেকেই প্রমাণিত হয়। আপনি বলতেই পারেন, "এই চিঠি আমার লেখা তার প্রমাণ কি ?" আপনার চেমবার থেকে সিজ করা আপনার হাতের লেখার সঙ্গে আপনার এ-চিঠি মিলিয়ে দেখেছি। হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টের ওপিনিয়নও নিয়েছি। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে আপনিই চালান জাল করেছেন। চালানের ওপর ব্যাঙ্কের লোকদের যেটা লেখার কথা ছিল সেটা আপনিই লিখেছেন। আপনার দুজন মুহুরিও আপনার হাতের লেখা আইডেনটিফাই করেছে। এরপরে চালান জাল করার জন্য যে সিলগুলি আপনি ব্যবহার করেছেন সেগুলি যদি আমাদের দেন ভালোই, না হলেও আপনার বিরুদ্ধে চার্জশিট হবে। এ ব্যাপারে আপনাব কিছু বলার আছে ?....আপনি উকিল মানুষ। সম্মানীয় ব্যক্তি। আপনি এরকম জঘন্য কাজ করলেন কেন ?' কেন করল, সেকথা যদি বলতে পারত, তাহলে তো সে অনেকটা হালকা বোধ করত।

গ্রামের ছেলে। তখন সে সবে ল পাস করে এসেছে। কোনো নামকরা উকিল তাকে জুনিয়র নিতে রাজি হল না। বারে নাম লিখিয়ে সে একা-একাই কোর্টে যাতাযাত করতে লাগল। সদরে একটা ঘরও ভাড়া নিল। কিন্তু মক্কেল পেল না। বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে সেল্স ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স অফিসেও ঘোরাঘুরি শুরু করল। ইনকাম ট্যাক্স অফিসে সে পাত্তা পেল না। সেল্স ট্যাক্স অফিসে দুয়েকটা মক্কেল জুটতে লাগল। কিন্তু মক্কেলদের কাজ সে করতে পারে না। সেল্স ট্যাক্স অফিসের এমনই রীতি, ঘুষ ছাড়া একটা ফরমও কেউ ইস্যু করতে চায় না। তবারক ঘুষ দেয় না। তার কাজও হয় না। পরের দিন সে মক্কেল তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তা দেখে বাণিজ্য কর পরিদর্শক জীবন মজুমদার একদিন তাকে ডেকে বলে, 'এই ভাবে চললে তো এখানে আপনি সুবিধা করতে পারবেন না। আপনি অফিসারদের সঙ্গে আগে রফা করুন। তারপর পার্টি ধরুন। পার্টির কাছ থেকে যা পাবেন অফিসারদের দিয়ে-থুয়েও আপনার ভালো থাকবে। না, সঙ্কোচের কিছু নেই। সকলেই এরকম করেন। চলুন আমাদের ইনচার্জ সি. টি. ও. প্রদীপ সেনের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।' জীবন মজুমদার তাকে বলতে গেলে জোর করেই বাণিজ্য কর অফিসারের

ঘরে নিয়ে যায়, 'স্যার, অ্যাডভোকেট তবারক হোসেন, স্যার। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা রেখেই প্র্যাকটিস করতে চান।' বাণিজ্য কর অফিসার প্রদীপ সেন চোখ তুলে তাকায়। তার চোখের তারায় লোভ ঝিলিক দিয়ে যায়। জীবন মজুমদারের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'তাহলে ওঁকে আমাদের অফিসের প্রসিডিওরটা একটু বুঝিয়ে বলে দিন, উয়িশ ইউ বেস্ট অফ লাক।'

জীবন মজুমদার তার টেবিলে এসে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল।

এক-একটা ঘটনা মানুষের জীবনের গতি সম্পূর্ণ বদলে দেয়। বাণিজ্যকর পরিদর্শক জীবন মজুমদারের পরামর্শ তবারকের জীবনকে বদলে দিয়েছিল। এর পর থেকে তার আর কোনো অসুবিধা হত না। সে যে কাজ নিয়ে যেত, তাই হয়ে যেত। মক্কেলরা খুশি হত। ক্রমে তার কাছে মক্কেল বাড়তে লাগল। ব্যবসায়ীরা এসব ফালতু কাজে সময় নষ্ট করতে চায় না। ঐ সময়টা ব্যবসায়ে লাগালে অনেক বেশি লাভ হবে। তারা তবারকের ওপর তাদের খাতা-পত্র লেখার ভারও দিল। ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার দায়িত্বও ছেড়ে দিল। তবারক আর একা পেরে ওঠে না। পার্ট টাইম দুজন মুহুরি ছাড়া সাবিরকে হোলটাইমার রাখল। সাবির ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে খাতা-পত্র টাকা পয়সা নিয়ে আসে। আবার ব্যাঙ্কে ট্যাক্সের টাকা জমা পড়লে চালানের কপি দিয়ে আসে। এতে ব্যবসায়ীদের আরও সুবিধা হয়। তার মক্কেলের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়।

এই সময় রেহানার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। রেহানার বাবা তাজ মহম্মদ তার মক্কেলের সংখ্যা দেখে ভেবেছিল, 'বোধ হয় তার জামাই শিশির মুখার্জী, সমীর চ্যাটার্জী বা ফজলে করিমকেও ছাড়িয়ে যাবে।' কিন্তু তার মেয়ে অল্প দিনেই বুঝতে পারে, মক্কেলের রমরমা হলে কি হয় ? পয়সার বেলায় কিছু নাই। কোনো রকমে খাওয়া পরাটা চলে। তাতেও টানাটানি।

বিয়ের সময় তার শ্বশুর তাকে টিভি, ফ্রিজ, স্কুটার সবই দিয়েছিল। কিন্তু ভাড়ার বাড়িটাই রেহানার পছন্দ নয়। তার শ্বশুর সহরে একখণ্ড জমিও কিনে দিয়েছে। কিন্তু তবারকের বাড়ি করার মতো টাকা নেই। রেহানার আবার খরচের হাত। তার নিত্য-নতুন শাড়ি চাই। স্নো-পাউডার-সেণ্ট না হলে চলে না। কিছু চেয়ে না পেলেই রেহানা তাকে ওকালতি ছেড়ে ব্যবসা করার পরামর্শ দেয়। এখনও একটা বাড়ি না করতে পারার জন্য খোঁটা দেয়। তবারকের অসহ্য লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই। মক্কেলদের কাছ থেকে যা পায় তার থেকে অফিসারদের দিয়ে, মুহুরিদের বেতন দেওয়ার পর খুব সামান্যই বাঁচে। সেকথা একদিন জীবন মজুমদারকে বলতে সে চোখ গোল করে তাকে কাছে বসায়।

জীবন মজুমদার গলা খাটো করে তবারককে বলে, 'আপনি ইচ্ছে করলেই অনেক টাকা রোজগার করতে পারেন।' তবারক আগ্রহ দেখায়, 'কী করে ?'

— 'এখন ডিলারদের ট্যাক্সের টাকা তো আপনিই ব্যাঙ্কে জমা দেন। ব্যাঙ্ক তার প্রমাণস্বরূপ আপনাকে চালান দেয়। রিটার্নের সঙ্গে চালানটা আপনি আমাদের কাছে জমা দেন।'

— 'হ্যাঁ সেরকমই তো নিয়ম।'

— 'নিয়ম সেরকমই। কিন্তু ধরুন, আপনি টাকাটা ব্যাঙ্কে না দিয়ে চালানটা যদি নিজেই তৈরি করে জমা-দেন, তাহলেই আপনার অনেক টাকা থেকে যায়।'

তার কথা শুনে তবারক চমকে ওঠে। জীবন আশ্বাস দেয়, 'ভয় পাবার কি আছে ? আমরা প্রকাশ না করলে তো আর কেউ জানতে পারবে না। আমাদেরকে একটা শেয়ার দিয়ে দেবেন। তাহলে শালা কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না। আরও অনেকেই তো ওরকম করে। কোনোদিন প্রকাশ পেয়েছে ?'

তবারকের লোভ হয়। কিন্তু ভয়ও করে। প্রথম দিন রাজি হতে পারে না। দ্বিতীয় দিনও না-হুঁ না-হুঁ করে। তৃতীয় দিন রাজি হয়ে যায়। জীবন মজুমদারের সঙ্গে কথা হয়, যত টাকার জাল চালান জমা পড়বে তার ফরটি পারসেণ্ট অফিসকে দিতে হবে।

তবারকের আয় এক ধাপে অনেক বেড়ে যায়। সে বাড়িটা শুরু করে। রেহানার জন্য ভিসিপি কেনে। বাড়িতে নতুন নতুন আসবাব আসে। রেহানার জন্য রং-বেরঙের শাড়ি। আর খুশি মতো হাত খরচ। রেহানা খুব খুশি হয়। কিন্তু অন্যান্য উকিলরা চটে যায়। এদিকে মাসখানেক পরেই জীবন মজুমদার প্যাঁচ কষে, 'প্রদীপবাবু বলছিলেন, ফটি পারসেণ্টে ঠিক হয় না। হিসেবটা আপনি ফিফটি-ফিফটি করে দেন।' তবারক অখুশি হয়। কিন্তু না করতে পারে না, না করলেই তার আয় এক ধাপে অনেক কমে যাবে। সে ফিফটি-ফিফটিতেই রাজি হয়ে যায়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মাস কয়েক পরে জীবন মজুমদার আবার তবারককে পাকড়াও করে, 'আমাদের হেড অফিসেও খবরটা কে দিয়ে দিয়েছে। ওদেরকেও শেয়ার দিতে হচ্ছে। ফিফটি পারসেণ্টে আমাদের আর কিছু থাকছে না। অপানি ওটাকে সিক্সটি-ফর্টি করে দিন।' কথাটা তবারকের একদম ভালো লাগে না। জালিয়াতি করবে সে, ধরা পড়লে সাজা পাবে সে, আর অফিসারদের সিক্সটি পারসেণ্ট দিতে হবে। তাদের তো কোনো ঝুঁকিই নেই। তবারক ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে না। সে বলে, 'আপনাদের সিক্সটি দিলে আমার থাকবে কি ?'

— 'কেন ? আর সবাই তো তাই-ই দিচ্ছে। তাদের যা থাকবে আপনারও তাই থাকবে।'

— 'আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি।' সে চলে এসেছিল। পরের দিন গিয়ে জানিয়ে এসেছিল, 'সিক্সটি-ফর্টিতে আমার পোষাবে না। আমি আর জাল চালান জমা দেব না।'

আর না দিলে কি হবে ? আগের তো ছিল। বাণিজ্যকর অফিসার প্রদীপ সেনের সন্দেহ হল, বাদল দাসের হয়ে তবারক হোসেনের জমা দেওয়া দুটি চালান জাল। ব্যাঙ্কে চিঠি লেখা হল। ব্যাঙ্ক জানিয়ে দিল, ঐ দুই চালানের টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ে নি। তবারক হোসেনের নাম উল্লেখ না করেই বাদল দাসের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল। হেড অফিসে রিপোর্ট গেল। হেড অফিস প্রদীপ সেনের তৎপরতায় খুশি হয়ে এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করল।

তবারক বলল, 'আপনি তো আমাকে ধরে এনেছেন। কিন্তু আমি এখন আর একাজ করছি নে। যারা এখনও করে চলেছে তাদের ধরুন।'

— 'তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে তাদেরকেও ধরব।'

— 'তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে কি করে ? ওরা তো প্রদীপ বাবুদের সিক্সটি-ফর্টি মেনে নিয়েছে।.ঐ প্রদীপবাবুকে ধরুন, জীবনবাবুকে ধরুন। ওদের জিজ্ঞেস করুন, কেন ওরা অন্যদের জাল চালানগুলো ভেরিফাই করছে না।'

— 'সেটা আমার কাজ নয়—তার জন্য আলাদা লোক আছে।'

তবারকের হতাশ লাগে। তার মনে হয়, পুলিস চোর তৈরির কারিগরদের গায়ে হাত দিচ্ছে না। উলটে তার মতো যারা সেই চুরির জাল থেকে ছিটকে আসতে চাইছে তাদের ধরে থানায় পুরছে। সে আর কোনো কথা বলল না। কালাম দারোগা ড্রাইভারকে বলল, 'গাড়ি বের কর। আসামীকে কোর্টে প্রডিউস করতে হবে।'

গাড়ি এসে এস. ডি. জে. এম. কোর্টের কাছে থামল। পুলিসের লোকেরা তাকে নিয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় তুলে দিল। হায় রে। যে কোর্টের সে উকিল, সেই কোর্টে আজ সে আসামী। তার একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে তাকে অ্যারেস্ট করার প্রতিবাদে তাদের অ্যাসোসিয়েশান

অন্তত কিছু অ্যাকশন নেবে। তাকে থানা থেকেই বেলে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, আবেদন জানাবে। থানায় যখন কেউ এল না, তখন তার মনে হয়েছিল, তারা কোর্টে অপেক্ষ করছে। কোর্টে সকলে মিলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার বেলের জন্য আবেদন জানাবে। শিশিরবাবুর ছেলে সুনীল যখন বধূহত্যার দায়ে অ্যারেস্ট হয়েছিল তখন তো তাই করা হয়েছিল। সেদিন কোর্টে সেও ছিল। কিন্তু আজ তার জন্য কেউ নেই। তার শ্বশুর বেজার মুখে এসে জানাল, কেউ তার হয়ে দাঁড়াতে রাজি হচ্ছে না।

হায়রে বোকা! তুমি কি ভেবেছ যে ল পাস করেছ বলেই তুমি শিশির মুখার্জী, সমীর চ্যাটার্জী বা ফজলে করিম হয়ে গেছ ? তুমি গ্রামের এক চাষার ছেলে। ল পাস করেছ তো কি হয়েছে ? অ্যাসোসিয়েশান তোমার জন্য নয়। ওটা ঐ শিশির মুখার্জীদের স্বার্থে তাদেরই হাতের যন্ত্র।

এ. পি. পি. মাখন পাল তবারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রাপ্ত প্রমাণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করল। তবারক উকিল হয়েও তার পক্ষ সমর্থন করে কিছু বলতে পারল না। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে সাতদিন জেল হাজতে রাখার আদেশ দিলেন। পুলিস গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে তাকে জেলা জেলে নামিয়ে দিল।

খাঁকি হাফপ্যাণ্ট পরা দুজন গার্ড তাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে পুরে দিল। বিভিন্ন বয়সের আট-দশ জন লোক সেখানে ইতিমধ্যেই ছিল। তাদের তিন-চারজন তবারককে দেখে এগিয়ে এল। মাথায় কদমছাট চুলওয়ালা একটা পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ছেলে এগিয়ে এসে অবজ্ঞার সুরে বলে উঠল, 'এ যে ফুল প্যাণ্ট দেখছি ! তোর কত ধারারে ?' অশিষ্ট ভাষায় তুই-তুকারি কথা শুনে তবারকের ভারি খারাপ লাগল। সে যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, 'আমি একজন অ্যাডভোকেট।'

— 'অ্যাডভোকেট্ ? তা বাবা শ্রীঘরে এসেছ কেন ?' পিছনের লোকটা তার পিঠে দমাদম দুই ঘুসি বসিয়ে দিল। সেদিকে ঘুরে দাঁড়াতেই এদিক থেকে পাছার ওপর দেড়মনী লাথি। তবারক মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সে বিনীত ভাবেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা আমাকে মারছেন কেন ?' সেই কদমছাট উত্তর দিল, 'তা অ্যাডভোকেট যখুন তখুন ম্যালা টাকা আছে। তুমি তো এখানে থাকার জন্য আসো নি চাঁদু। যে-কদিন পাই হাতের সুক করে নিই।'

— 'আমি আপনাদের কি করেছি ?'

— 'কি করেছি ? লে বে কথা শুন ! শালা কাছাকাছি হলেই বুলবে টাকা নিয়ে আইসো। একশ টাকা দেড়শ টাকা যা পাবে চুষে লিবে। তারপরেও যদি ভালোভাবে আরগুমেট করে ? শালা উলটোপালটা বলে কোর্ট থাক্যা নাম্যা আস্যা আবার বুলবে টাকা লিয়ে আইসো। আবার বুলে কি না, কি করেছি। শালার মারব পাছায় এক লাথ !'

ভয় পাওয়া কুকুরের মতো তবারক লেজ গুটিয়ে কোণার দিকে সরে আসে।

সন্ধ্যার পর একটা লোক খাবার দিয়ে যায়। মোটা চালের ভাত, ঢেঁড়সের ঘণ্ট আর জলের মতো এক বাটি ডাল। তাই লোকগুলি মহানন্দে খেতে লাগল। খাওয়ার পর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কম্বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগল। তবারক বেজির খাঁচায় পায়রার মতো এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়তে লাগল। তবারক দুটোর ঘণ্টা পর্যন্ত শুনেছিল। তারপর বোধ হয় তার ঘুম এসে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগতে ঘুম ভেঙে গেল। সারা গায়ে দুর্গন্ধ। হাত দিয়ে দেখতে যেতে হাতে চ্যাটপেটে হয়ে লেগে গেল। তবারক বুঝল ওরা তার গায়ে মানুষের গু লাগিয়ে দিয়েছে। ঘেন্নায় তার

বমি এসে গেল। সে তাড়াতাড়ি করে বাথরুমে ঢুকে স্নান করল। কিন্তু তার কাছে পালটে পরবার মতো আর কাপড় নেই। ভেজা কাপড়েই সে দাঁড়িয়ে থাকল। একদিকে শেষ রাতের শীত। অন্যদিকে গা ঘিনঘিনি। ভোর হওয়ার আগেই তার বেদম জ্বর এসে গেল। সে ভুল বকতে লাগল। জেলের লোকেরা তাকে জেল হাসপাতালে ভর্তি করে দিল।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে জ্বরের ঘোরের মধ্যেও তবারকের যেন একবার মনে হল, প্রদীপ সেন, জীবন মজুমদাররা এখন অফিসের চেয়ারে বসে ফাইল সই করছে। শিশির মুখার্জী, সমীর চ্যাটার্জী, ফজলে করিমরা মোটা ফি আদায় করে আসামীর জন্যে আরগুমেণ্ট করছে। আর রেহানা ? রেহানা কী করছে ? রেহানা কি নতুন বাড়িতে বসে ভিসিপি দেখছে ?

জাঁতাকল

নরেন এসে বলল, "রাধাদা তুমি নাকি বিয়ে করছ ?" এমনভাবে বলল যে এর থেকে মজার খবর আর হয় না ! নরেনের মজা গায়ে না মেখে রাধা সোজা হয়ে দাঁড়াল। বিষচোখ নাচিয়ে প্রতি প্রশ্ন করল, "কেন, আমি কি বিয়ে করতে পারি নে ?" "পারবে না কেন ? এতোদিন করনি তো, তাই বলছি। তার ওপর তুমি আবার রাধা !" নরেন দাঁত বের করে হাসতে লাগল। রাধার হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল। ভগবান তো তাকে মেরেই রেখেছে ; বাবা-মাও ছাড়েনি। এমন নাম রেখেছে যে মেয়ে মেয়ে মনে হয়। ছেলেবেলায় একবার অনুযোগ করেছিল। বাবা ব্যাখ্যা করে বলল, 'তোর নাম তো রাধা নয়—রাধানাথ !' সেটা তো সেও জানে। কিন্তু বন্ধুরা কি মানে ? তারা বলে, 'তুই তো রাধা রে। কৃষ্ণের প্রেমিকা। তোর আবার বিয়ে কি ? সব সময় হাসাহাসি করে। যেন সে একটা জলজ্যান্ত অসঙ্গতি !

অসঙ্গতি তো বটেই ! তার বয়স এখন আটত্রিশ। তার পূর্বপুরুষেরা এই বয়সে সংসার ত্যাগ করার কথা ভাবত। তার এখনও বিয়েই হল না।

না হোক, সে কারও হাসির খোরাক হবে না। নরেনের হাসিকে সে পাত্তা দিল না। ঝাঁপে চক লাগিয়ে টুলের ওপর বসল। প্লাস্টিকের প্যাকেট থেকে সীলগুলি বের করে টেবিলের ড্রয়ারে রাখতে লাগল

নরেন বুঝল সুবিধা হবে না। সে চলে গেল। টুলের ওপর বসে রাধার অনেক কথা মনে পড়তে লাগল। পড়াশোনায় সে কোনওদিনই ভাল ছিল না। পরপর তিনবার পরীক্ষা দিয়েও স্কুল ফাইনাল পাস করতে পারেনি। দাদা ততদিনে বি এ পাস করে ফেলেছে। বাবা কলকাতার রায় অ্যান্ড রায় কোম্পানিতে কাজ করতেন। রিটায়ারমেন্টের সময় বলে কয়ে দাদাকে ওখানে ঢুকিয়ে দিলেন। দাদার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল।

মা বলল "রাধারও দিয়ে দাও, সংসারী হোক।"

বাবা ফুঁসে উঠল, বললেই হল ! নিজে তো বাবার হোটেলে খাচ্ছে। বৌকে খাওয়াবে কে ?"

"কে আবার খাওয়াবে ? ও-ই খাওয়াবে।"

"কী করে ?"

"কাজ করে।"

"ও কী কাজ করবে ?"

মা বড় মুখ করে বলেছিল, "ব্যবসা করবে।"

ব্যবসাই সে করছে। কিন্তু মাও কি ভাবতে পেরেছিল, এরকম ছ্যাঁচড়া ব্যবসা করতে সে বাধ্য হবে ? অবশ্য বাবা রিটায়ারমেন্টের সময় পাওয়া টাকা দিয়ে মোড়ের মাথায় তাকে একটা মণিহারি দোকান করে দিয়েছিল। সে দোকান রাধা বেশিদিন চালাতে পারল না। বছর খানেকের মধ্যে ফেল মেরে দিল।

মা মনের দুঃখ মনে নিয়েই ইহলোক ত্যাগ করল।

তখন বাড়িতে রাধার একমাত্র ভরসা বৌদি। বৌদি তার সমবয়সীই। কিন্তু তাকে মায়ের মতই স্নেহ করত।

ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌সে চাকরি পেল। বাড়িতে ঘন ঘন সম্বন্ধ আসছে। বৌদি বলল, "মেজেরাও হোক।" বাবা পাত্রী খুঁজতে লাগলো। কিন্তু তার মত ছন্নছাড়া, বেকার ছেলের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবে কেন ? পছন্দ মত মেয়ে পাওয়া গেল না। বিয়েও হল না।

একদিন ঘটনাক্রমে রাধা বন্ধুদের সঙ্গে ছোট ভাইয়ের কথাবার্তা শুনে ফেলল। এক বন্ধু ভাইকে বলছে, 'মেজদার বিয়ে হবে তারপর ? তা হলেই হয়েছে ! ভেবেছিস, তোর ঐ দামড়া দাদার মেয়ে জুটবে ? ততদিন মেয়েটা হা পিত্যেশ করে বসে থাকবে ?"

ভাই কী বলল সে শুনতে পেল না। তবে কদিন পরেই জানতে পারল, ভাই রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছে।

রাধার মনে ধিক্কার লাগল। সেদিনই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এসে উঠল মহাদেবদার কাছে। মহাদেবদা তখন এই চালা ঘরে ক্লিয়ারিং এজেন্ট।

মহানগরের সীমানায় এই জাঁতাকল চেক পোস্ট। তালিকাভুক্ত কোনও মাল নিয়ে মহানগরে ঢুকতে হলেই চুঙ্গি কর দিতে হয়। ক্লিয়ারিং এজেন্টরা সেই কর জমা দিতে সাহায্য করে। এক পারসেন্ট কমিশন পায়। রাধা মহাদেবদার চালা ঘরে বসে থাকে। বোঝাই লরি এলেই ছুটে যায়। ড্রাইভারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মহাদেবদার কাছে নিয়ে আসতে পারলেই পাঁচটা টাকা পায়।

ড্রাইভারের সঙ্গে কথা হয়ে গেলে মহাদেবদা বিল-চালানগুলো এগিয়ে দেয়। রাধা ফর্ম ফোর পূরণ করে শিফট ইন্সপেক্টারের কাছে জমা দেয়। অ্যালোটমেন্ট হলে অ্যাসেসমেন্টের জন্য নির্দিষ্ট কাউন্টারে দাঁড়ায়। অ্যাসেসমেন্ট হয়ে গেলে মহাদেবদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে জমা দেয়। ফর্ম ফাইভে রসিদ নিয়ে আসে। ফর্ম ফাইভের নম্বর দিয়ে ড্রাইভারকে রসিদ লিখে দেয়। মালের মালিকের কাছে টাকা আনতে যায়। টাকা আদায় হলেও মহাদেবদা পাঁচ-দশ টাকা দেয়। রাধার কোনওরকমে চলে যায়।

দশ বছর এভাবেই চলছিল। গত বছর মহাদেবদা চেকপোস্টের পাশে একটা জমি কিনে দোতলা বাড়ি করেছে। ওপরের তলায় ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। নিচে বিরাট অফিস। চালা ঘরটা রাধাকে ছেড়ে দিয়েছে। রাধা এখন নিজেই ক্লিয়ারিং এজেন্ট। গণেশ তার অ্যাসিস্টেন্ট। দশ বছরে চেক পোষ্টের ঘাট-ঘোট সে ভালই রপ্ত করেছে। কারবার খারাপ চলে না। গণেশকে দিয়ে থুয়েও মাসে দু আড়াই হাজার টাকা থাকে।

রোজগার বাড়তেই সে বাড়িতে ফিরে গেছে। বৌদি কয়েকবারই লোক পাঠিয়েছিল। সে যায়নি। গত মাসে দাদা এসে ধরে নিয়ে গেছে। দাদাই পাশের গ্রামের দত্তদের বড় মেয়ে, রমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করেছে। রবিবার সে বৌদির সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল। রমার মুখখানা বেশ মিষ্টি। রাধা মুখখানা মনে করার চেষ্টা করছিল।

একটা বোঝাই লরি এসে থামল। গণেশ এখনও এসে পৌঁছায়নি। রাধা টুল থেকে উঠে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে আরও অনেকে এসে গেছে। সকলেরই লক্ষ্য লরির ড্রাইভার।

ফুটবল মাঠে একটা বল নিয়ে বাইশ জন প্লেয়ার কাড়াকাড়ি করে। আর এন্ট্রি ট্যাক্স চেক পোস্টে এক ড্রাইভারকে ধরে বত্রিশ জন ক্লিয়ারিং এজেন্ট টানাটানি করে। ফলে ড্রাইভারদের পোয়া বারো।

হাতের বিল-চালানগুলো রাধাকে দিয়ে ড্রাইভার বলল, "বাবু বলিয়েছেন, এক হাজার রূপেয়ার বেশি দিতে পারবেন না।"

"এক লরি কাপড় আছে। এক হাজারে কী করে হবে ? তা হলে তো ভাগাতে হবে।"

"ভাগাতে হয়, হাঁকতে হয়, সেটা আপনার বেপার। এখন বলুন, আপনি পারবেন, না আওর কারও কাছে যেতে হবে ?"

"আর কারও কাছে গিয়ে লাভ হবে ? দেখলেন তো, এক হাজার শুনেই সব কেটে পড়ল !"

ড্রাইভার কোনও উত্তর দিল না।

বিল-চালানগুলো নিয়ে রাধা টুলের ওপর বসল। ওপাশ থেকে বলাই এসে হাতের ইশারা করে ডাকল।

"এক মিনিট বসুন" বলে রাধা টুলের ওপর থেকে উঠে বলাইয়ের কাছে এগিয়ে গেল।

বলাই বলল, "একুশ তারিখ আশীর্বাদ করতে যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছে। তা কী দিয়ে আশীর্বাদ করবি ?"

"দাদার সঙ্গে কথা বল্।"

"দাদা তো তোকে জিজ্ঞেস করতে বলল।"

রাধা মুশকিলে পড়ল। তার কাছে যা টাকা পয়সা ছিল বিয়ের খরচের জন্য দাদার হাতে তুলে দিয়েছে। তারপরেও দাদা তাকে জিজ্ঞেস করতে বলছে।

"ঠিক আছে, আমি কাল তোকে বলব !"

বলাই চলে গেল। রাধা ভাবল, আজ যা পাবে তাই দিয়ে সোনার আংটি গড়াবে।

একটুক্ষণ ভেবে সে মনস্থির করে ফেলল। গণেশকে চালায় বসতে বলে সে কাগজপত্রগুলো নিয়ে বাড়িতে গেল। টিনের বাক্সটা খুলে চেক পোস্টের জাল সীল বের করল। বিছানার তলা থেকে একটা ফর্ম ফাইভও। ট্যাক্স জমা দেওয়ার প্রমাণস্বরূপ জাল রসিদ তৈরি করল। জাল রসিদ নিয়ে চালা-ঘরে এল। ড্রাইভার তখনও বসে ছিল। তাকে রসিদের একটা কপি দিয়ে বলল, "এখন নয়, সন্ধ্যা বেলায়, শিফট চেঞ্জের সময় ভাগবেন।"

প্যাট্রলম্যানের হাতে কিছু দিয়ে রাখতে হবে। মাছলিটাও মিটিয়ে দিতে হবে। বাঁ পকেটে একটা দশ টাকার নোট এবং ডান পকেটে একটা খামে করে একটা একশ টাকার নোট নিয়ে সে এক পা দুপা করে হাঁটতে লাগল।

শিফট চেঞ্জ হতে এখনও অনেক দেরি। তবে পরের শিফটের ইনস্পেক্টর ইন-চার্জ সলিল সেন, চলে এসেছে। ইশারা করতেই সে পিছনের দিকে এগিয়ে গেল। টাকার খামটা হাতে দিতেই তার মুখে সন্তোষের হাসি ফুটে উঠল।

রাধা সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না। অতগুলো টাকা দিতে হওয়ার জন্য মনটা খচখচ করছিল। প্রতিমাসেই দিতে হয়। যতগুলো ক্লিয়ারিং এজেন্ট আছে সকলকেই এক শো-দুশো থেকে আরম্ভ করে পাঁচ হাজার-সাত হাজার পর্যন্ত মাছলি দিতে হয়। কারও কারও আবার লরির ওপর বন্দোবস্ত। লরি পিছু পাঁচ-দশ থেকে আড়াই শো-তিন শো পর্যন্ত দিতে হয়। তারপর পূজো-স্পেশাল। তাকে এবার পাঁচশো টাকা দিতে হয়েছে।

প্রথমে সে দিতে চায়নি। বলেছিল, "অত দিতে পারব না। একশো টাকা দেব !" সঙ্গে সঙ্গে একটা লরির ফিজিক্যাল ভেরিফেকেশানের, অর্ডার। লেবার ডাক, আনলোড কর। একশো টাকা কমিশনের জন্য দুশো টাকা লেবার চার্জ দাও। লরিটা একদিন আটকে থাকল। পাঁচশো টাকা ড্যামারেজ দাও। ঢাকের দায়ে মনসা বিকানোর থেকেও খারাপ অবস্থা। তাতেও যদি রেহাই হত। সে এতদিন যত লরি ক্লিয়ার করেছে, সব মালিককে নোটিশ দিয়ে ডাকা হতে লাগল। পরের দিন পড়ি-মরি করে সে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল। প্রথমে না দিতে চাওয়ার জন্য হাত জোড় করে ক্ষমাও চাইতে হল।

এরপরেও আছে খুচরো আব্দার। আজ এ বাবুর বিয়ের নিমন্ত্রণ ; একটা শাড়ি কিনে দাও। কাল সে বাবুর ছেলের উপনয়ন ; একটা ঘড়ি কিনে দাও। পরশু ওবাবু মিষ্টি খেয়েছেন ; দোকানের বিলটা মেটাও। তরশু কে বাবু স্টেশনে যাবেন ; একটা লিফট দিয়ে দাও।

মহাদেবদার একটা গাড়ি তো সব সময় বাবুদের সেবায় নিয়োজিত। পরিবর্তে তার ঢালাও কারবার। দিল্লি-বোম্বাই-সুরাট-আমেদাবাদ— সব জায়গার বিল-চালান এখানে জাল হচ্ছে। তা জমা দিলে লরি পার হয়ে যাচ্ছে। কেউ লেজ তুলে দেখছে না। রাধা সামনের দিকে তাকাল। মহাদেবদার গাড়িটা দেখতে পেল না। হয়ত রাস্তা ক্লিয়ার আছে কি না দেখতে গেছে। প্যাট্রলম্যানদের হাতে দশটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে সে চালায় ফিরে এল।

টুলের ওপর বসতেই তার ভাবী বধূর কথা মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, রমা তার এসব কাজ পছন্দ করবে তো ? প্রথম সুযোগেই তার সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। আপাতত আশীর্বাদের আংটিটার অর্ডার দিয়ে দিতে হয়।

রাধা উঠতে যাচ্ছিল। ড্রাইভার এসে খবর দিল, "গেট মে গাড়ি পাকাড় লিয়া।"

রাধা ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকাল। ড্রাইভার বলল, "ম্যায় নে বোলা, লাইসিন ভি হ্যায়, পারমিট ভি হ্যায়, চুঙ্গিকা বিলটি ভি হ্যায়। ফির ভি পাকাড় লিয়া।" রাধা বুঝতে পারল না। সে মান্থলি মিটিয়ে দিয়েছে। প্যাট্রলম্যানের পাওনাও চুকিয়ে দিয়েছে। তারপরেও গাড়ি ধরল কেন ? ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "কৌন ?"

"ও তো নেহি মালুম। বোলতা হ্যায়, এজেন্টকো বুলাও।"

রাধা গণেশকে পাঠাল। গণেশ ফিরে এসে জানাল, "ই টি ও, স্বপন ব্যানার্জি ধরেছে।"

রাধার মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। এই ই টি ওটা এক নম্বরের ছোটলোক। চামার। ঢেমনার একশেষ। লজ্জা তো দূরের কথা, মান-সম্মান বোধও নেই। তখন রাধা সবে মহাদেবদার কাছে ঢুকেছে। ট্যাক্স জমা দেওয়ার জন্য কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। স্বপন ব্যানার্জি এক শালওয়ালার কাছে শাল দেখছিল। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে বলল, "শালটা পছন্দ। কিন্তু বাড়ি থেকে টাকা আনতে ভুলে গেছি। আপনাদের কারও কাছে আছে। কাল দিয়ে দেব।"

"আমার কাছে আছে, নিন।"

শালের দাম তিনশো পঁচিশ টাকা রাধা গুণে দিয়েছিল।

চালায় ফিরতেই মহাদেবদা ঠাস করে এক চড় কষিয়েছিল।

"ওকে তুই টাকা দিতে গেলি কেন ?"

"কাল দিয়ে দেবে তো... !"

"কাল দিয়ে দেবে ! ওই বেটা টাকা ফেরত দেবে ? কক্ষনও দেবে না। বরং চাইতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। লরির ফিজিক্যাল হবে।"

মহাদেবদার আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। স্বপন ব্যানার্জি আজও সে টাকা ফেরত দেয়নি। মাঝে ট্র্যান্সফার হয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। স্বপন ব্যানার্জি যখন ধরেছে তখন টাকা না নিয়ে ছাড়বে না।

রাধা সলিল সেনের কাছে গেল। সলিল সেন তাকে স্বপন ব্যানার্জির কাছে নিয়ে গেল। স্বপন ব্যানার্জি বলল, "আপনার একশ টাকা একজেমশান গাড়ি পাস করার রেট। ও রেটে ট্যাক্সেবল গাড়ি পাস হয় না। ফুল ট্রাক টেরিকটন আছে। দশ টনের কম নয়। এম আই বি রেট লাগালেই বিশ হাজার টাকা ট্যাক্স হবে। আসল বিল ধরলে ত্রিশ হাজারের কম নয়।

এমনি এমনি পাস হয়ে যাবে ?"

"কি করতে হবে বলুন স্যার।"

"অন্তত দু হাজার টাকা লাগবে।"

"অত টাকা কোথায় পাব স্যার ?"

"পাবেন না, দিতে হবে না। লেবার ডাকুন, মাল আনলোড করুন। কম করে ত্রিশ হাজার টাকা ট্যাক্স হবে। টেন টাইমস্ পেনালটি তিন লাখ টাকা। তিন লাখ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে মাল নিয়ে যাবেন। আর ফর্ম ফাইভের ফোর্জারি তো আছেই। তার জন্য যা করার পুলিসই করবে।"

স্বপন ব্যানার্জি ডাঁটের মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাধার মনে হল, অজগর যেমন হরিণ শিশুকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পিষতে থাকে এরা তেমনি তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছে। না মরা পর্যন্ত এদের হাত থেকে মুক্তি নেই। বিয়ের মধ্যে থানা-পুলিস হলে আরও কেলেঙ্কারি। সে সলিল সেনের কাছে হাত জোড় করল, "আপনি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করুন, লরিটা পাস করানোর জন্য আমি মাত্র হাজার টাকা পাব। টাকা আনতে যাওয়ার রাহা খরচ আছে, গণশার খরচ আছে, আমিও পেটের জন্যই ধান্দা করছি। দু হাজার টাকা কোথার থেকে দেব বলুন ?"

সলিল সেনের মনটা একটু নরম হল। সে রাধাকে নিজের ঘরে বসিয়ে স্বপন ব্যানার্জির কাছে গেল। ফিরে এসে বলল, "সাহেব তো হাজারের নীচে কিছুতেই নামবেন না।" অনেক বলে কয়ে পাঁচ শ-তে রাজি করিয়েছি। আর কথা বাড়াবেন না কিন্তু।

রাধা চলে আসছিল। সলিল সেন পিছন থেকে ডাকল। রাধা ঘুরে দাঁড়াতে বলল, "এখনই ছাড়বেন না কিন্তু! রাস্তা ক্লিয়ার আছে জেনে, তবে যাবে।"

রাধা সম্মতি জানিয়ে চলে এল। গণেশের হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

সকাল বেলায় গণেশ এসে খবর দিল, নরেনরা স্বপন ব্যানার্জিকে ঘেরাও করেছে। জাল কাগজ-পত্র থাকা সত্ত্বেও সে কেন লরিটা ছেড়ে দিল, তারা জানতে চাইছে।

আবার কী অশান্তি হয়, কে জানে ? হোক। তারপরেও যদি দু-নম্বরি কাজ বন্ধ হয়, সে খুশিই হবে। শান্তিতে কাজ করবে। তারা কয়েকজন মিলে কয়েকবারই চেষ্টা করেছিল, দু-নম্বরি করবে না ; কাউকে করতে দেবে না। যে মালের যত ট্যাক্স হবে, তাই জমা দেবে। আর কমিশন নেবে।

কিন্তু মাত্র দু-চার দিন। তারপর আবার যে কার সেই। এজেন্টদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এত বেশি যে তলে তলে সবাই ট্রান্সপোর্টারদের সন্তুষ্ট করে চলতে চায়। ট্রান্সপোর্টাররা যে সব থেকে কম পয়সায় গাড়ি পার করতে পারে তার কাছে যায়। এজেন্টরা স্টাফদের সঙ্গে আলাদা-আলাদা আঁতাত করে নেয়। যে দু-নম্বরি করে না তার রুটি-রুজি বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়। সেই জন্য এসব ব্যাপারে রাধার আর আগ্রহ নেই। তবে এবারকার ঝামেলাটা হচ্ছে তার পাস করা লরি নিয়েই। কাজেই কী হয়, তাকে খবর রাখতেই হচ্ছে।

যা হল তা মোটেই সুখকর নয়। স্বপন ব্যানার্জি লগ বুকে এন্ট্রি করল, ড্রাইভারের কাছে জাল রসিদ ছিল। সে লরিটা আটক করেছিল। ড্রাইভার লরি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

ই টি ও-ইন চার্জ তপন সরকার মালিককে নোটিস করল। এন্ট্রির একটা কপি থানার বড়বাবুর কাছেও পাঠিয়ে দিল।

বিয়ের মধ্যে আবার সেই থানা-পুলিস। রাধা ছুটল পঞ্চাননদার কাছে। পঞ্চাননদা

পঞ্চায়েতের মেম্বার, রুলিং পার্টির লিডার। সব শুনে বলল, "ও বড় বাবুটার খাঁই খুব বেশি রে। হাজারের নিচে কথা বলে না। তবে 'ল্যাংড়া আমে খুব আসক্তি। আমি আভাস দিয়ে রাখব। যদি এক ঝুড়ি নিয়ে যেতে পারিস, তাহলে হয়েও যেতে পারে।"

স্থানীয় বাজারে ভাল আম পাওয়া যায় না। রাধা ফ্রুট মার্কেটে গেল। গণেশের মাথায় ঝুড়িটা চাপিয়ে বড়বাবুর বাসায় হাজির হল। প্রথম সুযোগেই পঞ্চাননদার নামটাও শুনিয়ে দিল।

আমের ঝুড়িটা একবার দেখে নিয়ে বড়বাবু বলল, "হ্যাঁ উনি হাজার খানেকের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলছিলেন। কিন্তু ফৌজদারি কেস, বোঝেনই তো অনেকের মুখ বন্ধ করতে হবে। ওতে হবে না। তবে আপনি পঞ্চাননবাবুর লোক! দেড় হাজার দেবেন!"

বড়বাবু এমনভাবে কথাগুলো বলল যে সেটাই চূড়ান্ত। রাধা কিছু বলতেই পারল না

চেক পোস্টে ফিরে দেখল, ট্রান্সপোর্টের মালিক তার চালায় বসে আছে। টুলের ওপর বসতেই সে নোটিসটা এগিয়ে ধরল, "এখন কি হবে?"

রাধার বলতে ইচ্ছে করছিল, এক হাজার টাকায় গাড়ি পাস করালে যা হয় তাই হবে কিন্তু বলতে পারল না, বলল, "ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

রাধা সলিল সেনকে নিয়ে তপন সরকারের কাছে গেল। তপন সরকার বলল, "লিখিত দিলে আমি আর কি করব বলুন? আমাকে তো অ্যাকশন নিতেই হবে।"

"তা তো বুঝছি স্যার। কিন্তু একটা ব্যবস্থা না করলে....।"

"একটা উত্তর দিয়ে দিতে বলুন। আমি ফাইল করে দেব। কিভাবে লিখতে হবে সলিলবাবুর কাছে বুঝে নিন।"

একটু আড়ালে এসে সলিলবাবু বুঝিয়ে দিল, "উত্তরটা জমা দেওয়ার আগে সাহেবের হাতে শ খানেক টাকা দিয়ে দেবেন।"

রাধা হ্যাঁ-না, কিছুই বলতে পারল না। মনে হল, সে যেন ভাগাড়ে পড়ে থাকা একটা মরা মোষ। আর এরা সব এক-একটা শকুন। এক খাবলা মাংস থাকা পর্যন্ত ছাড়বে না। হাড়ের মধ্যে থেকে মজ্জাও টেনে ছিঁড়ে খাবে।

সে চালায় ফিরে এল। ব্যাক ডেটে একটা রসিদ লিখে মালিকের হাতে দিল, "এটা জমা দিয়ে দিন। তারপর যা হয় আমি বুঝব।"

মালিক চলে গেল।

রাধা আশীর্বাদের আংটির অর্ডার দিতে গেল।

আশীর্বাদের আর মাত্র তিন দিন বাকি। আংটিটা বুক পকেটে পুরে রাধা বাড়ির বারান্দায় বসে ছিল। বারবার হাত দিয়ে দেখছিল। ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের অনেক ছবি তার মানসপটে জেগে উঠছিল।

গোপাল এসে বলল, "রাধাদা, পালাও। ওপরে কারা পিটিশান করেছিল। কলকাতা থেকে পুলিস এসে গণশাকে ধরেছে। তোমাকেও খুঁজছে।"

রাধা মুহূর্ত বিলম্ব না করে সরে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়িতে পুলিস এল। তাকে না পেয়ে তার দুটো খাতা নিয়ে চলে গেল। ভাগ্যিস জাল সীলগুলো সে সরিয়ে রেখেছিল।

রাধা আবার গিয়ে ধরল পঞ্চাননদাকে। পঞ্চাননদা কয়েকবার ফোন করে বলল "নারে! কেসটা নাকি মন্ত্রীর কান পর্যন্ত উঠেছে। ওরা কেউ কিছু করতে পারছে না।"

"তাহলে?"

"কদিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু পরশু দিনই যে আশীর্বাদ। আর মাস খানেকের মধ্যেই বিয়ে। সেকথা পঞ্চাননদাকে বলতে পারল না। রাস্তার হোটেলে ভাত খেয়ে ভাবতে লাগল কী করা যায়! বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না। বলাইয়ের বাড়িতে যাওয়া যেত। কিন্তু বলাই টের পেলে পাত্রীপক্ষ জেনে যেতে পারে! সে মানিকের বাড়িতে গেল। গল্প-গুজবের পর তার সঙ্গেই শুয়ে পড়ল।

সকাল বেলায় বাড়িতে আসতে দাদা মুখ ফিরিয়ে নিল। ছোট ভাইও কথা বলল না। রাধা ভয়ে ভয়ে বৌদির কাছে গিয়ে বসল।

বৌদি বলল, "রাতে পুলিস এসেছিল। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজল। ঘরের সব জিনিস তছনছ করে দিল। আর বাড়িসুদ্ধ লোককে কি জেরা। বাড়িতে নাই কেন? কোথায় গেছে? কোন আত্মীয় বাড়ি? তাদের ঠিকানা কি? কবে আসবে? অফিসে পাঠিয়ে দেবেন? আরও কত কী! বুড়ো মানুষটাকেও রেহাই দিল না।"

এবার দাদা ফেটে পড়ল, "তোমার জন্য বাড়ির বেইজ্জতি হল। বংশের মুখে কালি পড়ল। তুমি কোথায় কী করে বেড়াবে; আর রাত দুপুরে পুলিস এসে বাড়িসুদ্ধ লোককে হয়রান করবে, তা চলবে না। তুমি ভিন্নে হয়ে যাও।"

রাধা মাথা নিচু করল।

ভাই ইঞ্জিনিয়ার। দাদাও কোম্পানীতে কাজ করে। আর সে এন্ট্রি ট্যাক্স চেক পোস্টে একটা ক্লিয়ারিং এজেণ্ট। এমনিতেই বাড়িতে তার সমাদর নেই। তার ওপর রাত দুপুরে পুলিস এলে তো ভিন্ন হতে বলবেই। সে ভিন্নই হয়ে যাবে। শুধু বিয়েটা পর্যন্ত অপেক্ষা।

মাথা নিচু করে দাদার বকুনিটা হজম করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

মোড়ের মাথায় বলাইয়ের সঙ্গে দেখা। সে বলল, "মেয়েপক্ষ আশীর্বাদের জন্য আরও কয়েকটা দিন সময় চাচ্ছে।"

রাধা বুঝতে পারল, ওরা আর তার সঙ্গে রমার বিয়ে দিতে চাইছে না। এতক্ষণ যার জন্য সে সবকিছু সহ্য করতে পারছিল, সে মুহূর্তে তা তার সামনে থেকে সরে গেল। তার মনে হল, এ জীবনে কোন নারীর মধুর কোমল স্পর্শ আর কোনওদিনও পড়বে না।

পুলিস তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে। প্রথমে হাজতে। তারপর জেল। জেল থেকে ছাড়া পেলেও তাকে বেঁচে থাকতে হবে দাগী অপরাধী হিসেবে। আত্মীয়-স্বজনরা এড়িয়ে চলবে। প্রতিবেশীরা ঘৃণা করবে। বন্ধু-বান্ধবরা করবে করুণা। সে নিজেও কি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে? কী লাভ এভাবে বেঁচে থেকে? সে মনস্থির করে ফেলল।

সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াল। সন্ধ্যাবেলায় একবার প্রাইমারি স্কুলটার কাছে গেল। সেই ছেলেবেলায় বই হাতে পড়তে আসত। জীবনটা তখন কত সুন্দর ছিল। সে জীবন আর কোনদিন ফিরে পাবে না!

সে বাড়ি ফিরতে লাগল। ফেরার পথে হাই স্কুলটা চোখে পড়ল। এই স্কুলটাও যদি সে পাস করতে পারত। মোড়ের মাথায় এসে থমকে থামল। মণিহারি দোকানটা চালাতে পারলেও আজ তার এ অবস্থা হত না।

রাত হয়ে গিয়েছিল। সে এসে নিজের বিছানাটায় শেষবারের মত শুয়ে পড়ল। বিছানাটা পরম আদরে তাকে গ্রহণ করল।

ক্ষেতে দেওয়ার জন্য এক শিশি ফলিডল বিষ আনা হয়েছিল। বিষের শিশিটা পাশের তাকে ছিল। সে তাক থেকে বিষের শিশিটা পেড়ে নিল। ছিপি খুলে খানিকটা গলায় ঢেলে দিল। বুকের মধ্যেটা জ্বালা করে উঠল। একবার রমার মুখটা মনে পড়ল। তারপর দম বন্ধ

হয়ে এল। বিছানার ওপর ছটফট করতে করতে সব অন্ধকার হয়ে গেল। একটা বিরাট পাথর যেন সব কিছু চাপা দিয়ে দিল।

জ্ঞান ফিরতে দেখল, সে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। কপালে হাত দিয়ে শিয়রে গণেশ বসে আছে।

গণেশ তাকে অনেক খবর দিল। পুলিস তাকে জামিনে ছেড়ে দিয়েছে। রাতে দেখা করতে এসে দেখে, রাধা গোঙাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে ফেপড়া উঠছে। গণেশ আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে। লোকজন জড় হয়ে যায়। মহাদেবদার গাড়ি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ডাক্তররা আশা দিতে পারেনি। তিনদিন পরে আজ জ্ঞান ফিরেছে।

খবর পেয়ে পুলিস গার্ড পোস্ট করে দিয়েছে।

তারা নাকি ইতিমধ্যেই ট্রান্সপোর্টের মালিকের কাছ থেকে দুটো রসিদই সিজ করেছে। খাতার লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছে, রসিদ দুটোর হাতের লেখা তারই। অর্থাৎ জালিয়াতি সে-ই করেছে। সুস্থ হয়ে উঠলেই তাকে আদালতে হাজির করা হবে। হবেই তো! সে যে সত্যি অপরাধী!

কিন্তু স্বপন ব্যানার্জি, সলিল সেন, তপন সরকার—ওরা ? আর থানার বড়বাবু চণ্ডী ঘোষ ? ওরাও তো অপরাধী! তার থেকে অনেক বেশি করে অপরাধী। পুলিস কি ওদের কাউকে ধরেছে ? ধরে নি। ধরবেও না।

যারা মাসে মাসে মোটা টাকা মাইনে নেওয়ার পরেও ঘুষ খায়, পুলিস তাদের স্পর্শ করবে না। আর তার মত যারা পেটের দায়ে তাদেরকে ঘুষ দিতে বাধ্য হয় তাদেরকে ধরে হাজতে পুরবে।

নিশ্চয় ওরাও ভাগ পায়! না হলে এরকম করে কেন ? এর কী কোন প্রতিকার নেই ?

ক্ষোভে রাধা পাশ ফিরে শোয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

বৌদি এসে বলে, "রাধা, দেখ্ তো কে এসেছে!"

রাধা চোখ মেলে চায়। দেখে, বৌদির পাশে একটা লালপাড় সাদা শাড়ি পরে রমা দাঁড়িয়ে আছে! সে তাকাতে রমা মুখ নিচু করে নেয়।

গণেশ ডাকে, 'রাধাদা, ঘুমিয়ে পড়লে ?' আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যায়। রাধা চোখ টেনে খোলে। দেখে, বৌদি বা রমা কেউ নেই। সে ফ্যালফ্যাল করে গণেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখের ওপাশে চেক পোস্টের চালাটা ফুটে ওঠে।

তুথ্‌লি-মুথ্‌লি

অমাবস্যার রাত। সন্ধ্যাবেলাতেই জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে কেরোসিনের আলো জ্বেলে সানু ঠাকুর্দার কাছে পড়তে বসেছিল। দুলে দুলে নয়ের ঘরের নামতা মুখস্থ করছিল। এমন সময় দুটো বিরাট বিরাট পাখি এসে ভুসির ঘরের চালে বসল। বসেই গভীর স্বরে ডাকতে লাগল। সানু জানে, ও দুটো হুতুম প্যাঁচা। ঠাকুমা বলে হুদুমধুম। তবুও ধারাপাত নামিয়ে, ঠাকুর্দার কাছে সরে এসে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, ও দুটো কি ?'

'তুথ্‌লি-মুথ্‌লি'

'ওরা কি বলে ?'

'মদ্দাটা বলে, তুই থুলি। মাদীটা বলে, মুই থুলি।'

'কি থুলি ?'

'মাদুলি।'

'ওরা মাদুলি কোথায় পেল ?'

'তান্ত্রিকের কাছে।'

'ধুস ! মানুষ দেখলে তো পালিয়ে যায়। ওরা তান্ত্রিকের কাছে কি করে গেল ?'

'এখন মানুষ দেখলে পালিয়ে যায় বটে। কিন্তু একদিন ওরাও মানুষ ছিল।'

'তুথ্‌লি-মুথ্‌লি কি করে হল ?

'সে অনেক কথা রে, ভাই !'

পড়া শেষ হবার আগেই গল্পের গন্ধ পেয়ে সানু ঠাকুর্দাকে ধরে বসল, 'দাদা, বল না কথাটা !' ঠাকুরদা গুছিয়ে বসে, কয়েকবার কেশে নিয়ে শুরু করল।

(২)

সে অনেক যুগ আগের কথা। দক্ষিণ দেশে এক রাজা ছিল। তার এক কোটাল। কোটাল ভারী সরেস এবং ধূর্ত। কাজ তার শহরে শান্তি রক্ষা করা। কিন্তু অশান্তির কারবারীদের সঙ্গেই তার গাটছড়া বাঁধা। ফলে মুনাফার একটা অংশ তার পকেটে এসে ঢোকে। অপরাধ দমনের জন্য রাজধানীর মহল্লায় মহল্লায় থানা। কোটালের কেরামতিতে সেগুলো উৎকোচ আদায়ের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। সে ঘাঁটিতে নিযুক্ত হতে হলে আগেই কোটালকে খুশি করতে হয়। সব রকম গ্রহণেই সে সিদ্ধহস্ত। তবে কামিনী এবং কাঞ্চনেই তার আসক্তি বেশি। ঘরে তার স্ত্রী পুত্র আছে। তবে অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গই তার বেশি সুখকর মনে হয়। গণিকালয়ের বাসিন্দাতেও অরুচি নেই। ফলে তাকে খুশি করতে ভাবী থানাদারদের নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয় না। কাউকে পেয়ে গেলে ভালই। না হলে কিছু অর্থ হলেই হল। অবশ্যই সে অর্থের পরিমাণ থানার ওপর নির্ভর করে। কুলিপাড়ায় খেটে খাওয়া মানুষগুলো বাস করে। ধরে এনে গারদে ভরে দিলেও ট্যাঁক থেকে একটি টাকাও বের হয় না। ওখানে আর ক'টাকা পাওনা হবে ? কিন্তু রাজার বাজারে দেশ-বিদেশের সওদাগররা সওদা করতে আসে। মোটা টাকা লেনদেন হয়। কোটালের পাওনাও মোটা হয়। অপরাধীরা অবাধে ঘোরাফেরা করে। সাধারণ মানুষের ধন-প্রাণ বিপন্ন হয়।

রাজার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ধূর্ত কোটাল, যে করে হোক, রাজাকে সন্তুষ্ট রাখে। একটু ইশারা পেলেই নির্দোষ লোককেও এনে গারদে পুরে দেয়। আবার দোষী লোক এসে তার দপ্তরে বসে থাকলেও তাকে খুঁজে পায় না। রাজার অবৈধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও হয়।

এ সব দেখে মন্ত্রীর মনে সুখ নেই। কোটালের কুকীর্তি থেকে দেশের লোককে বাঁচানো তার দায়। কিন্তু বিলাস-ব্যসনে ব্যস্ত রাজা কি বুঝতে চায় ? কি করে একটা বুদ্ধি বের করা যায় ? রাজা সন্তুষ্ট থাকে, আবার দেশের লোকও মুক্তি পায় !

এদিকে সব কিছু পেয়েও কোটালের মনে শান্তি নেই। মন্ত্রীটা সব সময় রাজার কান ভাঙায়। মানুষের মন তো ! কোনওদিন যদি তার প্রতি বিরূপ হয়। তা হলে, এত সব ভোগ-বিলাস, সব বরবাদ হয় ! মন্ত্রীটাকে বশ করা চাই ! যদি একটা সুযোগ পাই !

(৩)

কোটালের সুযোগ এসে গেল। সে খবর পেল, বন্দরঘাটে আস্তানা গেড়েছে, কামরূপ-কামাক্ষ্যা-সিদ্ধ এক তান্ত্রিক। সে বশীকরণ জানে। তার সাধনার গুণে পরম শত্রুও বশ মানে।

গভীর রাতে কোটাল এসে আস্তানায় হাজির হয়। সে খবর শুনে তান্ত্রিক প্রমাদ গোণে। আমার দ্বারা কি এমন হয়ে গেল যে, এত রাতে স্বয়ং কোটালকে আসতে হল ? কোটাল তাকে আশ্বস্ত করল, না মহারাজ, আমি সে রকম কোনও উদ্দেশ্যে আসি নি। সব কিছু দেব, দক্ষিণা যা চাও। শুধু মন্ত্রীটাকে আমার বশ করে দাও ! তান্ত্রিক বুঝল, মোটা দাঁও। সে মন্ত্রীকে আসন পেতে বসালো। গোঁফে কয়েকবার তা দিয়ে গম্ভীর চালে বলল, হ্যাঁ ব্যাটা, তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তবে বড় কঠিন কাজ। কোটাল সষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, মহারাজ ! পারিতোষিক আমি পুষিয়ে দেব। আর দক্ষিণা যা চাও। তান্ত্রিক বরাভয়ের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলল, তথাস্তু ! কাল শনিবার। বারবেলায় কোনও শুভকাজ শুরু করতে নেই। পরশুদিনও অশুভযোগ। তরশুদিন ঘোর অমাবস্যা। ডাকিনী সাধনার রাজযোগ। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে মা লক্ষ্মীকে নিয়ে চলে আয় !

তাকে আবার কেন মহারাজ !

আমার বশীকরণ মন্ত্র কামাক্ষ্যা সিদ্ধ। এর মহাতেজ !

যে ধারণ করে, বশীকৃত ব্যক্তি তার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এলে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। তাতে উল্টো বিপত্তি। তাই অন্য কাউকে ধারণ করতে হয় ! সেটা অন্য কেউ হলে হয় না মহারাজ ?

কেন হবে না ? তবে বিশ্বস্ত লোক হওয়া চাই ! তা হলে সে-ই সই। কোটাল সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

(৪)

তান্ত্রিক উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। গভীর রাতে পত্নীকে সঙ্গে করে কোটাল এল। যোগাড়-যন্ত্র সব করাই ছিল। কোটালকে বাইরে পাহারায় রেখে তান্ত্রিক দ্বার বন্ধ করল। অনেকক্ষণ ধরে বশীকরণ সাধনার যাগযজ্ঞ হল। ভোরের একটু আগে একটা মাদুলি হাতে করে কোটাল পত্নী বাইরে এল। তান্ত্রিক সাবধানবাণী উচ্চারণ করল, বহুত খতরনক চিজ বেটি। এ ডাকিনী বিদ্যা। গুরু-গুঁইস্যা চেনে না। যার হাতে থাকবে তার হয়ে কাজ করবে। এখন তোর হাতে আছে। দুনিয়া তোর বশ। কাল তোর শত্রুর হাতে চলে যাবে তো তুই তার বশ হয়ে যাবি। খুব সাবধানে রাখবি, যেন বেহাত না হয় ! কোটাল মনে মনে ভাবল, তা আর বলতে। সে তান্ত্রিককে প্রণাম করে বিদায় নিল। বাড়িতে এসে স্বামী-স্ত্রীতে মাদুলিটাকে লোহার সিন্দুকের মধ্যে ঢেকাল। চাবিটা ভাল করে লাগিয়ে মনে মনে বলল, ব্যাটা মন্ত্রী, কোথায় যাও ? করত দেখি বেগড়বাই ?

(৫)

মন্ত্রী তখন কোটালের কেরামতি থেকে শহরবাসীকে বাঁচানোর কথা ভাবছিল। কাউকে কিছু বলছিল না। চুপচাপ থাকছিল। আর রাজাকে কিভাবে কোটালের কুকীর্তির কথা বোঝানো যায় তার ছক কষে যাচ্ছিল। তা দেখে কোটাল ভাবল, মাদুলির কি মাহাত্ম্য। অমন জাঁদরেল মন্ত্রীটা বশ হয়ে গেল আস্ত। তা হলে এবার রাজার মনটাকে একটু ভাল করে মেরামত করতে হয়। মন্ত্রীর কান ভাঙানিতে যা ক্ষতি হয়েছিল, তা যেন পুষিয়ে যায়।

কোটালের সুযোগ এসে গেল। যুবরাজ পশ্চিম দেশ জয় করে এল। রাজা বলল, আগামী পুর্ণিমায় তাকে সংবর্ধনা দাও। যুবরাজের যুদ্ধজয়ে সেনাপতি ততটা খুশি নয়। সে রাস টেনে ধরে। মন্ত্রী সাদামাঠা মন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই করে না। কোটাল দ্বিগুণ উৎসাহে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। অশান্তির কারবারীরা তার সহায়। অপরাধ জগতে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। চতুর্দিক থেকে সংবর্ধনা সামগ্রী আসে।

ঝালর ঝোলে। আলো জ্বলে। বায়েনরা এসে বাজনা বাজায়, গায়েনরা এসে গান গায়। নাচনিরা এসে নাচের আসর বসায়। বীণাগাথীন এসে কুলের গুণকীর্তন করে। পটুয়ারা বংশের গৌরবগাথা নিয়ে পট এঁকে চলে। মন্ত্রী শুধু দেখে আর বাহবা দেয়। কোটাল হম্বিতম্বি করে। বাজার সরকারকে ডেকে কি কি আনতে হবে তার ফর্দ করে দেয়। সাফাইওয়ালা ঠিকভাবে কাজ না করায় ঝাড়ুদারকে বকাবকি করে। আবার পটুয়ার কাছে এসে কিভাবে পট আঁকতে বর হবে তার নির্দেশ দেয়। পটুয়া তার নির্দেশ মত পট এঁকে যায়। মন্ত্রী দেখে আর মনে মনে পরিকল্পনা ছকে।

(৬)

সংবর্ধনার দিন আসে। মহা ধুমধাম শুরু হয়। মন্ত্রী চুপটি করে রাজার পাশে এসে বসে। কোটাল মহা উৎসাহে কাজ করে আর মনে মনে হাসে। একবার পাকশালায় গিয়ে খোঁজ খবর নেয়। আবার পটুয়ার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কি রে, ঠিকমত এঁকেছিস তো? পটুয়া বলে, একদম ঠিক করে এঁকেছি, রাহাদা। দেখ না, তুমি যেমনটি বলেছ, ঠিক তেমনটি। রাজার পূর্বপুরুষরা যেখানে মেকী ঘোড়ায় চড়ে সাবেকী রাজ্য শাসন করছে, রাজা সেখানে পক্ষীরাজে চড়ে স্বর্গে যাচ্ছে। কোটাল পটুয়ার পিঠ চাপড়ে দেয়। আর ভাবে, রাজা দেখে কেমন চমৎকৃত হয়ে যাবে!

সংবর্ধনা শুরু হয়। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করার আগে প্রতিবেদক এসে বংশের গুণকীর্তন করে। রাজা নাচনিদের নাচ দেখে, গায়েনদের গান শুনে পটুয়ার পটের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাঙ্গপাঙ্গ, সভাসদেরাও তাকে অনুসরণ করে। পটুয়া পটের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে চলে। রাজা আহ্লাদে আটখানা হয়ে গোঁফে তা দেয়।

মন্ত্রী পাশ থেকে আস্তে করে বলে, মহারাজ, আপনি এখনও যথেষ্ট সবল। আমরা চাই রাজ্যবাসীর স্বার্থে আপনি দীর্ঘদিন রাজত্ব করুন। তাই আপনাকে স্বর্গে পাঠানোর ব্যাপারটা বুঝলাম না। আর আপনার পূর্বপুরুষদের গাধার পিঠে চাপিয়ে যে বংশের কি মুখ উজ্জ্বল হল, তাও বোঝা গেল না!

পাশ থেকে সভাসদেরা বলে উঠল, বটে তো, বটে তো! এটা মহা অন্যায়!

রাজার কান গরম হয়ে উঠল। মুখ লাল হয়ে গেল। ক্রোধে গোঁফে জোরে কয়েকবার মোচড় দিয়ে সে পটুয়ার কান ধরল। বল হারামজাদা, তোকে এ রকম নষ্টামি করতে কে বলেছে! এই কে আছিস্। একে এক্ষুণি গারদে পুরে দে।

রাজা তখনও কানটা ছাড়েনি। টানের চোটে পটুয়ার প্রাণ ওষ্ঠাগত। ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। কোথায় রাজা খুশি হয়ে পারিতোষিক দেবে। উল্টে পিতৃদত্ত প্রাণটা নিয়েই টানাটানি। আর আশেপাশে দারুণ কানাকানি। এরই মধ্যে দৌবারিক এসে তার দখল নিল। টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মন্ত্রী এগিয়ে এসে বলল, বধ্যভূমিতে কান্নার সময় পাবি মেলা। বাঁচতে চাস তো মহারাজকে তার নামটা বলে ফেল এই বেলা! পটুয়া মুখ ফিরিয়ে বলল, রাহাদা। সভাসদরা সন্দেহের ভঙ্গীতে উচ্চারণ করল, রাহাদা? রাহারও ভ্রু-কুঞ্চিত হল। দৌবারিক তাকে নিয়ে গিয়ে গারদে পুরে দিল।

(৭)

কেটোলের মনে হল, এযে মহাকাল। শেষে কি না মাদুলির উল্টো ফল। মন্ত্রীটা তো বরাবরই ওরকম ছিল। কিন্তু রাজার কি হল? তা হলে কি রাজা উন্মাদ হয়ে গেল? হ্যাঁ তান্ত্রিক বলেছিল বটে। কিন্তু সে তো সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটলে! তা হলে কি রাজার সঙ্গে তার পত্নীর সাক্ষাৎ সংস্পশ আছে? সে বাড়ীর দিকে ছুটল।

অর্ধেক রাস্তা না যেতেই মনে হল, সর্বনাশ! মন্ত্রী যদি তান্ত্রিকের কাছে লোক পাঠায়। তা হলে সব ফাঁস। সে রাস্তা পাল্টে বন্দর ঘাটের দিকে ছুটতে লাগল। হাঁফাতে হাঁফাতে বন্দরঘাটে এসে দেখল, তান্ত্রিকের আস্তানা উধাও। সে হাঁফ ছেড়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, পটুয়াটা এখন বন্দীশালায়। মন্ত্রীটা রাজার ঘরে। যদি আবার ডেকে জেরা করে। বলে ফেলতে পারে আরও বেফাঁস। যাকে বলে বিপদকালে বুদ্ধিনাশ। আগের কাজটা তো আগে করতে হয়। তা কিনা সে ছুটছিল বাড়ীর দিকে!

কোটাল আবার ছুটতে লাগল। গিয়ে উঠল তার সাঙাত, বন্দীশালার কর্মাধ্যক্ষের কাছে। অনেক শলা-পরামর্শ হল! সাঙাত বলল, না, সরিয়ে দেওয়া যাবে না। তাতে আমার গর্দান যাবে। তার থেকে ওটাকে বিষ খাইয়ে মেরে দাও। তা হলে বন্দীশালাতেও থাকল। আর বেফাঁস কিছু বলতেও পারল না। বিষ যে ওর সঙ্গে ছিল না, তার কি প্রমাণ আছে?

সাঙাতের বুদ্ধিতে কোটাল ভরসা পেল। এখানকার ব্যবস্থা পাকা করে বাড়ির দিকে রওনা হল। পথের মাঝেই বার্তাবহ সংবাদ দিল, রাজা ডেকে পাঠিয়েছে। কোটালের আর বাড়ি যাওয়া হল না। পিছন ফিরে আবার প্রাসাদের দিকে পা বাড়াল। মন্ত্রীর ওপর ভীষণ বিরক্ত হল। এ নিশ্চয় ঐ বুড়ো ভামের কারসাজি। আবার নিশ্চয় রাজার কান ভাঙিয়েছে।

(৮)

রাজা সিংহাসনে বসেছিল। একপাশে চন্দনচর্চিত উৎসবের বেশে যুবরাজ। অন্যপাশে গম্ভীর-মুখো মন্ত্রীটা। পাত্র-মিত্র-সভাষদ-অভ্যাগত আরও অনেকে। কোটাল এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

রাজা মুখ তুলে বলল, পটুয়াকে তো সরিয়ে দিয়েছ।

কোটাল চমকে উঠল।

রাজা বলে চলল, তা ভালই করেছ। সে বেটা যে স্পর্ধা দেখিয়েছে তাতে তাকে বাঁচিয়ে না রাখাই ভাল। তবে সে একটা নাম বলেছিল, রাহাদা। শুনেছ নিশ্চয়?

হ্যাঁ মহারাজ।

এই রাহাদাটি কে?

আমাকে একটু সময় দিন মহারাজ, আমি ঠিক খুঁজে বের করব।

তা হলে তাই কর। তবে একটু তাড়াতাড়ি কর।

কোটাল রাজাকে অভিবাদন করে বিদায় নিল।

(৯)

কোটাল এসে তার সাঙাতের সঙ্গে কথা বলল। ঝানু থানাদারদের বুদ্ধি নিল। অপরাধ জগতের অসম সাহসীদের সঙ্গেও পরামর্শ করল। তারপর সাঁহসে ভর করে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। অভিবাদন করে বলল, মহারাজ! উপকোটাল ইতিমধ্যেই সব খুঁজে বের করে ফেলেছে! আপনাদের সম্মুখে সে-ই সব বলবে!

রাজা উপকোটালের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, বল!

উপকোটাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মহারাজ! রাহাদা আসলে শ্মশানের মাতাল মন্মথ রাহা। কিন্তু সে তো সেখানে ছিল না! আর সে কেন পটুয়াকে পট আঁকার নির্দেশ দেবে। রাজা এরকম প্রশ্ন করবে সেটা উপকোটাল ভাবতে পারেনি। কোটালও তাকে বলেনি। সেজন্য সে এরকম প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতও ছিল না। তাই একটু থতমত খেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবতে লাগল, এবার কি বলা যায়? কোটাল তো তাকে অন্য কিছু বলতে বলেনি। সে নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, মহারাজ! তা হলে রাহাদা ঐ সাফাইওয়ালা অনন্ত রাহা!

কিন্তু অনন্ত রাহা তো ছমাস আগে পূর্ব দেশে তার বাড়ি চলে গেছে।

তাই বুঝি। উপকোটাল দারুণ ঘাবড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, তা হলে মহারাজ! রাহাদা ঐ বাতিকর, স্বপন রাহা; আমাদের কোটাল, তপন রাহা কিছুতেই নয়।

লিপিকার উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে জানতে চাইল, মহারাজ! আমরা কি আরও কোন গল্পের জন্য অপেক্ষা করব? না এইটাই শেষ গল্প বলে লিপিবদ্ধ করব?

রাজা গম্ভীর স্বরে বলল, তোমাদের আর কিছুই করতে হবে না। যা করার আমিই করছি। মন্ত্রীর দিকে ঝুঁকে বলল, মহামন্ত্রী, এক্ষুনি কোটালের সাথে উপকোটালকেও বরখাস্ত করুন।

(১০)

কোটাল সংজ্ঞা হারিয়ে রাজপ্রাসাদেই পড়ে গেল। প্রহরীদের পরিচর্যায় জ্ঞান ফিরতেই মাদুলির কথা মনে পড়ল। ঐ অবস্থাতেই বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগল। বাড়ীতে এসে দেখল, তার পত্নী বহুমূল্য রত্নসম্ভারে সজ্জিত হয়ে বসে আছে। কোটালের মনে হল, এই মহিলাই সমস্ত নষ্টের মূল। নিশ্চয় রাজার সঙ্গে এর গোপন মেলামেশা আছে। না হলে রাজাটা অমন হয়ে গেল কেন? নিশ্চয় ঐ মাদুলিটার জন্যে! সে তাড়াতাড়ি করে সিন্দুকের চাবি খুলল। আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগল। কিন্তু মাদুলিটা পেল না। তখন সে অধৈর্য হয়ে স্ত্রীকে ডাকল। সেও বারবার খুঁজতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই পেল না।

হতাশ হয়ে কোটাল স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, তুই থুলি!

স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে জানতে চাইল, মুই থুলি?

কোটাল আবার উচ্চারণ করল, তুই থুলি। কোটালপত্নী সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করল, মুই থুলি? কিন্তু মাদুলিটা তারা কিছুতেই পেল না। আর তুথলি-মুথলি করতে করতে মনের দুঃখে নিজেরাই তুথলি-মুথলি হয়ে গেল। সানু দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানতে চাইল, দাদা, সত্যি-সত্যি ওরকম হয়?

ঠাকুর্দা হেসে উত্তর দিল, গল্পের রাজ্যে তো হয়।

প্রত্যাবর্তন

দরজায় খটখট শব্দ শুনে এম এল এ বিকাশবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম জড়ানো দুটো চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করলেন। দেখলেন, ফর্সা হয়নি। এই সাত সকালে আবার কে জ্বালাতে এল ?

আবার খটখট শব্দ হল। নিশ্চয় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হাসপাতালে সিট খালি নেই। তবুও ভর্তি করতে হবে। না হলে কারও ছেলেকে পুলিসে ধরেছে। জামিন-অযোগ্য অপরাধ। তবুও জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিকাশবাবুর বিরক্ত লাগে। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করার উপায় নেই। ওপরে অভিযোগ যাবে। পার্টির কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। তাও দেওয়া যায়। কিন্তু ভোট চাইতে গেলে সবাই কৈফিয়ত চাইবে। এম এল এ হওয়ার এই এক ঝকমারি ! তিনি বিছানার ওপর উঠে বসলেন।

আবারও খট্‌খট্‌ শব্দ হল। বাবা একেবারে তর সইছে না ! বিকাশবাবু চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে পড়লেন। দরজা খুলেই দেখলেন, থানার ও সি কৃপাসিন্ধু সাহা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে গেল, 'আপনি এত সকালে ?'

কৃপাসিন্ধুবাবু অপরাধীর মত মুখটা কাঁচুমাচু করে বললেন, 'আপনাকে অসময়ে ডেকে তুললাম। কিন্তু কী করব বলুন ? এসব কথা তো আবার সকলের সামনে বলাও যায় না।'

'কোন কথা ?'

'আমার বদলির ব্যাপারটা স্যার ! আপনি যদি দয়া করে, আর একটি বছর আমাকে এখানে রাখার জন্য বড় সাহেবকে একবার বলে দিতেন ?' এখানে আরেক বছর থাকার জন্য কৃপাসিন্ধুবাবু এর আগেও বিকাশবাবুর কাছে দরবার করেছেন। তিনি বলেন, 'ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করছে। এখনি বদলি হলে খুব অসুবিধা হবে।' বিকাশবাবু জানেন, ওসব বাজে কথা। আসলে এ থানায় উপ্‌রি পাওনা অনেক বেশি। বর্ডারের ওপরে থানা। সকলের চোখের সামনে স্মাগলিং হচ্ছে। প্রতিটি স্মাগলার পার্টিরই থানার সঙ্গে 'মাছুলি মিট'। অর্থাৎ যত বেশি স্মাগলিং, তত বেশি পয়সা। আর স্মাগলিং মানেই দলাদলি, রেষারেষি, খুন-জখম। যত বেশি খুন, থানায় তত বেশি পয়সা। কৃপাসিন্ধুবাবু সেই থানার বড়বাবু। বড়বাবু মানেই পাওনার বড় অংশ। সে জন্যই তিনি এখানে থাকতে চান। তবুও বিকাশবাবু তাঁর জন্য এস পি সাহেবকে বলেছিলেন। কিন্তু এস পি সাহেব রাজি হননি। বলেছেন, 'ওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। আর রাখা ঠিক হবে না।'

বিকাশবাবু আর কিছু বলতে পারেননি। তাঁর নিজেরও মনে হয়েছে, কৃপাসিন্ধুকে এখানে আর রাখা ঠিক নয়। কিন্তু সামনাসামনি সে কথা বলা যায় না। আর যা-ই হোক কৃপাসিন্ধু তাঁদের কথা শুনে চলেন। তাছাড়া কৃপাসিন্ধুর সঙ্গে অনেকেরই খাতির। যদি কাউকে ধরে বদলিটা রদ করিয়েই নিতে পারে। তখন তো কাউকে ধরা বা ছাড়ার জন্য তাঁকেই বলতে হবে। কাজেই এক্ষুনি তাঁকে 'না' বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আমি দেখব।'

'আপনি দেখলেই হয়ে যাবে স্যার।' মাপ করা মিষ্টি হাসি হেসে কৃপাসিন্ধুবাবু বিদায় চাইলেন, 'এখন তা হলে আসি স্যার ? সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বিকাশবাবু দরজা বন্ধ করলেন।

কাল রাতে মিটিং করে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। আজ আবার ঘুম না ভাঙতেই ডাকাডাকি। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। বিকাশবাবুর ইচ্ছে একটু গড়িয়ে নেন। সে জন্যই তিনি শোবার ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর স্ত্রী অনিতা ততক্ষণে উঠে পড়েছে। সে ব্যাজার মুখে বসে আছে। বিকাশবাবু কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'কি হয়েছে ?' অনিতা কাতর স্বরে উত্তর দিল, 'বাঁদিকের বুকটা আবার ব্যথা করছে।'

'তোমাকে কতবার বললাম, একবার ডাক্তার দেখিয়ে নাও।'

'আমি তো দেখাতেই চেয়েছিলাম। তোমারই সময় হল না।'

'আমি তো বলরাম ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেই রেখেছিলাম। তুমিই দেখাতে রাজি হলে না। বললে লেডি ডাক্তারকে দেখাব।'

'না হলে কি তোমার বলরাম ডাক্তারকে বুক খুলে দেখাব ?'

'অসুখ হলে ডাক্তারকে দেখাতেই হয়। অত ল্যাড-লেডি বিচার করলে চলে না।'

'চলবে কী করে ? এই যে রাত না পোহাতেই উঠে রাজকার্য শুরু করেছ। চলবে অর্ধেক রাত পর্যন্ত। চলবে কী করে ?'

বিকাশবাবু বুঝলেন। অনিতার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর এই এক সমস্যা। স্বামীর সুবিধা-অসুবিধা সে কিছুতেই বুঝতে চায় না। আর অসময়ে কেউ বিরক্ত করলেই একদম ক্ষেপে যায়। এখন কথা কাটাকাটি করে কোনও লাভ নেই। শুধু অশান্তি বাড়বে। তার থেকে এ স্থান ত্যাগ করাই ভাল।

গড়িয়ে নেওয়ার বাসনা বিসর্জন দিয়ে তিনি বাইরের ঘরে এসে বসলেন। কিন্তু সেখানেও শান্তি নেই। ছোট ভাই অলোক এসে বলল, 'দাদা, আমার আবার হলুদ প্রস্রাব হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। কবে নিয়ে যাবেন ?' বিকাশবাবুর অসহ্য লাগল। তাঁর ব্যস্ততার কথা যদি বাড়ির একটা লোকও মনে রাখে ! আর যত অসুখ কী তাঁর বাড়ির লোকদেরই হতে হয় ? তিনি রাগের সঙ্গে বললেন, 'আমি কাউকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারব না।'

অলোক মুখ বিবর্ণ করে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। তার করুণ মুখটার দিকে তাকিয়ে বিকাশবাবুর মায়া হল। মনে হল, তাকে এমনভাবে ধমকানো ঠিক হয়নি। কিন্তু কী করা যাবে ? পরে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। দেবেনকে আসতে দেখে তিনি একটু স্বস্তি পেলেন।

দেবেন সামনের চেয়ারটায় বসে বলল, 'কী ব্যাপার ? আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?'

'ব্যাপার আছে বস।'

'বলে ফেলুন। না হলে আবার লোকজন চলে আসবে।'

'সবাই বলছে হাসপাতালের ডাক্তার চক্রবর্তী রোগীদের একদম দেখছেন না। হাসপাতালের কোয়ার্টারসেই পয়সা নিয়ে প্র্যাকটিস করছেন। আর ওষুধপত্র যা আসছে, সব বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছেন। কী করা যায় বল তো ?'

'কী করতে চান ?'

'বদলির জন্য সি এম ও এইচ-কে বলি ?'

'কিন্তু পরের জন যদি এর থেকেও খারাপ হয় ?'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে।'

'ডাক্তার চক্রবর্তী তাও আমাদের কথা শোনেন। কাউকে ভর্তি করা জন্য বললে তৎক্ষণাৎ ভর্তি করে নেন। আমরা বললে, পুলিস কেসের ইনজুরি-রিপোর্টগুলো ঠিক করে দেন। আর

ওষুধ বিক্রির কথা বলছেন ? তাতে আমাদের কিছু ছেলেও করে খাচ্ছে। বন্ধ হলেই এসে চাকরি চাইবে। আপনি ওদের চাকরি দিতে পারবেন ?'

'কিন্তু এতে আমাদের দুর্নাম হচ্ছে। এরকম চললে লোক আমাদের ভোট দেবে কেন ?' 'তারও ব্যবস্থা আছে। চলুন, একদিন মিছিল করে হাসপাতাল ঘেরাও করি। 'বলি, হাসপাতালের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। চক্রবর্তীকে আগে থেকে বলে রাখব। তিনিও চটবেন না। আর লোকেও মনে করবে, আমরা হাসপাতালের দুর্নীতি দূর করার জন্য সংগ্রাম করছি।'

'এই জন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠাই। এরকম বুদ্ধি এখানে আর কারও মাথায় খেলে ? তুমি ব্যবস্থা কর। দিন ঠিক হলে আমাকে জানিও। মিছিলে আমিও থাকব।'

'সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারটার কী করলেন ?'

বিকাশবাবু মুশকিলে পড়লেন। মাত্র মাস তিনেক হল, ভদ্রলোক এখানে এসেছেন। ভালভাবে কাজ করছেন। এলাকার অধিকাংশ লোক তাঁর কাজকর্মে খুশি। এমন লোককে কী করে বদলি করানো যায় ? কিন্তু দেবেনও নাছোড়বান্দা। ছিনে জোঁকের মত গায়ে লেগে আছে। 'বদলি করাতেই হবে।' তাঁকে মিথ্যা করেই বলতে হল, 'একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে বলেছিলাম। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, প্রভাতবাবু মাত্র কয়েক মাস হল এসেছেন। তাছাড়া কর্মঠ এবং সৎ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তাঁর নামও আছে।

'বিকাশদা, সততা ধুয়ে কি আমরা জল খাব ? উনি এসে সব গণ্ডগোল করে দিচ্ছেন। আপনি তো জানেন, অসীমটা এখন আমাদের সঙ্গে আছে। গত ভোটের সময় আমাদের হয়ে খেটেওছে। ও টেন্ডারগুলো সব ডেকে নিত। তারপর একটা মার্জিন রেখে কন্ট্রাক্টরদের মধ্যে ভাগ করে দিত। যা পেত তার থেকে আমাদেরও কিছু দিত। কিন্তু প্রভাতবাবু এসে সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। বলছেন, রেজিস্টার্ড ফার্ম ছাড়া কাউকে টেন্ডার ডাকতে দেওয়া হবে না। আর যে ডাকবে কাজ তাকেই করতে হবে। তাহলেই বুঝুন, আমাদের সঙ্গে কেমন অসহযোগিতা করছেন !

'আচ্ছা, আর একবার বলে দেখি।'

বৃদ্ধ ভবেনবাবুকে আসতে দেখে দেবেন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। যাবার আগে ছোট্ট করে বলল, 'দেখুন, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।' ভবেনবাবু এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা পুরনো পার্টি কর্মী। বিকাশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁকে স্বাগত জানালেন। বললেন, 'আপনি আবার কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন ? একটা খবর দিলে আমিই যেতাম।'

ভবেনবাবু চেয়ারে বসলেন। হাতের লাঠিটা হাতলে হেলান দিয়ে রেখে বললেন, 'এখন তুমি এম এল এ সাহেব হয়েছ। নানান কাজে ব্যস্ত থাক। তাছাড়া সব সময় লোকজন দেখা করতে আসে। তাই আমিই এলাম। তা যে জন্য আসা, স্কুলের মাস্টাররা ছেলেমেয়েদের একদম পড়াচ্ছে না। যারা লেখাপড়া জানে তারা বাড়িতে পড়িয়ে দিচ্ছে। আর যাদের পয়সা আছে তারা মাস্টার রেখে পড়াচ্ছে। কিন্তু যারা লেখাপড়া জানে না এবং যাদের পয়সাও নেই তাদের ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ? তুমি একটা ব্যবস্থা কর।'

'কী করব, বলুন ?'

'স্কুল ইনস্পেক্টরদের মাস্টারদের কাজ দেখতে বল। তাতে কাজ না হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও।'

ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মাস্টাররা অধিকাংশই তাদের পার্টি করে। ভোটের সময় তারাই প্রধান ভরসা। এখন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে তারা সব বেঁকে বসবে। কিন্তু ভবেনবাবুকে তা বোঝানো সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ঠিক কাজ

করলেই লোক সঙ্গে থাকবে। তিনি কিছুতেই মানতে চান না যে, এখন সবাই সঙ্গে থাকে শুধু স্বার্থের জন্যে। বিকাশবাবু অস্বস্তিতে পড়লেন। আমতা আমতা করে বললেন, 'দেখি, ডি-আই-এর সঙ্গে কথা বলি। একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

রমজান এসে পড়ায় তিনি বেঁচে গেলেন। ভবেনবাবু উঠে পড়লেন। বিকাশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে এলেন। রমজান কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই মণ্ডল পাড়ার চোঠু মণ্ডল এসে পড়ল। চোঠু মণ্ডল হাত জোড় করে বলল, 'ছেলেডা হাই ইস্কুল পাস দিয়্যা বোস্যা আছে। কুথাও ঢুকিয়্যা দেন।' বিকাশবাবু জানেন, চোঠুর ছেলে নামেই মাধ্যমিক পাস করেছে। কিন্তু নাম-ঠিকানা লেখা তো দূরে থাক, ক লিখতে কলম ভাঙে। সব বি এ-এম এ পাস করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ছেলের চাকরি হবে কী ? কিন্তু চোঠুকে সে কথা বোঝানো অসম্ভব। তিনি বললেন, এই মুহূর্তে তো কোনও পোস্ট খালি নেই। খালি হলে চেষ্টা করে দেখব।'

চোঠু মণ্ডল চলে গেল। কিন্তু রমজান তার কথা শুরু করার আগেই মাঠপাড়ার আমির আলি মোল্লা হাজির হল। মোল্লাকে দেখে বিকাশবাবু অস্বস্তিতে পড়লেন। গত ভোটের সময় তাদের পাড়ায় একটা টিউবওয়েলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেটা এখনও হয়নি। মাঝে তিনি সভাপতি মণ্টুকে বলেওছিলেন। মণ্টুও রাজি হয়েছিল। কিন্তু বি ডি ও টা বাগড়া দিল। বলল, ইরেগুলার হবে। আরে বাবা, তোকে যদি পাঁচ বছর অন্তর ভোট চাইতে যেতে হত তা হলে দেখতাম, কত রেগুলার কাজ করিস। কিন্তু মোল্লাকে তো আর সে কথা [illegible] না। মোল্লাকে বললেন, 'কথা বলে রেখেছি। খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে। মোল্লার চোখদুটো চকচক করে উঠল। পাড়ার লোককে খবরটা দিতে হবে।

মোল্লা বেরিয়ে যেতেই রমজান নড়েচড়ে বসল। এটা তার কথা শুরু করার পূর্বলক্ষণ। রমজান স্থানীয় বিড়ি কারখানার শ্রমিক। তার মতে, সে একজন গুরুত্বপূর্ণ পার্টি কর্মী। তাই যার তার সামনে কথা বলতে পারে না। আর অযাচিতভাবেও বলতে চায় না—বিশেষ করে এতক্ষণ বসে থাকার পর। এম এল এ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'বল, রমজান, তোমার কী খবর ?'

রমজান গম্ভীরভাবে বলল, 'খবর ভাল নয়। কালাম, রমেন এরা সব প্রচার করছে, আপনি সারা বছর কৃষি মজুরদের নিয়েই আছেন। কারখানার শ্রমিকদের স্বার্থ দেখছেন না।'

বিকাশবাবু কৌতূহলী হওয়ার ভান করে প্রশ্ন করলেন, 'তাই ? ওরা ঐসব বলছে ?'

রমজান আরও গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, 'বলছে।' বিকাশবাবু মনে মনে খুশি হলেন। তিনি প্রধানত কৃষক নেতা। কিন্তু এম এল এ হওয়ার পর থেকে কৃষি সংগঠনের দিকে ততটা মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। সেই সুযোগে তাঁর পার্টিরই কিছু নেতা অপপ্রচার শুরু করেছিল। সেটা বন্ধ করার জন্যই তিনি কৃষি মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি করার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু শুধু কাজ করলেই চলে না। প্রচারেরও দরকার। তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন যে, সারা বছর শুধু কৃষি মজুরদের নি[illegible]ছেন। কারখানার শ্রমিকদের স্বার্থ দেখছেন না। তা মনে হচ্ছে, ফল হয়েছে। এবার পার্টি থেকেই তাঁকে কারখানার শ্রমিকদের স্বার্থ দেখতে বলবে। কৃষকদের থেকে কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করা অনেক সহজ। আর লাভজনকও।

এবার এই নারায়ণ বেটাকে জব্দ করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। বেটা খুব গরিব-দরদী হয়ে উঠেছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে বলে, একটা স্কুলও খুলেছে।

নিশ্চয় সেটা সামনেরবার ইলেকশ্যানে দাঁড়াতে চায়। না হলে অত আঠা কীসের ? কিন্তু বাছাধন এম এল এ হওয়ার সাধ তোমার পূর্ণ হচ্ছে না। দেবেন জগাকে যখন লাগিয়েছে ; সে আজ হোক কাল হোক তোমাকে সাবাড় করবেই। বিকাশবাবুর চোখমুখ উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

রমজান কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, এরকম খারাপ খবর শোনার পরও এম এল এ সাহেব খুশি হন কী করে ? ভাবছিল, জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করার আগেই জগা আর মুস্তাকিম ঘরে ঢুকল। ঢুকেই জগা বলে উঠল, 'বিকাশদা শালাকে সাবড়ে দিয়েছি।'

বিকাশবাবু আঁতকে উঠলেন, 'তা তোরা এখানে কেন ? দেবেনের কাছে যা।'

'দেবেনদা যে বলল, আপনার মতেই কাজ হচ্ছে।'

বিকাশবাবু মুখের ওপর তর্জনী তুলে ইঙ্গিতে জগাকে চুপ করতে বললেন। রমজানের দিকে চেয়ে বললেন, রমজান, তুমি একটু বাইরে বসবে ? আমাদের কিছু গোপনীয় কথা আছে।' রমজান ক্ষুণ্ণ মনে বেরিয়ে গেল। বিকাশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'একেবারে শেষ করে দিয়েছিস ?'

'একেবারে শেষ। গাড়ি করে আসছিল। বোম মেরে উড়িয়ে দিয়েছি।'

'তোরা ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। ঝামেলা না থিতানো পর্যন্ত আসবি নে।'

'ঠিক আছে। কিছু মাল-কড়ি ছাড়ুন।'

'সে কী রে ? এই তো সেদিন দেবেন হাজার টাকা নিয়ে গেল !'

'ও তো শালা বোমা বানাতেই ফুরিয়ে গেছে। মাইরি বলছি। হাতে কিছু নাই। কিছু ছাড়ুন।'

বিকাশবাবু বিরক্ত হলেন। কিন্তু করার কিছু নেই। পকেট থেকে একশ টাকার দুটো নোট বের করে জগার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। জগা নাক উঁচিয়ে বলল, 'ওতে তো শালা ট্রেনের ভাড়াই হবে না। দুটো মানুষ খাব কী ?' বিকাশবাবু কোনও কথা না বলে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। হাজার খানেক টাকা এনে জগার হাতে দিলেন। টাকাগুলো নিয়ে জগা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে মুস্তাকিমও।

বিকাশবাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তা হলে নারায়ণটা দূর হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি সদরে বেরিয়ে পড়লেন। এস পি সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে রাখতে হবে। পরে দরকার হলে বলা যাবে, 'আমি সেদিন সদরেই ছিলাম। আপনার সঙ্গেও ছিলাম অনেকক্ষণ।' তা হলে আর কে ধরে ? তবে দেবেন তাঁর নামটা জগাদের না বললেই পারত।

এস পি সাহেবের ঘরে ঢুকতেই ফোনটা বেজে উঠল। সেটা কানে লাগিয়েই এস পি সাহেব ভ্রূ কুঁচকালেন, কী বলছেন ?' নামিয়ে রেখে বললেন, 'আপনাদের ওখানে এ সি এম ও এইচ, মি দত্ত খুন হয়েছেন।' বিকাশবাবু তো আকাশ থেকে পড়লেন, 'কী বলছেন আপনি ?'

'কৃপাসিন্ধুবাবু তাই বললেন।'

বিকাশবাবু মনে মনে খুশিই হলেন। এ সি এম ও এইচ-এর মার্ডারের গণ্ডগোলে নারায়ণের মার্ডারটা ধামাচাপা পড়ে যাবে। তিনি এস পি সাহেবের সঙ্গেই রওনা হয়ে গেলেন।

বীভৎস। গাড়িটা চুরমার হয়ে গেছে। মি দত্তের ডান হাতটা ছেড়ে গেছে। বুকের মাংস উড়ে গেছে। হাড়গুলো কুচি-কুচি হয়ে গেছে। বাতাসে তখনও বারুদের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। এস পি সাহেব সঙ্গে করে কুকুর নিয়ে এসেছিলেন। কুকুরটা এদিক-ওদিক শুঁকে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ সে চলতে শুরু করল। সঙ্গে তার প্রশিক্ষক। পিছনে পিছনে সমস্ত লোক। কুকুরটি গিয়ে একটা পুকুর পাড়ে উঠল। পাড় থেকে জলের ধারে নেমে মাটি শুঁকতে লাগল। দেখা

গল, ওখানে নরম মাটির ওপরে কয়েকটা পায়ের ছাপ। পুলিস 'প্লাস্টার অব প্যারিস' দিয়ে ছাপ তুলে নিল। আর সুরতহাল করে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে ল। এস পি সাহেব চলে গেলেন। বিকাশবাবু বাড়ি ফিরলেন।

বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল মণ্টু। বিকাশবাবু ফিরতেই সে বলল, বিকাশদা আমি আপনার জন্যই বসে আছি।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'মি দত্তকে খুন করেছে জগা আর মুস্তাকিম। অনেক লোকেই দেখেছে।'

বিকাশবাবু চমকে উঠলেন। তার মানে, তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েও তারা গা ঢাকা য়নি। আবার মি. দত্তকে খুন করেছে। স্কাউন্ড্রেল। দেবেন কেন যে ওদের এত বেশি পাত্তা য়। নাও এবার সামলাও।

কিন্তু তাঁর এখন উত্তেজিত হলে চলবে না। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, ্যাপারটা কী বল তো?'

মণ্টু বলল, 'জগা আর মুস্তাকিম ডাক্তার চক্রবর্তীর সহযোগিতায় হাঁসপাতালের ওষুধগুলি য়ে এসে বৈদ্যনাথ ফার্মেসিতে বিক্রি করত। মি. দত্ত কোনও সূত্রে খবর পেয়ে থাকবেন। তনি নিজ পরিচয় গোপন করে বৈদ্যনাথ ফার্মেসিতে ওষুধ কিনতে আসেন। তাঁকে সপাতালের ওষুধই বিক্রি করা হয়। তিনি সঙ্গে করে সাদা পোশাকের পুলিস নিয়ে সেছিলেন। পুলিস ফার্মেসি সার্চ করে হাসপাতালের সব ওষুধ সিজ করে। থানায় বৈদ্যনাথ র্মেসির নামে কেস স্টার্ট হয়। তাতে জগা, মুস্তাকিমের সঙ্গে দেবেনদার নামও আছে। কসটা জোরদার হয়েছে এই জন্য যে, মি. দত্ত তখুনি হাসপাতালে গিয়ে সরবরাহ করা ওষুধ াননি। তিনি খুব সম্ভবত আজ আবার হাসপাতালে সরজমিনে তদন্ত করতে আসছিলেন। ন্তু হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই এই ঘটনা। 'জগা আর মুস্তাকিম ব্যাগের মধ্যে বোম য়ে বি. ডি. ও. অফিস মোড়ে বসেছিল।'

সব শুনে এম. এল. এ. বিকাশবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দেবেনও সব কিছু গোপন করে জের স্বার্থে তাকে ব্যবহার করেছে। তিনি গলাটা নামিয়ে মণ্টুর কাছে জানতে চাইলেন, ী করা যায় বল তো?'

'যা করার তাড়াতাড়ি করুন। কারণ ব্যাপারটা সবাই জেনে ফেলেছে।

পুলিসের কানেও উঠেছে। মণ্টু উঠে পড়ল।

বিকাশবাবু ভাবতে লাগলেন। কিন্তু নারায়ণের লাসটা গেল কোথায়? লাসটাকে কি কেবারে গায়েবই করে দিল? তা বেটারা এটাকেও ওরকম করলেই তো পারতিস। ঝামেলা টে যেত।

বিকেল বেলায় পাল পাড়ার পরেশ এল। সে খবর দিল, 'ওরা মস্ত মিছিল বের করেছে। নের জন্য আমাদের দোষ দিচ্ছে। নারায়ণবাবু তো আপনার নাম করে বলছে। বলছে, 'মি. ত্তকে আপনি লোক লাগিয়ে খুন করেছেন।' নারায়ণের নাম শুনে বিকাশবাবু যেন দিনের লাতেই ভূত দেখে আঁতকে উঠলেন! তা হলে নারায়ণ এখনও বেঁচে আছে। ওরা রায়ণকে খুন করেনি। অথচ সুকৌশলে তাঁকে মি. দত্তের খুনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। তনি দেবেনকে ডেকে পাঠালেন।

দেবেন এসে জগাকে গালাগালি করতে লাগল, 'হারামজাদা জগাটা এক নম্বরের মকহারাম। শালা আমাদের সঙ্গে থাকলেও তলে তলে নারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত রায়ণের পরামর্শেই শালা খুন করেছে। কিন্তু সবাই জানে ও আমাদের শেলটারে ছিল।

তাছাড়া খুন করার পরও' আপনার বাড়িতে এসেছিল। এখন আমরাই ফাঁসব। শালাে
একবার হাতে পেলে।'

বিকাশবাবু দাঁতে দাঁত চেপে রাগ সামলে বললেন, 'হাতে পেলে যা করবে সে কথা পে
ভেব। আপাতত কী করলে মুখরক্ষা হয় সেই চিন্তা কর।'

দেবেন চুপ করে চিন্তা করতে লাগল। একটু পরে প্রস্তাব দিল, 'আমরা প্রচার করে দি
যে, মি. দত্তের গাড়ি একটা ছেলেকে ধাক্কা দিয়েছিল। সেই নিয়ে বচসা। উত্তেজিত জনত
তাকে পিটিয়ে মেরেছে। রাগের চোটে তাদেরই কেউ বোমা ছুঁড়ে মেরেছে।'

দেবেনের বক্তব্য তাঁর গ্রহণযোগ্য মনে হল না। কিন্তু তার কূটকৌশলে তিনি মুগ্ধ ন
হয়ে পারলেন না। অন্তত বলার মত কিছু পাওয়া গেল। মনের সে ভাবটা গোপন রেখে
তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু কোন্ ছেলেকে ধাক্কা মেরেছিল ?'

'সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।' দেবেন উঠে পড়ল।

রাতের বেলা এলেন কৃপাসিন্ধুবাবু। তিনি বললেন, 'ওরা থানায় ডেপুটেশান দিতে
এসেছিল। বলল, খুন নাকি আপনারাই করিয়েছেন। নারায়ণবাবু তো আপনার নাম করে
বললেন। বললেন, আপনি নাকি নিজে হাতে জগাকে টাকা দিয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে বোম
বানিয়ে জগা খুন করেছে।'

বিকাশবাবুর অস্বস্তি হল। তা হলে কি কৃপাসিন্ধুবাবু সত্যিই সব কিছু জেনে ফেলেছেন
সেটা আঁচ করার জন্যই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বিশ্বাস হয় ?'

'একদম হয় না স্যার। ওদেরকেও বললাম। বললাম বিকাশবাবু অত্যন্ত সজ্জন লোক
তিনি এ-কাজ করতেই পারেন না।' তবে আমার বদলির ব্যাপারটা একটু দেখবেন স্যার

'নিশ্চয় দেখব।'

'বড় সাহেব আবার একটা রিপোর্ট চেয়েছেন স্যার। কী লিখি বলুন দেখি ?'

'লিখুন, মি. দত্তের গাড়ি একটা ছেলেকে ধাক্কা মারে। সেই নিয়ে বচসা শুরু হয়। বচস
থেকে হাতাহাতি। মারামারি। উত্তেজিত জনতা মি. দত্তকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে!'

'কিন্তু স্যার, বোমার ব্যাপারটা ?'

'জনসাধারণের মধ্যে একজন ছুঁড়ে মেরেছে।'

'আমি তাই লিখে দিচ্ছি। তবে আমার বদলির ব্যাপারটা একটু দেখবেন স্যার।'

কৃপাসিন্ধুবাবু চলে গেলেন। এম. এল. এ. বিকাশবাবু একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

সপ্তাহ দুয়েক পরে পরেশ খবর নিয়ে এল। জগা আর মুস্তাকিম দেবেনের বাড়িতে
আছে। হাইকোর্টে আগাম জামিনের জন্য দরখাস্ত করেছে। বিকাশ এম এল এ-র ইচ্ছে করে
কৃপাসিন্ধুবাবুকে খবরটা দিয়ে ধরিয়ে দেন। কিন্তু জগাকে বিশ্বাস নেই। শেষে কোর্টে যদি স
ফাঁস করে দেয়, তা হলে তাঁর ভরাডুবি হবে। এমনিতেই পার্টিতে তাঁর হেনস্থা কম হয়নি
জগা আর মুস্তাকিম যে মি. দত্তকে খুন করে তাঁর কাছে এসেছিল, তা চাপা থাকেনি। রমজান
নিজের চোখে দেখেছিল। রমজান বলেছিল মণ্টুকে। মণ্টু বলেছে মন্ত্রীকে। মন্ত্রী তাঁকে পার্টি
অসন্তোষের কথা জানিয়ে দিয়েছে। জেলা নেতৃত্বও সিদ্ধান্ত করেছে যে, তিনি জনগণের সঙ্গে
সংযোগ রাখছেন না বলেই এরকম ঘটনা ঘটছে। অর্থাৎ সামনের ইলেকশানে তাঁকে টিকি
নাও দেওয়া হতে পারে। এরপরে জগা যদি কোর্টে কিছু বলে দেয় তা হলে তো কোনও আশা
থাকবে না। তিনি বরং নিজেকেই সংশোধন করবেন। পরামর্শের জন্য তিনি ভবেনবাবুর কাছে
গেলেন।

সেবা

সকালবেলায়, অর্থাৎ বেলা সাড়ে এগারটার সময় থানেদার রাখহরি শর্মা মা কালীর পটের সামনে দাঁড়িয়ে একমনে প্রার্থনা করছিল। এমন সময় কে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। শরীরের সুন্দর সুগন্ধ থেকেই মনে হল, কোনও মালদার মহিলা। মা কালী তা হলে আজ মুখ তুলে চেয়েছেন। অবনত মস্তকে একটা নমস্কার করে সে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, মাদক-বিরোধী কমিটির কমলিকা বোস দাঁড়িয়ে। মহিলার চুল শ্যাম্পু করা। নীল রঙের দামী সিল্কের শাড়ি-ব্লাউজ পরা। কপালে একই রঙের টিপ। ঠোঁটে লিপস্টিক এবং গালে রুজ লাগানো। এত সাজগোজ করার পরও যে মহিলা কী করে সমাজসেবার জন্য সময় পায়, শর্মা বুঝতে পারে না। তবে সেই সুবাদে রাইটার্স থেকে লালবাজার সর্বত্র তার অবাধ গতিবিধি। মাঝে-মাঝে এর-ওর জন্য সুপারিশ করতে তার থানাতেও আসে। অধিকাংশই বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে কেস। আজ আবার কার জন্যে বলতে এসেছে, কে জানে? সকালবেলায় উঠে যত সব উটকো ঝামেলা। বিরক্তির ভাবটা গোপন করে, খুশি হওয়ার ভানে সে বলল,

'আরে, মিসেস বোস যে! কী ব্যাপার? বলুন!'

'আর বলবেন না।' মিসেস বোস প্রায় কেঁদে উঠল। 'বাবুবাগান বস্তিতে মাদক-বিরোধী মিটিং করতে গিয়েছিলাম। হিতেন গুন্ডার সাকরেদরা এসে হুজ্জুতি শুরু করল। মিটিং তো করতেই দিল না। স্টেজ-টেজ ভেঙে একাকার করে দিল। আমাকে চেয়ার থেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিচে ফেলে দিল। উঠে আবার আসতে গিয়েছি, কাপড় ধরে টানাটানি।' মিসেস বোস তার শাড়ির আঁচল খুলে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল।

'তার মানে আপনি বলছেন, ওরা আপনাকে ওরকম হাফ ন্যাংটো করে দিল?'

'হাফ কি বলছেন? একেবারে ফুল ন্যাংটো করে দিল। দেখাব কিরকম করেছিল?'

'না না। আর দেখাতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি বুকে কাপড় দিন।'

'বুঝতে যখন পেরেছেন, তা হলে এর ব্যবস্থা করুন।'

'নিশ্চয়। ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে।'

শর্মা বেল টিপল। দফা এসে দাঁড়ালে বলল, 'হাবিলদার হনুমান সিংকো বুলাও।' হনুমান সিং এসে স্যালুট করে দাঁড়াল। শর্মা বলল, 'ছে সিপাহি লেকে যাও। আর হিতেন গুন্ডাকো পাকাড়কো লে আও।' হনুমান সিং স্যালুট করে বেরিয়ে গেল। লোকজন নিয়ে বাবুবাগান বস্তিতে এসে দেখল হিতেন ঘোষের লোকেরা মিটিঙের তোড়জোড় করছে। মিসেস বোসের লোকেরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মিসেস বোস দেখিয়ে দিলেন, 'ওই ওখানেই আমরা মিটিং করতে চাইছিলাম।'

হনুমান সিং হিতেন ঘোষের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপলোগ ইনকো মিটিং করনে মে কিউ রোখা?'

'কেন বুঝব না বলুন হাবিলদার সাহেব?'

'মতলব?'

'আপনি তো জানেন, আমরা এলাকার লোক। সাক্ষরতা সমিতি করি। বস্তির লোকদের লেখাপড়া শেখার কোনও সুযোগ নাই। আমরা সমিতির সদস্যরা লেখাপড়া শেখাই। তার

জন্য সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে কিছু অর্থ সাহায্য পাই। এবারও দরখাস্ত করেছিলাম। কি নতুন এক মহিলা জয়েণ্ট সেক্রেটারি এসেছে। সে বলল, আমি আগে ইন্সপেকশান করব আজ সেই ইন্সপেকশনের দিন। এসে দেখি, আর এক মহিলা এসে গণ্ডগোল বাধিয়েছে বলে, আমরা মাদক-বিরোধী মিটিং করব। আরে বাবা, বস্তির লোকদের জন্য যখন অ দরদ, তখন এতদিন কোথায় ছিলি ?

'মুখ সামলে কথা বলুন।' মিসেস বোস ফুঁসে উঠলেন, 'এতদিন কোথায় ছিলি মানে আমরা আজ পাঁচ বছর ধরে এই বস্তিতে কাজ করছি। আমাদের প্রেসিডেণ্ট এই বস্তির ওপ কাজ করেই বিলেত গিয়েছেন। সাহেবরা তো আর বোকা নয়, যে এমনি এমনি স্কলারশি দিয়েছে !'

'আর আমরা যে বংশ পরম্পরায় আজ পাঁচ 'শ বছর এলাকায় আছি। আমার ঠাকুর এই বস্তির উন্নয়নের কাজের জন্যই সাহেবদের কাছ থেকে রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন তার বেলা ?' হনুমান সিঙের ব্যাপারটা বোধগম্য হল না। মিসেস বোসের কাছে এগিয়ে গি সে জিজ্ঞেস করল, 'এই বস্তিতে কাজ করার জন্য সাহেবরা আপনাদের প্রেসিডেণ্টে স্কলারশিপ দিল কেন ?'

'কী করে এই বস্তির উন্নতি করা যায় ; সে ব্যাপারে উনি একটা প্ল্যান তৈরী করেছিলেন সাহেবরা সেটা দেখে সন্তুষ্ট হল। তাই স্কলারশিপ দিল।'

'উনি তো স্কলারশিপ পেলেন। কিন্তু তাতে বস্তির লোকদের কি লাভ হল ?'

'লবডঙ্কা।' বিদ্রূপের সুরে উত্তর দিল হিতেন ঘোষ।

মিসেস বোস ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'আর আপনার ঠাকুরদা যে এদের উন্নয়নের জ রায়বাহাদুর হলেন। তাহলে আজও এদের উন্নতি হল না কেন ?'

'তাহলে যে আপনার প্রেসিডেণ্টের আর বিলেত যাওয়া হত না !'

'হত না মানে ? আমাদের কাজ কি আপনাদের সাক্ষরতা সমিতির মত ? স্কুলে-কলে লেখাপড়া-শেখা ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছি বলে পয়সা নিচ্ছেন ?'

'তবুও ওরা এই বস্তির ছেলেমেয়ে। আপনি যাদের ড্রাগের নেশা ছাড়িয়েছেন বলে শ করতে এসেছেন তাদের মধ্যে একজনও এই বস্তির লোক আছে ? সব তো পার্ক স্ট্রীট আ বালিগঞ্জের লোক নিয়ে এসেছেন।'

হাবিলদার হনুমান সিঙের আবার গোলমাল ঠেকল। হিতেন ঘোষের কাছে এগিয়ে গি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বলছেন, পার্কস্ট্রিট আর বালিগঞ্জের লোক এসে এই বস্তিতে থাকবে ?'

'আপনিও যেমন ? বস্তিতে থাকতে যাবে কেন ? আর বড়লোকের ঘরের ছেলেমেয়ে বস্তিতে থাকতেই বা পারবে কেন ? তবে মাদক-বিরোধী কাজে সরকারি সাহায্য নিতে হ বছরে অন্তত তিরিশজনকে মাদক ছাড়িয়েছে দেখাতে হয়। সেইজন্যই ওদের আনা হয়েছে অফিসার আসবে। প্রদীপ জ্বালানো হবে। ফুলের মালা দেওয়া হবে। খাওয়া-দাওয়া হবে ওদের হাজির করা হবে। ওরা শেখানো গল্প বলবে। টাকা গ্র্যাণ্ট হয়ে যাবে। বড়লোকে ছেলেমেয়েরা আবার যে যার ঘরে ফিরে যাবে

'তাতে বস্তির লোকেদের কি লাভ হবে ?'

'আমি তো আগেই বলেছি, লবডঙ্কা।'

'আপনাদের সাক্ষরতা সমিতি যে আরও ফাঁকাফক্কা।' মিসেস বোস ফুঁসে উঠলেন, 'ও চড়ে কি বস্তির লোকেরা স্বর্গে যাবে ?'

হনুমান সিং ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাম তো ওহি সোচ রহাঁ হুঁ। বস্তির লোকদের যখন কোন উপকার হবে না, তখন বস্তিতে মিটিং করা কেন ?'

'কিন্তু বস্তির নামে টাকা তো নিতে হবে।' ওদিক থেকে টিপ্পনি কাটল হিতেন ঘোষ। মিসেস বোস এবার খেঁকিয়ে উঠল। 'আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেকচার শুনবেন ? না, যা করতে এসেছেন, তাই করবেন।'

হনুমান সিঙের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। মনে পড়ল, থানেদারবাবু হিতেনকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে। সে হিতেন ঘোষের কাছে গিয়ে বলল, 'ঠিক হ্যায়, মিটিং নেহি করনা চাহিয়ে, লেকিন আপনে মিসেস বোসকি মডেস্টি কিঁউ আউটরেজ কিয়া ?' 'না, আমরা কেউ উনার গায়ে হাত দিইনি।'

'হামাকে বললে তো হবে না। থানাতে গিয়ে বলুন।'

'হিতেন ঘোষ ইশারায় হনুমান সিংকে পাশে ডাকল। রাস্তার পাশটায় সরে গিয়ে বলল, 'দেখুন পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার কথা আছে। পেলে পাঁচ হাজার টাকা আপনাদের দিয়ে দেব। আমাদের ইন্সপেকশনটা হতে দিন।'

পাঁচ হাজার টাকা নেহাত কম নয়। হাবিলদারের বেশ লোভ হল। কিন্তু মিসেস বোসের সঙ্গে থানেদারবাবুর কি কথা হয়েছে, সে জানে না। তাছাড়া নতুন ডি সি সাহেবের সঙ্গেও মিসেস বোসের বেশ জানাশোনা। হিতেনকে ছেড়ে দিলে ঝামেলা হতে পারে। সে বলল, 'হামকে বলনে সে কোই ফায়দা নেহি। যো বোলনা হ্যায় ও থানেদারবাবু সে বলিয়ে।' সে হিতেনের হাত ধরল। হিতেনের সঙ্গী-সাথীরা এসে ছাড়িয়ে নিতে চাইল। কিন্তু সিপাহিরা লাঠি বাগিয়ে ধরতে তারা ভয় পেয়ে গেল। দুজন রাইফেলধারী সিপাহিও ছিল। তারা এগিয়ে আসতেই সবাই সরে গেল।

হাবিলদার হনুমান সিং হিতেনকে ধরে থানায় নিয়ে গেল। থানেদার রাখহরি শর্মা চোখ পাকিয়ে বলল, 'কেন রে, তোদের কি আর বাইরে থাকার ইচ্ছে নেই ? সমাজসেবা করতে এসেছেন, তাঁদের ওপরও হামলা ?'

'হুজুর !' হিতেন হাত জোড় করে উত্তর দিল, 'নেশা দূর করার কথা যদি সমাজসেবা হয়, তাহলে নিরক্ষরতা দূর করার কথা সমাজসেবা নয় কেন ?'

'কে বলেছে সমাজসেবা নয় ? তোর যত খুশি কর। কিন্তু তাই বলে অন্য লোকের সঙ্গে হাঙ্গামা করছিস কেন ?'

মিসেস বোস সুযোগ পেয়ে টিপ্পনি কাটলেন, 'আমিও তাই বলেছিলাম, তোমাদের ইচ্ছে হলে তোমাদের মত কর, 'আমাদেরকে আমাদের মত করতে দাও ? সে কথায় কোনওরকম গুরুত্ব না দিয়ে হিতেন ঘোষ উত্তর দিল, 'স্যার আমরা যখন এলাকার লোকেরা করছিই তখন থেকে আসার দরকার কি ?'

'বারে। তুই তো মজার থিওরি বার করেছিস। কাল আমাকেই বলবি, আমরা যখন আছি, আপনার আসার দরকার কি ?'

'না স্যার তা কি বলতে পারি ?'

'বলতে যখন পারিস নে তখন উনারা মিটিং করবেন। যদি ফের হুজ্জুতি করিস, একটাকে হাজতে ঢুকিয়ে দেব। যান মিসেস বোস। আপনারা মিটিং করুন।'

মিসেস বোস গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে হিতেন ঘোষও। থানেদারবাবু ...ণ্ড করতে কোয়ার্টারে গেল।

বিশ্বাসের ওপারে

বরেন ভেবেছিল, কথাটা কাউকে বলবে না। কিন্তু ভাবনার আশ্রয় আর কল্পনার সার পেয়ে মনের মধ্যে কথাটা এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে আর চেপে রাখতে পারল না। স্ত্রীর কাছেই বলে ফেলল।

'সুমি জান, মুকুল বলছিল, আমাদের এখানে একটা সংস্থা হয়েছে। ওরা একে অপরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়।"

"মুকুলের মত নিশ্চয় ওদেরও কোন কাজ নেই। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়।"

"না, না, মোষ তাড়াবে কেন ? আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য ওরা একটা ফিজ নেয়।"

"আর গুল মেরো না। লোকের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। ফিজ দিয়ে আলাপ করতে যায়। বলি, ওরা কি ফিল্মস্টার না মিনিস্টার ?"

"না, না, সুমি। তুমি যা ভাবছ তা নয়।"

"তাহলে কী ?"

"তাহলে....ধরো, তুমি তো আমার স্ত্রী—।"

"আমি তো তোমার স্ত্রীই। এতে আবার ধরার কী আছে ?"

"ধরো আমাকে নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট নও ! তোমার মন ভরছে না। তুমি একজন মনের মত সঙ্গীর খোঁজ করছ। তোমার পছন্দের কথা বললে, ওরা সেরকম একজন লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবে।

"তারপর ?"

"তারপর তোমাদের ব্যাপার। তোমরা আলাপ করেই সন্তুষ্ট থাকতে পার। আবার ইচ্ছে করলে আগেও বাড়তে পার।"

"তাহলে তো ভাল খবর। তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার। যদি একজন মনের মানুষ জুটে যায়, ভালই হয়। আমার কোনও আপত্তি নেই।"

বরেনের এই হয়েছে এক মুশকিল। সুমিতার কোনও কিছুতেই আপত্তি নেই। বারো বছর তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সুমিতা ধর্মের ষাঁড়ের মত তাকে ছেড়ে রেখেছে। যেখানে খুশি যাও, যে ক্ষেতে ইচ্ছে মুখ দাও। কিন্তু খেতে মুখ দেওয়া দূরের কথা, বরেন ক্ষেতের আলেই পা দিতে পারে না। সুমিতার কথা মনে পড়ে যায়। তাব থেকে সুমিতা যদি তাকে শাসন-গর্জন করত, বাধা-নিষেধের মধ্যে পুরত, গলার দড়ি নিজের হাতে রাখত—বরেন বরং ফাঁক-ফুক বুঝে হেঁচকা টানে দু'এক গাবলা খেযে নিতে পারত।

সুমিতার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সে জামা-কাপড় পরতে লাগল। কলিং বেল বাজতে দরজা খুলে অফিসের ব্রিফকেসটা ড্রাইভারের হাতে দিল। সুমিতা দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "আজ কখন ফিরবে ?"

"অফিসের পর একটা জায়গায় যেতে হবে। তবে বেশি দেরি হবে না। আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যে ফিরে যাব।"

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। বরেন উঠে বসতেই সে দরজা বন্ধ করে গাড়ি স্টার্ট করল। সুমিতা খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

বরেন সুমিতার সঙ্গে এতদিন-সংসার করছে। কোনওদিন বড় রকমের একটা ঝগড়া-ঝাঁটি পর্যন্ত হয়নি। সুমিতা তাকে তার কোনও সুযোগই দেয়নি। সে কখন কোথায় যায়, কী করে তা নিয়ে সুমিতা কখনও মাথা ঘামায় না। সে যখনই ফেরে সুমিতা তার জন্য জেগে বসে থাকে। কাছে বসে খাওয়ায়। আর বিছানায় গেলে বরেনের ইচ্ছায় সুমিতার ইচ্ছা। কোনও ব্যাপারেই সে না বলে না। মাঝে তাদের ছেলে কাজল একটু বড় হলে সুমিতা লজ্জা লজ্জা করত। তাকে পুরুলিয়ার সৈনিক স্কুলে ভর্তি করে দিতে সে-ঝামেলাও নেই। কিন্তু সম্প্রতি সুমিতার শরীরে বরেন আর তেমন আগ্রহ বোধ করে না। সুমিতা কাছে এলেও তার শরীরে জ্বালা ধরে না। অথচ আগের তুলনায় সুমিতা এখন বেশি সাজ-গোজ করে।

প্রথম প্রথম সুমিতা সাজ-গোজ করত না। পার্টিতে যেতে চাইত না। প্রথম বছর অ্যানুয়াল ডিনারে সুমিতাকে সে বলতে গেলে জোর করেই নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিয়ে যাওয়াই সার। সুমিতা কারও সঙ্গে আলাপ করল না। ভাল করে খেলও না। এক কোণে চুপ করে বসে থাকল। বন্ধুদের কাছে বরেনের সে কী লজ্জা! 'এমন ব্যাকওয়ার্ড মেয়েকে বিয়ে করেছিস!'

সুমিতা আজ আর ব্যাকওয়ার্ড নেই। আস্তে আস্তে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এখন সে পার্টিতে যেতে অস্বস্তি বোধ করে না। বরেনের যে কোনও বন্ধুর সঙ্গে অসঙ্কোচে আলাপ করে নিতে পারে, স্নো-পাউডার-ময়েশ্চারাইজার মাখে। দৃষ্টি গভীর করার জন্য চোখের ভুরুতে আঁক কষে। নখে নেল-পালিশ লাগায়। ভুরভুর করে সেন্টের গন্ধ ছড়ায়। তবুও সুমিতাকে কেন যে তার আর আগের মত ভাল লাগে না! কোনও স্বামীরই বোধহয় তার স্ত্রীকে বেশিদিন ভাল লাগে না। সুমিতাও বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারে। না হলে সেদিন জিজ্ঞেস করবে কেন, 'আমাকে আর তোমার আগের মত ভাল লাগে না, না?' বরেনের ইচ্ছে করছিল, সত্যি কথা বলে দেয়, 'না।' কিন্তু পারেনি। কোনও স্বামীই পারে না। কোন্ স্বামীর ঘাড়ে দশটা মাথা আছে যে স্ত্রীকে বলবে, তাকে ভাল লাগে না। প্রতিটি স্বামীর স্ত্রীকে ভাল লাগতে বাধ্য। না লাগলে ঘোর অশান্তি। বুদ্ধিমান লোকেরা শান্তি ভঙ্গ করে না। দরকার হলে চোরা ট্রিপ মারে। সুমিতা বরেনের সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করে যে সে বেচারা চোরা ট্রিপের কথাও ভাবতে পারে না। ভাবতে গেলেই সুমিতার কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায়, সুমিতা তাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না।

সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের জেব্রা ক্রসিং দিয়ে কুড়ি-বাইশ বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল। তার চারপাশে যেন সৌন্দর্য ঠিকরে পড়ছে। যেমনি তার সোনার বরণ, তেমনি হালকা গড়ন। ঠিক যেমনটি হলে ভাল লাগতে পারে ঠিক যেন তেমনটি। পৃথিবীতে এরকম অনেক সুন্দর জিনিস আছে। পাওয়া দূরের কথা, বরেন এখন তাদের কথা ভাবতেও পারে না। এম এসসি পাস করার পর চাকরিটা পেয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুমিতাকে বিয়ে করে ফেলল। ওরকম হঠাৎ করে বিয়ে না করে, একটু খোঁজ-খবর করলে, এরকম একটি সুন্দরী মেয়ে সে পেয়েও যেতে পারত। এখন আর কোনও উপায় নেই। বরেনের খুব হতাশ লাগে।

অফিসের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়। দারোয়ান দরজা খুলে সেলাম ঠুকে খাড়া হয়। বরেন চেম্বারে ঢুকে আয়নার সামনে যায়। চুলটা ঠিক করে চেয়ারে বসতেই স্টেনো রীনা রায় ঘরে ঢোকে। টাইপ করা একটা কাগজ বরেনের হাতে দিয়ে পাশে দাঁড়ায়, "স্যার কালকের সন্ধ্যার ডিকটেশানটা।" বরেনের ডিকটেশান কারেক্ট করার চেয়ে রীনার দিকে চেয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে।

তার স্টেনো রীনা রায়ের গায়ের রঙ তেমন ভাল নয়। খুব জোর শ্যামলা বলা চলে। কিন্তু ফিগারটা দারুণ! সাড়ে পাঁচ ফুটের মত্ত লম্বা। সুডৌল হাত-পা। উন্নত বুক। যৌবন কানায় কানায় পূর্ণ। যেন ছুঁলেই ছল্‌কে পড়বে। বরেন তাকে কাছে টানে, বুকে জড়ায়, দুহাতে মাড়ায়।—বাস্তবে নয়, কল্পনায়। বাস্তবে বরেন রীনাকে যতটা পারে কাছে কাছে রাখে। সারাদিন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বারবার ডেকে পাঠায়। রীনা এসে হাসিমুখে দাঁড়ায়। কখনও একটা ডিক্‌টেশান দেয়, কখনও পুরনো চিঠির খোঁজ করে, কখনও স্রেফ গল্প করে। একবার সঙ্গে করে দার্জিলিঙে ট্যুরেও নিয়ে গিয়েছিল। উঠেছিল ওয়াইন্ডমায়ার হোটেলে। কোম্পানির অনেকগুলো কাজ ছিল। সারাদিন তারা একসঙ্গে ছিল। রাতে ডিনারও খেয়েছিল একসঙ্গে। তারপর আপন আপন রুমে চলে গিয়েছিল। সেদিন রাতে বরেন ঘুমুতে পারেনি। বারবার রীনার রুমে যেতে ইচ্ছে করছিল। একবার নিজের রুম থেকে বেরিয়ে রীনার রুমের সামনে সে এসেওছিল। কিন্তু দরজায় আর টোকা দিতে পারেনি। যদি রীনা অন্যভাবে নেয়! হয়ত রীনা আপত্তি করবে না। আজ সারাদিন সে ভারী হাসিখুশি ছিল। রাতে ডিনারের সময়ও তার চোখেমুখে সম্মতির ছাপ ফুটে উঠছিল। কিন্তু বরেনের যদি ভুল হয়ে থাকে! সে এক কেলোর কীর্তি হবে। কোম্পানিতে সে মুখ দেখাতে পারবে না। তারও থেকে বড় কথা, জীবনে আর কোনওদিন সে সুমিতার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। সে আবার নিজের বিছানায় ফিরে এসেছিল। সারারাত জেগে কাটিয়ে সকালে রীনাকে নিয়ে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরলে সুমিতা রহস্য করে বলেছিল, 'রীনাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে? তাহলে সময়টা ভালই কাটল বল!' বরেন চটে গিয়েছিল। রাগ করে বলেছিল, 'আশ্চর্য! তোমার মুখে কিছুই আটকায় না?' সুমিতা বরেনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, "চটছ কেন? ঠাট্টা করছি, তাও বুঝতে পার না?"

সুমিতার মুখে সকৌতুক হাসি দেখে বরেনের সঙ্কোচ হয়েছিল। আজও সঙ্কোচ হল। রীনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে কী সব ভাবছে? ডিক্‌টেশানটা সে তাড়াতাড়ি দেখে দিল। রীনা সেটা নিয়ে চলে গেল।

বরেন একটা ফাইল খুলল। মন দিতে পারল না। রেখে দিয়ে ডাক দেখতে লাগল। বেয়ারা এসে জানাল, 'সাহাব এক মেমসাব আপসে মিলনে চাহতি হ্যাঁয়।"

"কৌন মেমসাব?"

"ওয়ে যে, কভি কভি আতি হ্যাঁয় না সাব।"

বরেন বুঝল নন্দিতা এসেছে। বলল, "আসতে বল।" হ্যাঁ, নন্দিতাই। নন্দিতা ঘরে ঢুকে, হাত তুলে নমস্কার করে সামনের চেয়ারে বসে পড়ল।

নন্দিতা তার বন্ধু অজয়ের স্ত্রী। পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স। কিন্তু তাকে দেখে বাইশ-তেইশের বেশি মনে হয় না। নন্দিতা এমনিতে সুন্দরী। তাতে সবসময় ফিটফাট থাকে। ছোট্ট শরীরটাতে সে যেন অনেক উষ্ণতা ধরে রাখে। তা পুরুষকে তার দিকে আকর্ষণ করে।

অজয় কৃষ্ণনগরে একটা অফিসে কাজ করে। সকালে নাকে-মুখে দুমুঠো ভাত গুঁজে ট্রেন ধরতে ছোটে। ফেরে অনেক রাত করে। সারাটা দিন নন্দিতার অফুরন্ত অবসর। বই পড়ে আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে নন্দিতা সেই অবসর কাটায়। মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরার পথে বরেনও নন্দিতার সঙ্গে দেখা করে যায়। কখনও সখনও নন্দিতাও বরেনের অফিসে চলে আসে। যেমন আজ এসেছে। একদিন অফিস কামাই করে বরেন তার সঙ্গে সিনেমাতেও গিয়েছিল। নায়ক-নায়িকার বিশেষ আবেগ-ঘন মুহূর্তে নন্দিতাও বরেনের পাশে ঘন হয়ে এসেছিল। বরেনের হাতটা দুই হাতের মধ্যে নিয়ে মৃদু মৃদু চাপ দিচ্ছিল। এক সময়

চাদরের মধ্যে দিয়ে হাতটা সে একেবারে বুকের ওপর নিয়ে এসেছিল। বরেনের সমস্ত শরীর তখন উত্তেজনায় টান টান। সিনেমা থেকে বেরিয়েই তারা একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা নন্দিতাদের বাড়িতে এসেছিল। দরজা বন্ধ করেই নন্দিতা বরেনকে টেনে নিয়ে গিয়ে সোফার ওপর বসেছিল। এবার বরেনের নন্দিতাকে বুকের কাছে টেনে পিষ্ট করার পালা। কিন্তু তার আগেই দেওয়ালে টাঙানো অজয়ের ছবিটার ওপর তার চোখ পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুমিতার মুখটাও ভেসে উঠল। বরেনের মনে হয়েছিল, ওদের দুজনের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। বরেন আর কিছুই করতে পারেনি। অনেকক্ষণ অপরাধীর মত বসে ছিল।

নন্দিতা জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছেন ?' বরেন তন্ময় ভাবটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে কাটিয়ে বলে উঠল, "না, ও কিছু না। অজয় কেমন আছে ?"

"আপনার বন্ধুর কথা আর বলবেন না। সেই সকালে বেরিয়ে গেছে। অফিসে নাকি অডিট আছে। বলে গেছে, আসতে দেরি হবে। রাতে না-ও আসতে পারে।"

"আরে আপনি ?"

"আমি আর কী করব ? একা একা ভাল লাগছিল না। ভাবলাম একটা সিনেমা দেখলে হয়। আপনার এখানে চলে এলাম।"

বরেন বুঝতে পারে, নন্দিতা তাকে ইঙ্গিতে সিনেমায় যেতে আহ্বান করছে। তার যেতেও ইচ্ছে করছে। নন্দিতার মত কাউকে পাশে নিয়ে সিনেমা দেখতে ভালই লাগে। তাছাড়া নন্দিতা তো নিজেকে উজাড় করেই দিতে চায়। ইচ্ছে করলেই নন্দিতাকে সে আশরীর পেতে পারে। তার পেতেও ইচ্ছে করে। বরেন সমস্ত শরীরে উত্তেজনা অনুভব করে। সুমিতা কাছে আসলে সে এরকম উত্তেজনা কেন অনুভব করে না ? আবার সুমিতার কথা মনে পড়ে যায়। অজয়ের করুণ মুখটা ভেসে ওঠে। বরেনের মনে হয়, কাজটা ঠিক হবে না। বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়াও তার বিশ্বাসযোগ্যতাও নষ্ট হবে। তারও থেকে বড় কথা, তার দুর্নাম হবে। দুর্নামকে বরেনের ভারী ভয়। বরেনের মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল।

নন্দিতা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল ; "আমি এসে কি আপনাকে খুব অসুবিধায় ফেলে দিলাম ?"

"না, না, এ কী বলছেন ? আপনি এসেছেন, আমার খুব ভাল লাগছে। কী খাবেন বলুন। মিষ্টি ?"

"না, না, আমি মিষ্টি খাব না।"

"মোটা হয়ে যাবেন ? ঠিক আছে পাকোড়াতে তো আপত্তি নেই ?"

নন্দিতা মুখ টিপে হাসতে লাগল। বরেন বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল। মেমসাবকে লিয়ে পাকোড়া আউর কফি লে আও।

বয় পাকোড়া আর কফি দিয়ে গেল। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বরেন বলল, "আজ সিনেমায় না গিয়ে আমাদের বাড়িতে চলুন।" নন্দিতার চোখের কোণ দিয়ে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। ঘাড় বাঁকা করে সে প্রশ্ন করল, "কেন ? সুমিতাদি কি বাড়িতে নেই ?"

"সুমিতা থাকবে না কেন ?"

"তাহলে আমি গিয়ে কী করব ?"

"সুমিতার সঙ্গে আলাপ করবেন।"

"এই—চালের কিলো কত করে, বাজারে কী কী সবজি পাওয়া যাচ্ছে—ওসব আলোচনা করতে আমার ভাল লাগে না।"

"সিনেমা দেখতে ভাল লাগে ?"

"অন্তত ওসবের থেকে... ।"

"তাহলে সিনেমা দেখতেই যান।"

"হ্যাঁ, তাই যাব।" নন্দিতা নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

বরেন টেন্ডারের ফাইলটা আবার খুলল। কিন্তু অফিসের কাজে সে মন দিতে পারল না। ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ি লাগাতে বলল। সিঁড়ির মুখে নন্দর সঙ্গে দেখা। নন্দ তাদের আর একটা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। বরেনের বিশেষ বন্ধু। বরেন বলল, "নন্দ, তুই এতদিন কোথায় ছিলি রে ? তোকে যে আর দেখাই যায় না।"

"কী করে দেখবি ? ক্লাবে আসা তো একেবারে ছেড়েই দিয়েছিস। সব সময় শ্রীমতীর বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে আছিস।'

বরেন এ কথার কোনও উত্তর না দিয়েই গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি এসে তার বাড়ির সামনে থামল। গাড়ি থেকে নেমে সে দেখল, মমতা তাদের ঘরের বারান্দা থেকে নেমে আসছে। মমতা সম্পর্কে সুমিতার মামাতো বোন। বাংলায় এম এ পড়ছে। মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে আসে। দিদির সঙ্গে দেখা করতে এলেও জামাইবাবুর সঙ্গেই তার ভাব বেশি। শ্যালিকার সঙ্গে কিছুটা মাখামাখি এবং ঠাট্টা-ইয়ারকি প্রথা-অনুমোদিত ব্যাপার। সুমিতাও আপত্তি করে না। বরেন চুটিয়ে মমতার সঙ্গে আড্ডা দেয়। মমতা স্পেশাল পেপার নিয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। সেই নিয়ে আরও মজা হয়।

মমতা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "দিদি কোথায় ?"

"কেন ? তোমার দিদি নেই ?"

"না। দরজায় তালা।"

"কোথাও গেছে বোধ হয়। চলো, আমার কাছে চাবি আছে।"

বরেন দরজা খুলল। মমতা ঘাড়ের ব্যাগটা টি-পয়ের ওপর রেখে সোফার ওপর বসে পড়ল। বরেন কৌতুক করে বলল, "এবারে মহারানীর অনুমতি হলে আমি কাপড়টা ছেড়ে আসতে পারি।"

"অনুমতি না হলে ?"

"দাসানুদাস মহাদাস বরেনের কাপড় ছাড়া হয় না।"

"না হোক। আমি গোমড়া মুখ করে একা বসে থাকতে পারব না।"

"তাহলে বৎস বরেন, তোমাকে বসতেই হল।"

বরেন মমতার পাশে বসে পড়ল।

মমতা বরেনের কাছে সরে এসে জিজ্ঞেস করল, "দিদি কখন ফিরবে ?"

বরেন কৌতুক করে উত্তর দিল, "তা আমি কী করে বলব ? আর তার এত তাড়াতাড়ি ফেরারই বা দরকার কী ? যতক্ষণ না ফেরে ততক্ষণই ভাল। 'তুমি আছ, আমি আছি, কাছাকাছি!' আমার ততক্ষণ পরকীয়া প্রেমচর্চা করতে পারি।"

"ও খুব যে সাধ্ব !"

"কেন হবে না সখী ? অত বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে তোমারও কি একটু সাধ হয় না ?" বরেন মমতার একটা হাত তার হাতের মধ্যে নিয়ে নিল। মমতা বলল, "দেখুন, যা বোঝেন না, তা নিয়ে কথা বলবেন না।"

"কেন প্রিয়ে, বৈষ্ণব পদাবলীতে না বোঝার কী আছে ? একবার ভগবানের নামটা একটু ছুঁইয়ে রাখো। তারপর প্রাণ খুলে মনের কথা বলে যাও।"

"ভক্ত ভগবানের কাছে তো মনের কথাই বলবে। আত্মা-পরমাত্মার কথা তো মনের কথাই

হবে।"

"তোমাতেও দেখছি আত্মা-পরমাত্মা ভর করেছে। আচ্ছা একটা উদাহরণ নেওয়া যাক—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

এর মধ্যে তোমার আত্মা-পরমাত্মা কোথায়। স্রেফ আসঙ্গ লিপ্সা। খুব জোর বলতে পার প্রাকৃত প্রেম।

"হ্যাঁ, আপনার মত কামুক লোকের কাছে তা-ই।"

"কিছু না করেই অপবাদ। ঠিক আছে..."

বরেন মমতাকে দুহাতে আকর্ষণ করে চুমু খেল। দুই বুকে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। মমতা রাগ করার ভান করে বলতে লাগল, "দাঁড়ান না, আজ যদি দিদিকে না বলে দিই..." বরেনও ভয় পাবার ভান করে মুখ বিবর্ণ করল।

বরেন জানে, মমতা কিছুতেই এসব কথা তার দিদিকে বলবে না। তবে সে এটাও জানে যে ওর বাইরে সেও আর কিছু করতে পারবে না। মমতা চলে গেলে সে একদিন হাসতে হাসতে সুমিতাকে বলেছিল, "মমিটা খুব প্রাণোচ্ছল! সব সময় হাসিখুশি থাকে। একটু প্রেম করলে তোমার আপত্তি আছে?"

"ও রাজি থাকলে আমার আপত্তি নেই। তবে ওর বয়েস অনেক কম। আর ও তোমাকে দাদা বলে, তুমি নিশ্চয় চাইবে না যে ওর কোনও ক্ষতি হোক।"

বরেন আর কোনও কথা বলতে পারেনি। সুমিতা এমনি করে তাকে ছেড়ে রেখেও সবদিক থেকে বেঁধে রেখেছে। তাছাড়া সত্যিই তো অঘটন কিছু ঘটলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। আত্মীয়-স্বজনের কাছে সে মুখ দেখাতে পারবে না। বেচারি মমতারও হেনস্থার শেষ থাকবে না।

তার থেকে বোধ হয় সোনাগাছিতে যাওয়াও ভাল। ইচ্ছে মত সময়টা কাটিয়ে আসা যাবে। হেমন্ত বলছিল, সোনাগাছি, হাড়কাটা গলি, এসব জায়গায় নাকি অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে। তারা অনেক রকম কায়দা-কেরামতিও জানে। বরেনের মুশকিল হচ্ছে, এতদিন এই শহরে থাকলেও ওই জায়গাগুলো ঠিক কোথায় তা সে জানে না। একবার ভেবেছিল, হেমন্তকে জিজ্ঞেস করে নেবে। কিন্তু যদি সন্দেহ করে। হেমন্ত তাহলে সকলকে বলে বেড়াবে। বরেন আর জিজ্ঞেস করেনি। নিজে নিজেই কিছুদিন খোঁজ করেছিল। কালীঘাটের কাছে একটা জায়গায় সন্ধানও পেয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় জামা-কাপড়ে সেন্ট মাখিয়ে সেখানে হাজিরও হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারেনি। গলির মুখেই বেঢপ পোশাক পরে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বরেনকে দেখে একটা আধবুড়ো মেয়ে এমনভাবে ছুটে এসেছিল, যেন এক্ষুনি হাত ধরে টানাটানি শুরু করবে। বিশ্রীভাবে হেসে মেয়েটা জিজ্ঞেস করেছিল, "কি গো নাগর? বসবে নাকি?" শুনে বরেনের চোখ-মুখ লাল। সে কোনও কথা বলতে পারেনি। ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটা পিছন থেকে বলে উঠেছিল "নাগরের পেটে খিদে মুখে লাজ!" অন্য মেয়েগুলি খলখল করে হেসে উঠেছিল। আর বরেন ওখানে দাঁড়ায়নি। হনহন করে হাঁটতে লেগেছিল। চলন্ত একটা ট্রামে লাফিয়ে চড়ে তবে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু ট্রামে উঠেই দেখে, তাদের অফিসের মধুবাবু দাঁড়িয়ে। মধুবাবু যদি তাকে ওদিক থেকে আসতে দেখে থাকে? তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। বরেন কী কৈফিয়ত দেবে? বরেনকে বাধ্য হয়েই বলতে হবে, মন্দিরে মাতৃ দর্শনে এসেছিল। গোপালনগর মোড়ে এসেই সে নেমে পড়ল। ভাগ্যিস কথাটা জানাজানি

হয়নি। মধুবাবু হয়ত তাকে খেয়ালই করেননি। খুব বেঁচে গেছে। আর ও পথে নয়!

'বরেন বোঝে, সে সোনাগাছিতেও যেতে পারবে না। তার থেকে মুকুল যে সংস্থাটার কথা বলেছে, সেটাই ভাল। সে একজনের সঙ্গে আলাপ করবে। তারপর ভাল লাগলে আগে বাড়বে। না হলে ওখানেই ইতি। বরেন অনেকক্ষণ পরে যেন একটু স্বস্তি পেল।

মমতা বলে উঠল, "একেবারে গুম মেরে গেলেন যে! অত কী ভাবছেন?"

"তোমার কথাই ভাবছি! ভাবছি কী শাস্তি হবে!"

"আপনি যা অসভ্য। আপনার খুব কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত!" মমতা হেসে উঠল।

"তাহলে তো এখন পলায়নই শ্রেয়। 'যঃ পলায়তি সো জীবতি'!"

"না আপনাকে আর পালাতে হবে না। অতই যখন ভয়, তখন দিদি আসার আগে আমিই পালাচ্ছি।"

"তাহলে তো ডবল শাস্তি। বোনকে কিছু না খাইয়ে ছাড়লে, দিদি এসে আমার মুণ্ডুটা রাখবে? চলো দু-কাপ কফি তৈরি করি।"

"না, আমি আপনার সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকব না।"

"তাহলে তুমি বসো। আমি কফি তৈরি করে আনি।"

"আমি একা একা বসে থাকতেও পারব না।"

"তাহলে অগত্যা মিষ্টিমুখ করো।"

"সে-ই ভাল।"

বরেন গিয়ে ফ্রিজ থেকে দুটো প্লেটে মিষ্টি বের করল। জলের বোতল বের করে দুটো গ্লাসে ঠাণ্ডা জলও ঢালল। মিষ্টি খাওয়া হলে মমতা বলল, "দিদির আসতে বোধ হয় দেরি হবে। আজ যাই। আর একদিন আসব।"

মমতা ব্যাগটা ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বরেন শ্যালিকার সঙ্গে সঙ্গে বাস স্টপ পর্যন্ত এল। সুমিতা বাড়িতে না থেকে ভালই হল। মমতাকে একটা বাসে তুলে দিয়ে সে নিজেও একটা বাসে উঠে পড়ল। 'উর্বশী' বিউটি পার্লারের কাছে এসে নামল।

মুকুল বলেছিল, বিউটি পার্লারের কাছেই নাকি সংস্থাটা। বরেন রাস্তার অপর পাশে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সেরকম কিছু চোখে পড়ল না। পার্লারের এ পাশে একটা বার, তার পাশে আসবাবের দোকান। ওপাশে একটা দর্জির দোকান, তারপরেই রাস্তা। রাস্তার ওপাশে মিষ্টির দোকান। এর মধ্যে সে-সংস্থা কোথায়? মুকুল তার সঙ্গে ঠাট্টা করেনি তো? কিন্তু মুকুল তো সেরকম ফিচেল ছেলে নয়। তাছাড়া ও খুব কনফিডেন্টলি বলছিল। বরেন রাস্তা পার হয়ে ওপাশে গেল। বিউটি পার্লারটার আশপাশে দু-একবার ঘোরাঘুরি করল। একসময় দেখল, পার্লারের পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির মুখে তীরচিহ্ন দিয়ে লেখা 'পরিচয়'। হ্যাঁ, মুকুল সংস্থাটার নাম পরিচয়ই বলেছিল বটে। তীরের মুখ দোতলার দিকে। তার মানে সংস্থার অফিস দোতলায়। বরেন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। অর্ধেক উঠে তার বুক দুরু দুরু করে উঠল। যদি এটা অন্য কিছুর অফিস হয়? তাহলে সেটা ভারী বোকা বোকা কাজ হবে! আবার মনে হল কেউ যদি তাকে এখানে দেখে ফেলে? সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল। রাস্তার ওপাশে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বরেন একবার ভাবল, বাড়ি ফিরে যাবে। আবার মনে হল, তাহলে আর আসা হবে না। একবার যখন এসে পড়েছে, তখন দেখেই যাবে। সাহসে ভর করে সে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। সিঁড়িটা দোতলায় একটা ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে। দরজা ঠেলে ঢুকতে বরেন দেখল, রিসেপশন কাউন্টারে পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়সের একজন লোক এবং

প্রায় সমবয়সী এক মহিলা বসে আছে। বরেন আর একবার সাহস সঞ্চয় করে তাদের কাছে এগিয়ে গেল, "আপনারা পরিচয়ের লোক ?" বরেনের প্রশ্ন শুনে লোকটি উঠে গেল। মহিলা পাল্টা প্রশ্ন করল, "কেন বলুন তো ?"

"আমি আপনাদের মেম্বার হতে চাই। নিয়মকানুনগুলো একটু বলবেন ?"

"আমাদের নিয়মকানুন একদম সোজা। আপনি যে কোনও সময় মেম্বার হতে পারেন। মেম্বারশিপ ফি পাঁচশ টাকা। মেম্বার হওয়ার সময় আপনাকে একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। তার প্রথমে আপনার বিবরণ। পরে আপনি যার সঙ্গে আলাপ করতে চান তার ব্যাপারে আপনার পছন্দ। মাস খানেকের মধ্যেই আমরা যোগাযোগ করিয়ে দেব। তখন আপনারা নিজেদের পছন্দ মত জায়গায় দেখা করতে পারবেন। তবে আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের রুম ভাড়া নিতে পারেন। তার জন্য আলাদা ভাড়া দিতে হবে।"

"ভাড়া কত ?"

"বিভিন্ন রকম রেট আছে। যদি অল্পক্ষণের জন্যে থাকেন, পার আওয়ার ফিফটি রুপিজ, সারাদিনের জন্য নিলে ছ'শ টাকা।"

"এখুনি দিতে হবে ?"

"না, দুপক্ষ মিলে দিন ঠিক হলে তবে দিতে হবে। এখন শুধু মেম্বারশিপ ফি পাঁচশ টাকা দিন।"

মহিলা বরেনের হাতে একটা ফর্ম ধরিয়ে দিল। বরেন নিয়ে দেখল, প্রথমেই নাম, এ কী বিপদ ! সবকিছু গোপন রাখার জন্যই তো এখানে আসা। নাম লিখে দিতে হলে আর এখানে আসা কেন ? বরেনের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেই বোধ হয় মহিলা বলল, "ইচ্ছে করলে আপনি নাম না-ই লিখতে পারেন। একটা কাল্পনিক নাম লিখে দিন। আমরা আপনাকে ওই নামেই জানব। বসে পড়ুন। বসে-বসে পূরণ করুন।"

বরেন ফর্মটা নিয়ে মহিলার সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। ভাবতে লাগল কী নাম লিখলে ভাল হয়। অন্য সময় কত মিষ্টি নাম মনে আসে। এখন ছাই কিছুই মনে পড়ছে না। আগে থেকে জানা থাকলে ঠিক করে আসা যেত। অনেক ভাবনাচিন্তা করে সে ফুলের নামে নাম লিখল, পলাশ।

নামের পরেই ঠিকানা। মহিলা বলল, "আপত্তি থাকলে, ঠিকানা লিখতে হবে না। তবে সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে কোনও খবর দিতে পারব না। আপনাকে নিজে এসে জেনে যেতে হবে।" সে-ও ভাল। বরেন ঠিকানা লিখল না। ঠিকানার পর শিক্ষাগত যোগ্যতা। বরেন এম এসসি না লিখে লিখল এম এ। বয়স তার চল্লিশ হয়ে গেছে। কিন্তু এত বয়সের লোকের সঙ্গে কেউ ভাব করতে চাইবে ? বছর পাঁচেক কম লেখাই যেতে পারে। বরেন লিখে পঁয়ত্রিশ। উচ্চতা তার পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি। মেয়েরা নাকি লম্বা লোক পছন্দ করে। একটু বাড়িয়ে লিখল পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। ওজন তার সত্তর ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েরা নিশ্চয় মোটা মানুষ পছন্দ করে না। বরেন লিখল পঞ্চান্ন। গায়ের রঙ কী লিখবে ? আসলে তো কালো। ভেবেচিন্তে লিখল শ্যামলা। শখ গান-বাজনা। অন্য কিছু বলেও একটা কলম আছে। ওখানে কী লেখা যায় ? অনেক ভেবেচিন্তে বরেন লিখল পুরুষালি চেহারা। যাকে বলে সর্বগুণ সম্পন্ন আর কি !

এবারে 'যার সঙ্গে আলাপ করতে চাই' তার ব্যাপারে পছন্দ। প্রথমেই শিক্ষাগত যোগ্যতা। শিক্ষিত মেয়ে নিয়ে সে কী করবে ? পূরণ করল না। তারপরেই বয়স। বরেনের তো ষোল-সতের বছরের মেয়েদেরকেই সব থেকে ভাল লাগে। কিন্তু চল্লিশ বছরের, না না—পঁয়ত্রিশ

বছরের লোকের সঙ্গে ষোল-সতের বছরের কোনও মেয়ে ভাব করতে রাজি হবে কেন ? বরেন বাড়িয়ে লিখল পঁচিশ-তিরিশ। তবে তার কমেও আপত্তি নেই।

উচ্চতা। বরেনের লম্বা মেয়েদেরই ভাল লাগে। রীনা, মমতা—দুজনেই লম্বা। বরেন লিখল পাঁচ থেকে পাঁচ ফুট ছয়। কিন্তু নন্দিতা পাঁচ ফুটেরও কম। তবু তাকেও তো ভাল লাগে। আর নন্দর বউ। ও তো সাড়ে পাঁচ ফুটেরও বেশি হবে। ওকেও ভাল লাগে। ভেবে চিন্তে সে লিখল—বেশি বা কমে আপত্তি নেই।

ওজন। বেশি কমে আপত্তি নেই। গায়ের রঙ কী লিখবে ? মমতার কথা মনে রেখে বরেন লিখল শ্যামলা। তার পরেই নন্দিতার কথা মনে পড়ল। লিখল, ফরসাতে আপত্তি নেই। অমনি রীনার মুখটা ভেসে উঠল। লিখল কালো হলেও চলবে। এবার সে নিজেই বুঝতে পারল না, বাদ থাকল কী ? শখের জায়গায় সে কিছু না ভেবেই লিখল গান-বাজনা। অন্য কিছুর ঘরে লিখল, কোমল-হৃদয়া, লাবণ্যময়ী ?

পাঁচশ টাকা সমেত বরেন ফর্মটা মহিলার হাতে দিল। মহিলা ফর্মটা পড়ে আর একটা ফর্ম বের করে বরেনের হাতে দিল, "আজই একটি মেয়ে আমাদের মেম্বার হয়েছে। আপনার পছন্দ হয় কি না দেখতে পারেন।" বরেন নিয়ে দেখতে লাগল। বি এ পাস, পঁচিশ বছর বয়স, পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, পঁয়তাল্লিশ কেজি ওজন, গায়ের রঙ ফরসা, শখ সঙ্গীত, অন্য কিছুর ঘরে—ফিগার ছত্রিশ-ছাব্বিশ-ছত্রিশ। তার মানে তো দারুণ ফিগার। বরেনের খুব পছন্দ। নামটা কী যেন ? রীতা। নামটাও মিষ্টি। বরেন জানাল, "আমার পছন্দ।"

মহিলা বলল, উনি পরশু দিন আসবেন। আপনাকে ওনার পছন্দ হলে আমরা একটা ডেট নিয়ে রাখব। আপনি শুক্রবার আসুন।"

"বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় আসলে হয় না ?"

"না। উনি বৃহস্পতিবার কখন আসবেন তার নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া ওনার মতামত কী হবে তাও তো আমরা বলতে পারি না। আপনি শুক্রবারই আসুন।"

"আচ্ছা।" সিঁড়ি দিয়ে চুপি চুপি নেমে সে লোকের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ন'টার সময় সে যখন বাড়ি ফিরল সুমিতা তার জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে। দরজা খুলেই সে বলে উঠল, "তোমার এত দেরি হল ?" বরেন সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেল।" সুমিতা টেবিলে খাবার সাজাতে লাগল। হাত-মুখ ধুয়ে এসে বরেন খেতে বসল। সুমিতা পাশে বসে এত আন্তরিকতার সাথে তাকে খাওয়াতে থাকল যে বরেনের নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল।

দুটো দিন অনেক দীর্ঘকাল বলে মনে হল। শুক্রবার সকালে এসেই বরেন 'পরিচয়' অফিসে হাজির হল। মহিলা জানাল, 'হ্যাঁ, উনি, আপনাকে পছন্দ করেছেন। বারো তারিখে ডেট দিয়েছেন। ঘরও ভাড়া করে গেছেন। আপনাদের এখানেই দেখা হবে।" কিন্তু বারো তারিখে যে বরেনের বোর্ড মিটিং। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত মিটিঙে থাকতে হবে। মহিলা বলে চলল, "উনি এগারটার সময় আসবেন। আপনিও ওরকম সময় করে আসুন...."

"কিন্তু আমার যে ওইদিন অন্য এনগেজমেণ্ট আছে। অন্য কোনও দিন হয় না ?" "দ্যাটস আপটু ইউ। আপনি বলে যান, কবে আপনার সুবিধে হবে। আমরা ওনাকে সে কথা জানিয়ে দেব। তারপর উনি রাজি হলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে তার জন্য ঘর নিলে আলাদা ভাড়া দিতে হবে।"

বরেনের খেয়াল হল যে বারো তারিখে মেয়েটি ঘরও ভাড়া করে রেখেছে। নিশ্চয় তারই মত সেও মনে মনে অনেক কিছু ভেবে রেখেছে। এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হলে হয় তো

খুবই ব্যথা পাবে। হয়ত তার সঙ্গে আর দেখা করতেই রাজি হবে না। যা করেই হোক সে বারো তারিখেই আসবে।

মহিলাকে সে-কথা জানিয়ে দিয়ে সে অফিসে এল। এম ডি-র সঙ্গে দেখা করে বলল, "মিসেস বোসের কী একটা গাইনি প্রবলেম হয়েছে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। বারো তারিখে ডেট দিয়েছে। ওই দিনটা যদি আমাকে একটু ছেড়ে না দেন তাহলে....বুঝতেই পারছেন....হোম ফ্রন্টে অশান্তি হবে।" এম ডি ঠোঁট চেপে হাসলেন। বললেন, "মিটিংএর ডেট খুব সম্ভব পিছোচ্ছে। পিছোলে তো কোনও প্রবলেম নেই। না পিছোলে গোবিন্দবাবুকে আপনার কাগজপত্র বুঝিয়ে দেবেন।"

বরেন খুশি মনে এসে চেয়ারে বসল। গোবিন্দবাবুকে কাজ বুঝিয়ে দিতে থাকল আর দু-হাতে দিনগুলোকে ঠেলতে লাগল। এগার তারিখ রাতে সে কিছুতেই ঘুমুতে পারল না। বারবার এপাশ-ওপাশ করতে থাকল। বার কয়েক সুমিতা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। বরেনের তা-ও ভাল লাগল না। সন্তর্পণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে ভোরের প্রতীক্ষা করতে থাকল। সুমিতা এক সময় বিবস্ত্র, চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর হল। এক সময় নাকও ডাকতে লাগল।

বরেনের চোখের ওপর দিয়ে রাত গড়িয়ে গেল। আশেপাশে কাক ডাকতে লাগল। বরেন উঠে হাতমুখ ধুয়ে নিল। সাবান মেখে স্নানও করল। চুলে শ্যাম্পু দিল। খাওয়া-দাওয়া করে অনেক আগেই সাজতে লাগল। পারফিউমের গন্ধ পেয়ে সুমিতা এসে ঠাট্টা করল, "কি গো, বোর্ড মিটিঙে কি বিশেষ কেউ আসবে?" বরেন কোনও উত্তর না দিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল। আটটার মধ্যেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বোর্ড মিটিং পিছিয়ে গেছে। জরুরী দুটো ফাইল ছিল। ছেড়ে দিল। বোম্বের ব্রাঞ্চকে লেখা চিঠিটাও সই করে দিল। তারপর দুপুরে যে অভিসারে যাবে তার সুখস্বপ্নে মশগুল হয়ে গেল। স্বপ্ন নিয়েই মধুর মধুর ছবি আঁকতে থাকল। দশটার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে সে একটা ট্যাক্সি নিল। রাস্তার মধ্যে ট্যাক্সি জ্যামে পড়ল। ট্যাক্সির চাকা একদম ঘোরে না। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে। সময় যত এগারটার কাছাকাছি হয় বরেনের উদ্বেগ তত বেড়ে চলে। ড্রাইভারকে তাড়া লাগায়। ড্রাইভার আর কী করবে? ট্যাক্সিকে তো আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না। স্টার্ট বন্ধ করে বসে থাকে। অধৈর্য বরেন ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল। খানিকটা সময় দৌড়ে গিয়ে অন্য রাস্তার একটা বাস ধরল। মোড়ের মাথায় বাস থেকে নেমে ট্রামে উঠে বসল। ট্রাম থেকে 'পরিচয়' অফিসে পৌঁছুতে তার সাড়ে এগারটা বেজে গেল।

মহিলা বলল, "আপনি অনেক দেরি করে এলেন।" বরেনের বুকের ভিতরটা ধুকপুক করে উঠল, তাহলে কি রীতা তার দেরি দেখে চলে গেছে? এরকম হবে জানলে সে সকাল থেকে এসে বসে থাকত। কিন্তু এখন আর সে-সব ভেবে কী হবে? বরেন কোনও কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকল। মহিলা চেয়ার থেকে উঠে বলল, "চলুন, উনি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন।" বরেনের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। মহিলার সাথে সাথে সে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বরেনের বুকটা একবার কেঁপে উঠল। মহিলা বলল, "যান, উনি এ ঘরেই আছেন।"

দরজার কাছে আসতেই বরেনের বুকটা আর একবার কেঁপে গেল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বরেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না। সে কাকে দেখছে? এ যে সুমিতা। বিষ্ণুপুর থেকে কেনা বালুচরীটা পরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রত্যাখ্যান

ক্রুরোর্-ক্রর্ করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। এত রাতে আবার কে ফোন করল ? মশারিটা একটু ফাঁক করে কমল রিসিভারটা তুলে নিল। "হ্যালো, কে বলছেন ?"

অপর প্রান্ত থেকে একটা মেয়ের মিষ্টি গলার স্বর ভেসে এল। "আপনি ভাল আছেন ?"

গলরা স্বরটা কমল চিনতে পারল না। তার পরিচিত মেয়েদের মধ্যে এক তার স্টেনো স্বপ্না আর অনিলের বোন রমা। তার অফিসে আরও দু একজন মহিলা কর্মী আছে। কিন্তু তাদের কারোরই এত রাতে তাকে ফোন করার কথা নয়। সে বিছানায় ওপর উঠে বসল। "আপনি কে বলছেন ?" "আমি ? আমি আপনার ওয়েল উইশার ! আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। করবেন ?"

"আপনি কে, সেটা না জানলে কি করে বলব ?"

"আমাকে আপনি দেখেছেন ! আজ যখন আপনি গাড়ি করে অফিসে ঢুকছিলেন আমি একটা নীল সিল্কের শাড়ি পরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, প্রায় রোজই থাকি। আপনি লক্ষ্য করেননি ?"

"রাস্তার মাঝে কে কোথায় কি রঙের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে তা লক্ষ্য করতে গেলে তো কাজকর্ম সব ছেড়ে দিতে হয়।"

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। "জানি, আপনি ওরকমই কিছু বলবেন।"

"সবই যখন জানেন তখন পরিচয়টা দিচ্ছেন না কেন ?"

"ওরে বাবা ! অপনি যা লোক ! রেগে-মেগে আমার বাড়িতে বলে দিলে আমার দফা রফা হয়ে যাবে।"

"অতই যদি ভয়, তাহলে ফোন করছেন কেন ?"

"বললাম তো আপনার সঙ্গে ভাব করতে চাই। রাজি আছেন ?"

"আপনি কে তা না জেনে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতেও রাজি নই।"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কমল ভাবতে লাগল। কে হতে পারে ? সত্যিই কি কোনও মেয়ের তাকে ভাল লাগল ? গলার স্বর শুনে মেয়েটিকে কম বয়সীই মনে হচ্ছিল। আর মুখের কথা যখন অত মিষ্টি তখন মেয়েটি দেখতেও নিশ্চয় বেশ মিষ্টি হবে ! কিন্তু তার মত চল্লিশ বছরের একটা আধবুড়ো লোককে মেয়েটির ভাল লাগতে যাবে কেন ? অনিল অবশ্য এখনও মাঝেমাঝে তাকে বিয়ের কথা বলে। কালও বলছিল। সে-ই কাউকে দিয়ে করাল না তো ? অন্য একটা আশঙ্কার কথাও তার মনে এল। ডিপার্টমেন্টে তার বন্ধুরা সংখ্যা তো কম নয়। তারা ষড়যন্ত্র করে তাকে ফাঁসাতে চাইছে না তো ?

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়। খুব কম বয়সেই তার ঘর পুড়েছিল ! তখন সে বিরহি হাইস্কুলে এগার ক্লাসে পড়ে। তাদের সঙ্গেই পড়ত বাবুপাড়ার মৌসুমি। মৌসুমীকে কমলের খুব ভাল লাগত। ওর সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করত। মৌসুমী পাত্তা দিত না। একদিন তার বইয়ের মধ্যে সেই মৌসুমির চিঠি পেয়ে কমলের তো খুশি ধরে না ! মনের দরজা খুলে সে মৌসুমিকে চিঠি লিখতে বসল। মৌসুমির একটা খাতার মধ্যে চিঠিটা ঢুকিয়েও দিল। মৌসুমির হাতে চিঠি পড়তে সে কি হৈচৈ ! মৌসুমি সোজা এসে হেডমাস্টারকে চিঠিটা

দিল। কমল প্রথমে মৌসুমির চিঠির কথা বলতে চায়নি। কিন্তু হেডমাস্টারমশায়ের উত্তরোত্তর তিরস্কারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়লে সে মৌসুমির চিঠিটা বের করে দিয়েছিল। মৌসুমি বলেছিল, সে কোনও চিঠি লেখেনি। হেডমাস্টার হয়তো আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বকে-টকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কমল অত সহজে ছাড়া পায়নি। পরের দিন বাবুপাড়া দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় কয়েকজন লোক তাকে মৌসুমিদের বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তার চিঠির কথা তুলে তারা তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কিল-চড-ঘুসি মেরেছিল। মারের চোটে সে পড়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধুলোর ওপর পড়েছিল। তার শরীরে তখন অসহ্য যন্ত্রণা। কমল আজও যেন সে যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে। অনুভব করার জন্য মুখে-বুকে পিঠে হাত দেয়। না, যন্ত্রণাটা শরীরে নয়—তার মনের মধ্যেই আজও রয়ে গেছে।

মৌসুমিদের বাড়ির মারটা সে মনে-মনেই হজম করেছিল। লজ্জায় কাউকেই কিছু বলতে পারেনি। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সে ভাঙা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আয়নার বুকে নিজের মুখটাকে অসম্ভব রকমের করুণ মনে হয়েছিল। এ মুখে কাউকে আকৃষ্ট করার মত কিছু নেই। খুব জোর এ মুখ দেখে কারও সহানুভূতি জাগতে পারে। না, তাও নয় —শুধু বিতৃষ্ণা জাগতে পারে। কমলের মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। কাজ নেই কারও সঙ্গে আলাপ করে! সে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কয়েকদিন পরে রাত সাড়ে এগারটায় আবার টেলিফোন এল। সেই মিষ্টি কণ্ঠস্বর, "রবিবাসরে আপনার গল্পটা পড়লাম। নায়িকার ওপর ভারি অবিচার করেছেন। ছেলেদের মত মেয়েরা অত স্বার্থপর হয় না মশায়!"

"মেয়েরা কিরকম স্বার্থপর হয় তা আপনি জানবেন কি করে?"

"এটা তো আপনার রাগের কথা হল!"

"ঠিক আছে ভাবের কথা দিয়ে আপনি একটা গল্প লিখুন।"

"আপনি দেখিয়ে দিলে চেষ্টা করতে পারি।"

"আপনি কে কথা বলছেন?"

"এখনও চিনতে পারেননি? আমি, আমি যে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

"আপনার নাম কি?"

"নাম একটা আছেই। কিন্তু সেটা জানা কি এতই জরুরি?"

"হ্যাঁ, আমার পক্ষে জরুরি।"

"আমার নাম নন্দিতা।"

"নন্দিতা?—" কমল রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। হঠাৎ করে কেন নামিয়ে রাখল সে নিজেও বুঝতে পারল না। নন্দিতা এখানে আসবে কি করে? নন্দিতা তো বাঙ্গালোরে থাকে।

বাবুলবোনা কলেজে তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন মেয়ে পড়ত। তাদের মধ্যে নন্দিতাই ছিল সবচেয়ে সুন্দরী। তার গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মত। মাথাভর্তি রেশমের মত কালো চুল। মায়াবী মুখ। গভীর দুটি চোখ। তার সঙ্গে দুটি কথা বলার জন্য সকলেই উন্মুখ হয়ে থাকত। কমলও একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে নন্দিতা কেন, কোনও মেয়েরই সে ধারে-কাছে ঘেঁসত না। নিজেকে দূরে-দূরে রাখত। ব্যাপারটা নন্দিতার নজর এড়ায়নি। কমলের প্রতি তার কৌতূহল হয়েছিল। একদিন দুই পিরিওডের ফাঁকে কমল যখন বারান্দার রেলিং ধরে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল, নন্দিতা এসে তার পাশে দাঁড়াল। "কিরে? তুই এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কি করছিস? আচ্ছা তুই কারও সঙ্গে কথা বলিস না কেন বল তো!" "কথা বলব না কেন? সবার সঙ্গেই তো

বলি।"

"সবার সঙ্গে বলিস ? আমার সঙ্গে বলিস ?"

"না, মানে...."

"মানে, আমার সঙ্গে কথা বলতে তোর ইচ্ছে করে না ?"

"তা নয়, তুইও তো কোনওদিন আমার সঙ্গে কথা বলিসনি।"

"আমি তো কারও সঙ্গেই কথা বলতে যাইনি। তবু সবাই কথা বলে।"

"সবাই.... ।"

"বুঝেছি। আর বলতে হবে না।"

নন্দিতা কমলকে কথা শেস করতে দেয়নি। তার মনে হয়েছিল, কমল আর সকলের থেকে আলাদা। কমলের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গিয়েছিল। আর মাসতিনেক মাত্র তারা কলেজে ছিল। সেই তিনমাসেই কমল বুঝেছিল, জীবন কত মধুময় হতে পারে। সে তখন আরও মধুর জীবনের স্বপ্নে বিভোর। তার সে স্বপ্ন খুব তাড়াতাড়িই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পার্ট-টু পরীক্ষার পরই নন্দিতার বিয়ের সম্বন্ধ এল। বর কলকাতায় ব্যারিস্টার। তাদের বাড়ির সকলেরই পছন্দ। কমল সাধারণ ঘরের ছেলে। তার ওপর বেকার। ইচ্ছে থাকলেও নন্দিতাকে বিয়ের কথা বলতে পারেনি। নন্দিতাই বলল, "আমি যা করে পারি বিয়েটা আটকে রাখব, তুই একটা চাকরির চেষ্টা কর।"

পরীক্ষার ফল বের হলে নন্দিতার বাবা-মা ওকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখানে তাঁদের বড়মেয়ে-জামাই থাকে। নন্দিতা তাদের বাড়ি থেকেই পড়াশুনো করবে। কমল চাকরির চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টা করে রাইটার্স বিল্ডিংসে একটা কেরানির চাকরি মিলল। নন্দিতা লিখল, "তাহলে আমাকে পালিয়ে যেতে হবে। বাড়িতে কাউকে বলতে পারব না। বড়দির বর লেকচারার। আমার জন্যও ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে। কাছাকাছি কিছু না হলে বলব কি করে ? তাছাড়া শুধু খাওয়া-পরা হলেই তো চলবে না—আমাদের একটা থাকার ব্যবস্থাও করতে হবে। কেরানিদের যা বেতন দেয় তাতে থাকার ব্যবস্থা সম্ভব ?" কমল ভেবে দেখল, সত্যি সম্ভব নয়। হাজারখানেক টাকায় কলকাতা শহরে থাকার জায়গা তো দূরের কথা, এক টুকরো বসার জায়গাও পাওয়া যাবে না। কমল ভাল চাকরির জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

চাকরি করতে করতেই প্রস্তুতি নিয়ে সে ডব্লিউ. বি. সি. এস. পরীক্ষা দিল। এ গ্রুপে হল না—বি গ্রুপে ইন্টারভিউ পেল। ইন্টারভিউ দিয়ে সে ডি. এস. পি. হল। বছর দুয়েক ট্রেনিং। তারপর পুরোপুরি ডি. এস. পি। ফল বের হতেই কমল নন্দিতাকে চিঠি লিখল। চিঠির কোনও উত্তর এল না। সামনের মাস থেকে ব্যারাকপুরে পুলিস ট্রেনিং কলেজে ট্রেনিংয়ে জয়েন করতে হবে। তার আগে সে দিল্লি গেল। নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে দেখল, অন্য লোক আছে। তাদের কাছ থেকে জানতে পারল, মাস-ছয়েক আগে নন্দিতার জামাইবাবু বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এ একটা কাজ নিয়ে চলে গেছে। নন্দিতাও এখন ওখানে মলেকিউলার ফিজিক্স নিয়ে কাজ করছে।

কমলের মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। তারও কত ইচ্ছে ছিল, এম. এস. সি. পাস করে গবেষণা করবে। নতুন নতুন তথ্য আবিস্কার করবে। চাকরির পিছনে ছুটতে গিয়ে কিছুই হল না। তবুও নন্দিতাকে তো সে পাবে। নন্দিতাকে পেলেই তার সব কিছু পাওয়া হয়ে যাবে। কমল দিল্লি থেকেই বাঙ্গালোরে গেল। স্টেশন থেকে একটা অটো নিয়ে ইনষ্টিটিউটে গেল। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই মলেকিউলার ফিজিক্স ইউনিটও পেল। কিন্তু নন্দিতাকে পাওয়া গেল না

তার এক সহকর্মী জানাল, "সি ইজ নাও হানিমুনিং অ্যাট গোয়া।"

"হানিমুনিং ?"

"ইয়েস। লাস্ট উইক সি গট ম্যারেড উইথ ডক্টর সেন।"

কমল প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেনি। আজও পারে না। কিন্তু ঘটনাটা সত্য। কমল তৎক্ষণাৎ ওখান থেকে চলে এসেছিল। আর কোনওদিন নন্দিতার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি। অনেকদিন পরে, সে তখন বাঁকুড়ায় অ্যাডিশনাল এস. পি. নন্দিতার মামাতো ভাই তপনের কাছ থেকে জেনেছিল, এবং নন্দিতার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। নন্দিতার মন বিষিয়ে দেবার জন্য, অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে কমলের বিয়ের জাল কার্ড ছাপিয়ে নন্দিতাকে দেখিয়েছিল।

নন্দিতা এটা জেনে ফেলার পর থেকে প্রচণ্ড অশান্তি চলছে। বাবা-মা, দিদি-জামাইবাবু কারও সঙ্গে আর সে কোনওরকম সম্পর্ক রাখে না। স্বামীর সঙ্গেও সম্পর্ক ভাল নেই। কমলের সঙ্গে নাকি একবার দেখা করতে চেয়েছিল। কমল রাজি হয়নি। যার মনে তার প্রতি এতটুকু বিশ্বাস নেই, কি হবে তার সঙ্গে দেখা করে ? তপনকে তাই বলেছিল। কিন্তু সেটা ছিল শুধুই মুখের কথা। মনে মনে আজও তার নন্দিতার সঙ্গে দেখা করতে প্রচণ্ড ইচ্ছে করে। ইচ্ছেটা বুকে নিয়েই সে আবার শুয়ে পড়ে।

কমল অফিসে বসে ডাক ফাইল দেখছিল। নিজের নামে আসা চিঠিগুলি খুলে খুলে মার্ক করছিল। শেষ চিঠিখানি মার্ক করতে গিয়ে সে চমকে উঠল।

"আপনাকে কি বলে সম্বোধন করব বুঝতে পারছি নে। ইচ্ছে করছে প্রিয় বলে করতে। কিন্তু আপনি যদি রাগ করেন ! তাই সম্বোধন ছাড়াই লিখছি।

টেলিফোনে দুটো কথা বলতে গেলে আপনি লাইন কেটে দেন। তাই চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি। তাছাড়া টেলিফোনে সব কথা বলাও যায় না। কি বলতে চাই ? শুধু একটি কথা— আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে।

আমি কে ? আমি আপনার ওয়েল উইশার। আমার বয়স বাইশ। এম. এ-র ছাত্রী। উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। গায়ের ফরসা। হালকা গড়ন। লম্বা কালো চুল। ভুরুর ধনু বাঁকা। বাবা-মার মতে আমি খুব আদর্শবাদী। সেইজন্যই বোধহয় আপনাকে অত ভাল লাগে। আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

সেদিন টেলিফোনে ভয় পেয়ে ভুল নাম বলেছিলাম। আসলে আমার নাম কাকলি। কাকলি চৌধুরি। ঠিকানাটা দিলাম না। আপনি আলাপ করতে রাজি হলে তাও দেব।"

কমল চিঠিটা আর একবার পড়ল। চোখের সামনে কাকলির একটা ছবি ভেসে উঠল। বড়বাবু ঘরে ঢুকে বলল, "হয়েছে স্যার ? টেন্ডারগুলো আজ আবার খুলতে হবে।" কমল ডাক ফাইলটা এগিয়ে দিল। বড়বাবু বলে উঠল, "ওটা দিবেন না স্যার ?"

"না, এটা আমার পারসোনাল চিঠি।"

বড়বাবু ফাইল নিয়ে চলে গেল। কমল ছেঁড়া খামটা তুলে নিল। নীল খামের ওপর ইংরেজিতে তার নাম-ঠিকানা লেখা। বাংলার মত ইংরেজি হাতের লেখাটাও বেশ সুন্দর। মেয়েটিও নিশ্চয় সুন্দরীই হবে। কাকলির কাল্পনিক ছবিটা আবার তার মানসচক্ষে ভেসে উঠল। কমল তারিয়ে তারিয়ে সেটাকে উপভোগ করতে লাগল। সেই রাতের আবার টেলিফোন এল।

"আমার চিঠি পেয়েছেন ?"

"পেয়েছি।"

"এবারে আমার সঙ্গে ভাব করতে রাজি ?"

"আমার বয়স কত জানেন ?"

"জানি।"

"এরপরেও আমার সঙ্গে ভাব করতে চান কেন ?"

"কারণ, কমবয়সী ছেলেগুলোকে আমার জোলো জোলো লাগে।"

"আপনি একদিন আসুন, কথা বলব।"

"বাড়িতে ?"

"না, না, বাড়িতে আমি একাই থাকি। আপনি অফিসে আসুন।"

"কালকেই আসব।"

"আসুন।"

আশায়-আশঙ্কায়-উত্তেজনায় কমলের রাতে ঘুম হল না। সকালে উঠে সে সাজগোজ করতে লাগল। স্যুট পরে তাড়াতাড়ি অফিস রওনা হল। কিন্তু কাজে মন দিতে পারল না। সবসময় মনে হতে লাগল, এই বুঝি কাকলি এসে পড়ল। ইস্, ভারি ভুল হয়ে গেছে। রাতে যদি সে জেনে নিত কাকলি ঠিক কটায় আসবে। তখন কথাটা তার মনেই হয়নি। আর্দালি ভিজিটর স্লিপগুলো নিয়ে এল। না, তাতে কাকলির নাম নেই। দরজা ঠেলে স্টেনো স্বপ্না ঘরে ঢুকল, "স্যার কোনও কাজ আছে কি ? একটু বাইরে বেরুতাম !" স্বপ্নার চোখে-মুখে যেন একটা অর্থপূর্ণ হাসি লেগে আছে। কমলের অনুমতি পেয়ে স্বপ্না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ইন্টারকমটা পিঁ-ইঁ করে উঠল। টেলিফোন অপারেটর লীনার গলা ভেসে এল, "স্যার, আপনি আসার জাস্ট কয়েক সেকেন্ড আগে কাকলি চৌধুরি বলে এক মহিলার ফোন এসেছিল। তাঁর নাকি আজ আসার কথা ছিল। বললেন আসতে পারবেন না।" কমলের ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করে, সেটা এতক্ষণ বলেননি কেন ? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারল না। তার মনে আরেকটা আশঙ্কা জাগছিল। তার স্টেনো, টেলিফোন অপারেটর, এরা মিলে তাকে নিয়ে মজা করছে না তো ? তা যদি হয়, খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। সে কতবার ভেবেছে, নিজেকে কন্ট্রোল করে চলবে। কিন্তু কি করে যে এরকম হয়ে যায় ! মনে হয়, সবাই যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ক্লান্ত কমল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যায়।

পরের দিন অফিসে ঢোকার মুখে কমল দেখে, রাস্তার ওপর নীল শাড়ি পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে দেখার আগেই গাড়ি অফিসে ঢুকে গেল। পরের দিনও ওরকম হল। তৃতীয় দিনে মেয়েটিকে ভাল করে দেখে নেওয়ার জন্য কমল প্রস্তুত হয়ে থাকল। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েটি আজ নেই। কমল হতাশ মনে গাড়ি থেকে নামছিল। হঠাৎ তার অফিসের সামনে মেয়েটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। তাড়াতাড়ি অফিসে ঢুকে সে দেখল প্রথম ভিজিটর স্লিপেই কাকলি চৌধুরির নাম আছে। কমল তাড়াতাড়ি আর্দালিকে দিয়ে ডেকে পাঠাল।

কাকলি ঘরে ঢুকে দু-হাত তুলে নমস্কার করল। কমলের দেখে মনে হল, চিঠি পড়ে যেরকম মনে হয়েছিল কাকলি তার থেকেও সুন্দরী। এই যে তার সমস্ত শরীরে একটা লাবণ্য ছড়িয়ে আছে, এটা তো চিঠির বর্ণনায় ছিল না। এই যে তার প্রতিটি অঙ্গে কাছে টানার আকর্ষণ, সেটাও ছিল না। কমল তাকে বসতে ইশারা করল। সামনের চেয়ারে বসে কাকলি বলল, "সেদিন ভিজিটরের ভিড় দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কাল-পরশুও এসে ফিরে গেছি। আজ সাহসে ভর করে চলে এলাম।'

"এবারে বলুন, কেন আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান ?"

"আপনি সৎ অফিসার, সবাই আপনাকে ভয় করে, আমার ভাব করছে ইচ্ছে হয়।"

"ব্যাস ?" কমল যেন হতাশ বোধ করল। কাকলি ঠোঁট চেপে হেসে উঠল। বলল, "না, আরও আছে। তবে আজ বলব না। আজ আমার ক্লাস আছে। আমি শনিবার আসব। আর টেলিফোন করব। দেখবেন, আবার লাইন কেটে দেবেন না যেন।"

কাকলি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। সে রাতেই সে ফোন করল। রোজই করতে লাগল। শনিবারে এল। মাঝেমাঝেই আসতে লাগল। সেদিন অফিসে এসে বলল, "কাল দুপুরে আপনার কোয়ার্টারে আসছি।"

"কোয়ার্টারে আমি একা থাকি।"

"সেটাই তো সুবিধে। কেউ বিরক্ত করবে না। এখানে বসে কি কোনও কথা বলা যায় ? একবার স্টেনো ঢুকছে তো আরেকবার আর্দালি ! না হলে চলুন, দুজনে মিলে একটা সিনেমা দেখি—এলিটে একটা ভাল ছবি এসেছে।"

"সেটাও ভাল দেখায় না। যার-তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া আমার মানায় না !"
"আমাকে আপনি যার-তার বলছেন ?"

"ভুল বুঝবেন না। আমাদের সম্পর্ক কি, সেটা এখনও ঠিক হয়নি।"

"বলুন, আপনি কি ঠিক করতে চান ?"

"আমরা যদি পরস্পরকে জীবনসঙ্গী করতে চাই, তাহলে আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। আপনার সঙ্গে আমি সিনেমা দেখতেও যেতে পারি। কিন্তু, আমরা যদি শুধু বন্ধু থাকতে চাই, তবে অবাধ মেলামেশায় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে—অন্যের চোখে, নিজেদের কাছেও।"

"বন্ধুভাবে মেলামেশা করতে করতেই তো, আমরা কি করব তা ঠিক করতে পারি।"

"পারি, আবার নাও পারি। যদি না পারি এবং ইতিমধ্যেই এমন কিছু ঘটে যায়, যা ঘটা উচিত ছিল না, তাহলে সেটা খুবই কষ্টদায়ক হবে। আমি সেটা চাই নে।"

"আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান ?" কাকলি কমলের মুখের দিকে তাকাল। কমল মুখটা নিচু করে বলল, "আপনার সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি তাতে আপনাকে বিয়ে করতে আমার কোনও আপত্তি নেই।" কাকলির মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। সেও মুখ নামিয়ে বলল, "আমাকে দুদিন সময় দিন, একটু ভেবে দেখি।" সে ভ্যানিটি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

কমলের মনটা আশা-নিরাশার মাঝখানে দোল খেতে লাগল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কোয়ার্টারের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গোধূলির আকাশ দেখতে লাগল। হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখে কাকলি। কাকলি বলল, "ভয় নেই। আমি বেশিক্ষণ থাকব না। আর কোনওদিন আসবও না।" সে কমলকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে সোফার ওপর বসে পড়ল। দরজা বন্ধ করে কমলও গিয়ে তার পাশে বসল। খানিকক্ষণ কারও মুখে কোনও কথা নেই। কাকলি প্রথমে কথা বলল। "আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান। আমিও আপনার মত একজন লোককে বিয়ে করতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবতীই মনে করতাম। কিন্তু আপনি যাকে বিয়ে করতে চান আমি সে নই। আমার নাম কাকলি চৌধুরি নয়। আমি এম এ ক্লাসের ছাত্রীও নই। আমার নাম মিস লুসি। আমি একটা প্রাইভেট কনসার্নে কাজ করি।"

"আপনি হঠাৎ.... ?"

"হঠাৎ নয়—আমাকে ভাড়া করা হয়েছিল।"

"কে ভাড়া করেছিল ? কিসের জন্য ?"

"ভাড়া করেছিল এক ব্যবসায়ী। কি যেন নামটা ? হ্যাঁ, ঝুনঝুনওয়ালা। আপনার হাতে তার যে কেসটা আছে সেটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য।"

"তাহলে আপনি এতদিন ধরে আমাকে ভাল লাগার অভিনয় করেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা সত্যিও কি আমাকে আপনার ভাল লাগতে পারে না ?"

"পারে। লাগেও। কিন্তু আব কিছু নয়।"

"কেন ?"

"কারণ আমি একজনের স্ত্রী। দয়া করে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আমাকে যেতে দিন।"

সে ভ্যানিটি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে পড়ল।

"অন্তত আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যান।"

"সেটা বোধহয় না রাখাই ভাল। আমাকে মাফ করবেন। নমস্কার।"

সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। কমল অসহায়ের মত তার চলার পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

অসুখ

অফিস, ফাইল আর রেইড ! এরকম একঘেয়ে জীবন কার কতদিন ভাল লাগে ? বকুলের তো বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। তাই ও ঠিক করেছিল, আজ রবিবারে কিছুতেই অফিস যাবে না। বলে রেখেছিল, খুব বড় ধরনের কিছু না ঘটলে যেন তাকে ফোন না করা হয়। কিন্তু একা একা বাড়িতে বসে সারাটা দিন কাটানো যেন আরও অসহ্য মনে হচ্ছে। কোথাও গেলে হয়। কিন্তু কোথায় যাবে ? সারা শহরে যেন তার জন্য যাওয়ার মত একটিও জায়গা নেই। বান্ধবীরা সব বিয়ে করে বরের কাছে চলে গেছে। বন্ধুরা ঘরে বৌ নিয়ে এসেছে। তারা বকুলকে একটা উটকো ঝামেলা মনে করে। তাছাড়া যারা সুন্দরী বৌ নিয়ে সুখে সংসার করছে তাদের প্রতি বকুলের একটা গোপন বিদ্বেষও আছে। নিজের একাকিত্বের প্রমাণ নিতে সে তাদের কাছে যেতেও চায় না। রবিবারের কাগজে কি গল্প ছাপা হয়েছে, পড়লে হয় ! কিন্তু সেখানে শুধু প্যানপেনে ভালবাসার কথা। যেন ভালবাসা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই। তার থেকে সে টিভি দেখবে। সেখানেও প্যানপ্যানানির ছড়াছড়ি। তবে পড়ার কষ্ট নেই। চলছে, ইচ্ছে করে দেখ, না হলে দেখ না। সে টিভির সুইচটাতে চাপ দিল। পর্দায় ছবি ভেসে ওঠার আগেই কলিং বেলটা বেজে উঠল।

দরজা খুলে দেখল বাইশ-তেইশ বছরের একটি অতি সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি মৃদু হেসে পরিচিতি জানাল। মুখটা খুব চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না। পিছন থেকে মিঃ দাশগুপ্ত এগিয়ে এল। দাশগুপ্ত তাকে যে কার্ড দিয়েছিল তা থেকে জেনেছিল, সে একটা বড় কোম্পানির ডাইরেক্টর। কিন্তু কোম্পানির নামটা তার কিছুতেই মনে থাকে না। মনে থাকে না তার প্রথম নামটাও। তাই সি পি-র ঘরে আলাপ হওয়ার পর থেকে সে শুধু মিঃ দাশগুপ্ত। দাশগুপ্ত বলল, 'রীতার একটা পাসপোর্ট দরকার। তা আপনাদের সই ছাড়া তো তাড়াতাড়ি হবে না। ও বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমি বললাম, তাহলে সব থেকে ভাল হয়। কিন্তু ও আপনার বাড়ি চিনত না। তাই আমাকে ধরে আনল !'

বকুল ইঙ্গিতে তাদের ভিতরে আসতে বলল। দাশগুপ্ত হাত জোড় করল, 'আমার এম ডি আজ দিল্লি যাচ্ছে। আজ বসব না। এরপর যা জানার ওর কাছ থেকে জেনে নিন।' দাশগুপ্ত চলে গেল। রীতা বসার ঘরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। টিপয়ের ওপর ভ্যানিটি ব্যাগটা রাখল। হাতের ফাইলটা খুলে পাসপোর্টের ফর্মটা বের করল।

মেয়েটি কে, তাই ভাবতে ভাবতে বকুল দরজা বন্ধ করল। পাশের চেয়ারে বসে চুপি চুপি ফর্মটা দেখতে লাগল। রীতা মিত্র, পিতা দিলীপ মিত্র, ১৮ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। না, ঐ ঠিকানায় কারও সঙ্গে তার আলাপ নেই। তাহলে মেয়েটি কে ! মেয়েটি মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'আপনি রোজই ন্যাশনাল লাইব্রেরি যান ?' এবার মনে পড়ল। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আলাপ হয়েছিল। মেয়েটি পিটার ববের 'রুরাল ইন্ডিয়া' বইটা চাইছিল। বইটা বকুলের নামে ইস্যু করা ছিল। মেয়েটি তার কাছ থেকে নিয়ে দেখেছিল। সে সূত্রেই আলাপ। সেই আলাপের সূত্রে পাসপোর্টের জন্য সার্টিফিকেট দিতে হবে ? কোনও মানে হয় ? 'এক মিনিট' বলে উঠে বকুল ফ্রিজ থেকে দুটো মিষ্টি এবং এক গ্লাস জল এনে টিপয়ের ওপর

রাখল। মেয়েটি অনুসন্ধিৎসু হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'বাড়িতে আর কেউ নেই ?' বকুল ঘাড় নেড়ে জানাল, না।'

'আপনার স্ত্রী ?'

'বিয়ে করিনি।'

'কেন ?'

'সুযোগ হয়নি।'

'এত ভাল চাকরি করেন। আপনার বিয়ে করার সুযোগ হয়নি ?' অনেকেই তো আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে।'

'হয়ত চেয়েছিল। আমি করিনি।'

'আর আপনি যাকে চাইছিলেন, সে আপনাকে করেনি।'

'হয়ত তাই।'

'সে এখন কোথায় থাকে ?'

'জানি না।'

'জানেন না যখন তখন অন্য কাউকে বিয়ে করুন।'

'এই বয়সে বৃদ্ধকে কে বিয়ে করতে রাজি হবে ?'

'অনেকেই হবে। এই আমার কথাই ধরুন না। কম বয়সী ছেলেগুলোকে আমার একদম ভাল লাগে না। একটু বয়স না হলে ঠিক পুরুষালি ভাব আসে না। আপনার যেমন এসেছে।'

বকুলের খুব ভাল লাগছিল। ইচ্ছে করছিল, জিজ্ঞেস করে, 'আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছেন ?' কিন্তু সেটা বড় নির্লজ্জের মত শোনাবে। মেয়েটি তাকে হয়ত হ্যাংলা, বেহায়া ভাববে। সে জিজ্ঞেস করতে পারল না। বলল, 'থাক ওসব কথা। আপনার কথা বলুন। তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট করতে চাইছেন কেন ?

'আমার বন্ধু আমাকে সামনের মাসে আমেরিকা বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়। তাই।' কথাগুলো কানের মধ্যে হাতুড়ি পেটাতে লাগল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বন্ধু কি করেন ?'

'হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। এই আপনার মতই বয়স হবে।'

'নামকী ?'

'কুলদীপ জালান। খুব ভাল। আপনার সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দেব।'

'আপনার বাবা কী করেন ?'

'বাবা নেই। আমি মামার কাছে মানুষ। পার্ক স্ট্রীটে মামারা থাকেন।'

'আপনার বন্ধুরা কোথায় থাকেন ?'

'পুরো ঠিকানা তো আমি জানি না। তবে হাইকোর্টের পূর্ব দিকে যে একটা ইউকো ব্যাঙ্ক আছে। তার ওপর তিন তলায় চেম্বার।' মেয়েটির কথাবার্তা কীরকম সন্দেহজনক মনে হল। সে ফর্মটা ফেরত দিয়ে বলল, 'পরশু দিন অফিসে আসুন।'

ফর্মটা ফাইলে ভরে একটা ছোট্ট নমস্কার করে মেয়েটি বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে বকুল ভাবতে লাগল, কী হতে পারে। বিয়ে হয়নি এরকম কোনও ছেলের সাথে একটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে বিদেশে বেড়াতে যাবে। তার অভিভাবকরা ছেড়ে দেবে। আমাদের দেশে এরকম হয় ? না হলে আসল ব্যাপারটা কী ?

সোমবার সকালে অফিস যাওয়ার আগে সে হাইকোর্টের পূর্বদিকে ইউকো ব্যাঙ্কের ওপর তিনতলায় হাজির হল। হ্যাঁ ওখানে কুলদীপ জালানের নেমপ্লেট আছে। একটু দূরেই প্রণব

চ্যাটার্জির নেমপ্লেট ছিল। প্রণব চ্যাটার্জি কোথায় বসে, সেটা জানার ভান করে সে দরজা খুলে কুলদীপকে দেখে নিল। শার্ট-প্যান্ট-টাই পরা কেতাদুরস্ত এক প্রৌঢ়। তার মত বয়সেরই বটে। এই লোকটির সঙ্গে মেয়েটি আনন্দিত চিত্তে আমেরিকা বেড়াতে যেতে চায়। কেন ? উত্তর খুঁজে পায় না। প্রণব চ্যাটার্জির চেম্বারের সামনে পায়চারি করে।

একটু পরে কুলদীপ জালান বেরিয়ে গেল। তখন বকুল প্রণব চ্যাটার্জির কাছ থেকে তার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করল। ৩৮, জওহরলাল নেহরু রোড।

পরের দিন মেয়েটি এলে বকুল বলল, 'পাসপোর্ট তো হয়ে যাবে। ব্যাগ-ট্যাগ গোছানো হল ?'

'আমি গোছাব বলেছিলাম। কিন্তু একটা ব্যাগও ওর পছন্দ হল না। ও কাল আমাকে একটা নতুন ব্যাগ কিনে দেবে।'

'হ্যাঁ, তা মার্কেটিং তো করতেই হবে। কখন বেরুচ্ছেন।'

'দশটার সময়।'

'ফাইন। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক!'

'বাই।'

মেয়েটি উঠে চলে যাচ্ছিল। বকুল তার দেহরক্ষী বাদলকে ডেকে বলল, 'মেয়েটিকে ভাল করে দেখে রাখুন। কী করতে হবে পরে বলব।' বাদল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, 'কী করতে হবে, বলুন স্যার।' মেয়েটি এবং কুলদীপের নাম ঠিকানা দিয়ে বকুল বলল, 'অফিসের গাড়ি নিলে হবে না। আপনি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে রাখুন। ওরা দুজনে কাল কোথায় যায়, কী করে, কার সঙ্গে কথা বলে, সব নজর রাখবেন।'

বাদল স্যালুট করে বেরিয়ে গেল। পরের দিন দুপুরে এসে খবর দিল, কুলদীপ দশটা নাগাদ রীতার বাড়িতে আসে। রীতাকে নিয়ে সোজা হগ মার্কেটে যায়। বেসমেন্টে নামে। 'লেদার হাউস' বলে একটা দোকানে ঢোকে। চব্বিশ ইঞ্চি সাইজের একটা বাদামী রঙের চামড়ার ব্যাগ কেনে এবং ব্যাগ সমেত রীতাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি চলে যায়।

বকুল সব নোট করে রাখল। পাসপোর্ট অফিসেও বলে রাখলো। সপ্তাহখানেক পরে রীতা এল। সে জানাল, 'পাসপোর্ট হয়ে গেছে। ভিসাও পাওয়া গেছে। আমরা আগামী সাত তারিখ কে এল এম ফ্লাইটে রওনা হচ্ছি।'

'ভেরি ফাইন। উইশ ইউ এ হ্যাপি জার্নি অ্যান্ড নাইস টাইম।'

'বাই।'

রীতা বেরিয়ে গেলে বকুল ড্রয়ার থেকে ফ্লাইটা চার্টটা বের করল। কে এল এম ফ্লাইট সপ্তাহে একদিনই আছে। রবিবার সকাল চারটে পঁচিশে। অর্থাৎ যাত্রীদের দুটো আড়াইটের সময় রিপোর্ট করতে হবে। বকুল সময়টা ডায়েরিতে নোট করে নিল। সাব-ইনস্পেক্টর সরকারকে ডেকে বলল, 'শনিবার রাত বারোটার সময় আপনি আমার কাছে রিপোর্ট করবেন।' রিপোর্ট করলে বাদলকে সঙ্গে দিয়ে বলল, 'বাদল মেয়েটিকে চেনেন। সিকিউরিটি চেকের সময় তার যাবতীয় লাগেজ, এমনকি অন্তর্বাস এবং বডি ক্যাভিটি যেন খুব ভাল ভাবে চেক করা হয়। সঙ্গের লোকটিরও তাই। আর সার্চ যে আমাদের সন্দেহ অনুসারে করা হচ্ছে সেটা যেন কেউ জানতে না পারে। যেন ওরাই সার্চ করছে। দরকার হলে ওরাই কেস করবে। আপনি কথা বলে নেবেন। অসুবিধা হলে ফোন করবেন। আমি এস পি এয়ারপোর্টকে বলে দেব।' সকাল সাড়ে তিনটের সময় সরকারের ফোন এল, 'স্যার, মেয়েটির ব্যাগের ফল্‌স সিলিঙের মধ্যে থেকে কিলো খানেক হেরোইন পাওয়া গেছে। তবে তার সঙ্গে

কোনও লোক ছিল না। গুড সিজার স্যার। কেসটা আমরা করলেই ভাল হত।'

'হত। কিন্তু ওদেরই করতে দিন। আর বলুন যে, মেয়েটি যা বলে তাই যেন রেকর্ড করে। সে মাল কোথায় পেয়েছে বা কার কাছ থেকে নিয়েছে তার জন্য যেন চাপাচাপি না করে।'

'কেন স্যার ? তা হলে তো আসল লোকেরাই ধরা পড়বে না।'

'কারণ আছে পরে জানতে পারবেন।' বকুল ফোন ছেড়ে দিল।

পরের দিন কাগজে বের হল, কে এল এম ফ্লাইটের নিউ ইয়র্কগামী এক মহিলা যাত্রীর কাছ থেকে এয়ারপোর্ট পুলিস এক কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। মহিলার স্বীকারোক্তি অনুসারে, জয়পুরের এক পেডলারের কাছ থেকে সে এই হেরোইন পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিনেছিল। বকুল পড়ে আশ্বস্ত হল। বাদলকে ডেকে কুলদীপের ওপর নজর রাখতে বলল। টেলিফোন অফিসেও চিঠি লিখল। দেখা গেল যে উকিল রীতার হয়ে কোর্টে দাঁড়িয়েছিল তার সঙ্গে কুলদীপের টেলিফোন থেকে পাঁচবার কথা বলা হয়েছে। তবে কুলদীপকে কোর্টের কাছাকাছি কোথাও দেখা যায়নি। সে বাড়ি থেকে বেরই হয়নি। বকুল এবার ইন্সপেক্টার সমাজদারকে ডাকল। নিজে হাতে দরজা বন্ধ করে বলল, 'আপনাকে একটা কঠিন কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ স্যার ?'

'আপনাকে হেরোইন স্মাগলার সাজতে হবে।'

সে সমাজদারকে কুলদীপের নাম ঠিকানা বুঝিয়ে দিল। তারপর বলল, 'উনি বড় আকারে হেরোইন চালান করেন। আপনাকে খরিদ্দার সেজে যেতে হবে। আপনি আপনার পছন্দমত আরও দুজন লোক নিয়ে নিন। ওরা আপনার সঙ্গে থাকবে না। তবে কিছুটা দূরে থেকে আপনার ওপর নজর রাখবে। যাতে কোনরকম বিপদ হলে আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

আপনার পরিচয় হবে রমেশ মিটার। প্রবাসী বাঙালি। আপনার ঠিকানা ৫৬০০ ফিশার লেন রকভিলে, মেরিল্যান্ড ২০৮৫৭। আপনি বোম্বাই থেকে হেরোইন কিনে আমেরিকায় বিক্রি করেন। বোম্বাইতে বেশি ধরপাকড় হচ্ছে বলে কলকাতা থেকে কিনতে চান। বিক্রি করতে রাজি হলেই দিনক্ষণ এবং স্থান ঠিক করে ফেলুন। তারপর যা করার আমরা করব।'

সমাজদার সবকিছু বুঝে নিয়ে চলে গেল। বকুল রকভিলে ফোন করে রাখল। পরের দিন সমাজদার এসে বলল, 'খুব চালু মাল স্যার। সব শুনে নিল। নাম ঠিকানাও নোট করে রাখল। কিন্তু 'হ্যাঁ-না' কিছু বলল না।' বিকেলেই রকভিলে থেকে তরুণ ফোন করে জানাল, 'দিলীপ রায় বলে কে একজন কলকাতা থেকে ফোন করেছিল। রমেশ মিটারকে চাইছিল। আমি বললাম, ও ইন্ডিয়া গেছে। তিরিশ তারিখ নাগাদ ফিরে আসবে। ঠিক আছে তো বস।'

'ঠিক আছে।' বকুল খুশী হল। সমাজদারকে আবার কুলদীপের কাছে পাঠাল। সে এবার হেরোইন বিক্রি করতে রাজি হল। কিন্তু আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করে কাল কাটাতে লাগল। সাতাশ তারিখ সকালে গিয়ে রমেশ মিটার চাপ দিতে লাগল, 'আপনি মাল দিতে হয় দিন, না হলে বলুন। আমি অন্য কোথাও থেকে জোগাড় করব। কাল দুপুরে আন্দামানের জাহাজ ছাড়ছে। আমার পার্টি এসে পোর্ট ব্লেয়ারে বসে থাকবে। কাল মাল পাঠাতে না পারলে আমার আর্থিক ক্ষতি তো হবেই ; আমার গুড উইলও নষ্ট হয়ে যাবে। আমাকে ওখানে আর কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি এতটা ঝুঁকি নিতে পারব না। আপনি মাল দিতে পারেন দিন। না হলে আমি যেখান থেকে পারি জোগাড় করব।'

'বিশ্বাস করুন, যার কাছে মাল আছে সে বারবাঙ্কি গেছে। এই কাল কি পরশুই চলে আসবে।'

'দেখুন, কে ঢাকা গেছে, কে দিল্লি গেছে, শুনে আমার কোনও লাভ নেই। মাল দিতে পারেন দিন। না হলে আমাকে ছাড়ুন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই আপনাকে মাল দেব। তবে ঐ রেটে হবে না। পঞ্চাশ বলেছিলাম তো। ষাট করে দিতে হবে।' সে টেলিফোনের বোতাম টিপতে লাগল। রমেশ বলল, 'ষাট কি ? আমার যা অবস্থা করেছেন তাতে এখন সত্তর বললেও নিতে হবে।

'তবে বিশ্বাস করুন। এতে আমারও বেশি মার্জিন থাকবে না। হ্যালো ! ইউসুফ। কিলো দুয়েক মাল ডেলিভারি দিতে হবে।

আজই। রেসকোর্স ভিক্টোরিয়ার মাঝের রাস্তায়। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময়। ও কে।...

'তা হলে ঐ সময় চলে আসুন। আমি থাকব। জায়গাটা চেনেন তো ? যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।'

'অনেক বেশি রেট। আমি কিন্তু মাল পরীক্ষা করে নিয়ে তবে টাকা দেব।'

'ঠিক হ্যায়। আপ আ যাইয়ে তো।' কুলদীপ উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল। রমেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বকুলের কাছে গেল।

বকুল ডাইরেক্টরি দেখে ইউসুফের বাড়ির ঠিকানা বের করল। ৩ নম্বর মোমিনপুর লেন। সে তাড়াতাড়ি দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে সাব ইন্সপেক্টর সরখেলকে ওখানে নজর রাখতে পাঠাল। নিজে শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভারের বেশে রমেশ মিটার-বেশী সমাজদারকে নিয়ে বের হল। দুজন পোশাক পরা লোককে ট্যাক্সির মধ্যে শুইয়ে নিল।

সাড়ে পাঁচটার সময় বকুলরা নির্দিষ্ট স্থানে এসে দেখল, 'কুলদীপ একটা গাড়ির ভিতর বসে আছে। বকুলের বুকের ভিতরটা উত্তেজনায় দুরুদুরু করতে লাগল। সেটাকে ভুলবার জন্য নকল দাড়ির ওপর হাত বোলাতে থাকল। পাশে রমেশ মিটার বসে কুলদীপের দিকে তাকাতে লাগল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। বকুল সন্তর্পণে কুলদীপের গাড়ির নম্বরটা নোট করল।

পাঁচটা বিয়াল্লিশের সময় একটা অ্যামবাসাডর গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে একজন লোক কুলদীপের দিকে এগিয়ে গেল। বকুলরা আর ধৈর্য ধরতে পারল না। গাড়ি থেকে নেমে লোকটাকে ধরে ফেলল। গাড়িটাকেও ঘিরে ফেলল। পোশাক পরা পুলিস দেখে কুলদীপ গাড়ি ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। ততক্ষণে একটা ট্যাক্সি এসেও দাঁড়াচ্ছিল। পুলিস দেখে ট্যাক্সিটাও ছুটে বেরিয়ে গেল। গণ্ডগোলের মধ্যে কেউ নম্বর নেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না।

কুলদীপের গাড়ির নম্বরটা কন্ট্রোল রুমকে দিয়ে বকুল সমাজদারকে নিয়ে অ্যামবাসাডার গাড়িটা তন্ন তন্ন করে সার্চ করতে লাগল। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। গাড়ি থেকে নামা লোকটা তার পরিচয় দিল রাজাবাজারের হামিদ বলে। কুলদীপকে নাকি সে এর আগে কখনও দেখেনি। চেনেও না। রাস্তার ওপর গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে মনে করে সে গাড়ি থামিয়েছিল। পুলিস এসে তখনই তাকে ধরেছে।

বকুল আবার কন্ট্রোল রুমের সাথে যোগাযোগ করল। জানতে পারল, কুলদীপের গাড়িটা রাজাবাজারের কাছে ধরা পড়েছে। কুলদীপ গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে গাড়িতে আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায়নি। বকুল হতাশ বোধ করল। এতদিন ধরে এত পরিশ্রম করে ফল শূন্য। তারও থেকে বড় কথা সে নিজেকে ভুল বোঝারও সুযোগ করে দিল। ইতিমধ্যেই বাদল এসে বলেছে। তার অধস্তন কর্মচারীরা নাকি বলাবলি করছে, 'মেয়েটি তো সাহেবের জানাশোনা। সাহেব নাকি জেরা করতেও মানা করেছে। না হলে তো অনেক কিছু বেরিয়ে পড়ত। ঐ

ওপর ওপর অনেস্টি। তলে তলে ফস্টিনস্টি। দেখ না, কতদিন আর চাপা থাকবে। ঠিক বেরিয়ে পড়বে।' এরপর তো তারা আরও বলার সুযোগ পাবে।

হতাশ বকুল হামিদকে নিয়ে ইউসুফের বাড়ির দিকে রওনা হল। সেখানে পৌঁছে দেখল, সরখেল এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ধরে রেখেছে। ড্রাইভারকে দেখে হামিদ ঘাবড়ে গেল। সরখেল বলল, 'স্যার। সওয়া ছটা নাগাদ এই ড্রাইভার ট্যাক্সি থামিয়ে ইউসুফের দরজার সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। কিন্তু এখানে কেন এসেছে বলতে পারছে না। তাই ধরে রেখেছি।'

বকুল সরখেলের কথা শোনার সাথে সাথে হামিদকে লক্ষ্য করছিল। দেখল, সে ইশারায় ড্রাইভারকে কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু ভয়ে বলতে পারছে না। বকুল বুঝল, হামিদ আসলে ইউসুফ। সে আশপাশের লোক ডাকল। তারা গোপনে হামিদকে ইউসুফ বলে সনাক্ত করল। তখন বকুলরা সকলে মিলে ট্যাক্সিটা সার্চ করতে লাগল। ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্সের মধ্যে থেকে আধ কেজি ওজনের চারটে হেরোইনের প্যাকেট পাওয়া গেল। ড্রাইভার বলল, 'স্যার, মেরা কেয়া কসুর। সাহাব হামকো বোলা, উঁহা পৌঁছা দো। শও রূপেয়া মিলেগা।'

'এখান থেকে ওখান পর্যন্ত ভাড়া কত।'

'দশ-পন্দরা রুপেয়া হোগা বাবু!'

'তাহলে শও রুপেয়া কিঁউ?'

ড্রাইভার কোনও উত্তর দিতে পারল না। বকুল সকলকে নিয়ে অফিসে ফিরল। ফিরেই রীতা মিত্রকে আনতে বলল।

দু'জন লেডি কনস্টেবল রীতা মিত্রকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। রীতা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। বকুল বলল, 'বসুন'। সে বিনা বাক্যব্যয়ে বসে পড়ল। লেডি কনস্টেবল দু'জন দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বকুল জিজ্ঞেস করল, 'এবারে সত্যি করে বলুন, আসলে আপনি কে? এবং কুলদীপ জালানের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী?

'আমি সত্যি করে বললেই বা আপনি বিশ্বাস করবেন কেন?'

'সেটা আমার ব্যাপার। আপনি বলুন।'

'আমি পি সি বড়ল স্ট্রিটের এক বারবণিতার মেয়ে। বাবা কে জানি না। দিলীপ মিত্রও হতে পারে। মা চাননি, আমি ঐ নরকে থাকি। তাই ছোটবেলায় দিলীপ মিত্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দিলীপ মিত্র আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, আলাদা ফ্ল্যাটে ভাড়া করে রেখেছে। আর মাঝে মাঝে ব্যাগ দিয়ে বিদেশ পাঠিয়েছে।'

'দিলীপ মিত্র কে?'

'কুলদীপ জালানের আসল নাম দিলীপ মিত্র।'

আর দাশগুপ্ত?

'উনি কেউ নন। আপনার সঙ্গে যেরকম আলাপ, ওনার সঙ্গেও তেমনি।'

'আপনি ন্যাশনাল লাইব্রেরি গিয়েছিলেন কেন?'

'আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য।'

'আপনি কি ভেবেছিলেন, আমার সঙ্গে আলাপ হলে আপনার এই কাজ চালাতে সুবিধা হবে?'

'আজ তো তাই মনে হবে।'

'আপনি সেদিন কী মনে করে গিয়েছিলেন?'

'আমার মনে হয়েছিল, আপনাকে সব কথা বলতে পারলে হয়ত এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনার সাহায্য পাব।'

'কিন্তু বললেন না কেন ?'

'আপনি বলার সুযোগ দিলেন কই। আপনি তো শুধু থ্যাঙ্ক য়ু আর উইশ য়ু নাইস টাইম করেই বিদায় করলেন।'

বকুল আগের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, বন্ধুর সঙ্গে আমেরিকা বেড়াতে যাচ্ছে, জানার পর আর সে রীতার সঙ্গে ভাল ভাবে কথা বলেনি। যতটুকু না বললে নয়, ততটুকু বলেই বিদায় করেছে। আর সব সময় সন্দেহ করেছে। না হলে হয়ত মেয়েটা আজ এরকম কেসে পড়ত না। তার খারাপ লাগতে লাগল। রীতার প্রতি সহানুভূতি হল। সহানুভূতির সুরে সে বলল, 'আমার সামনে যা বলছেন, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বলবেন ?'

'বলতে বললে বলব।'

'যদি বলেন, তা হলে আপনি যাতে এ কেস থেকে ছাড়া পান আমি তার চেষ্টা করব।'

'কিন্তু আর ছাড়া পেয়ে কী হবে।' তার থেকে আমার জেলই ভাল। আপনি আমাকে জেলেই পাঠিয়ে দিন।'

'সেটা আপনার ব্যাপার।' বকুল বিব্রত বোধ করল, আপনি চাইলে, তাই হবে।'

রীতার ঠোঁটদুটি কেঁপে গেল। কি বলতে গিয়েও বলল না। খুব করুণভাবে বকুলের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকল। সেটা বকুল ছাড়া আর কেউ দেখল না। সে অস্বস্তি বোধ করল। হাঁক দিয়ে বলল, 'এনাকে নিয়ে যান।'

লেডি কনস্টেবল দু'জন এসে দাঁড়াল। রীতা উঠে তাদের সঙ্গে চলে গেল। বকুল চেয়ারের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগল, এ কী হল ? রীতা তো এই জাল থেকে বের হওয়ার জন্যেই তার কাছে এসেছিল। সে তাকে আরও ভালভাবে জড়িয়ে দিল।' একবার মনকে বোঝাতে চাইল, এরকম তো কত আসামীই ধরা পড়ে। তাছাড়া রীতা নির্দোষও নয়। সে ধরা পড়েছে হেরোইন সমেত। কিন্তু দোষ ছাপিয়ে তার সুন্দর করুণ মুখটাই ফুটে উঠতে লাগল।

পিপাসা

পাশ ফিরে শুয়ে মুকুল মনীষার কথা ভাবার চেষ্টা করল। মানসপটে মনীষা ফুটে উঠল। ষোল বছর বয়সের একটি মেয়ে। হালকা-পাতলা গড়ন। কাঁচা সোনার বরণ। ঘাড় অবধি ছাঁটা ঘন কালো চুল। ক্লিপটা এমনভাবে দেওয়া, যে চোখের কাছে একটা বাঁকের সৃষ্টি হয়েছে। চোখ দুটো গভীর। নাকটা উঁচু। ঠোঁট দুটো হালকা রঙে রাঙানো। দুপাশের গালের খানিকটা ঢেকে চুলগুলো এমনভাবে নেমে গেছে যে, মনে হচ্ছে, কুঁড়ির ভিতর থেকে একটা ফুলের মত মুখ ফুটে আছে। পরনে গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় একই রঙের সালোয়ার কামিজ। বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে ওড়না ঝোলানো।

মুকুল তখন ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র। কৈশোরের সবল সতেজ শরীর মন। চোখে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। বুকভরা বোবা ভালবাসা। মনীষার প্রতি টানে তার উচাটন মন সব সময় ছটফট করত। মনীষার একটুখানি সান্নিধ্য পাবার জন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকত। মনীষাকে সে কত গভীরভাবে ভালবাসে তা জানাতে চাইত। মনীষার বাড়ী থেকে বেরুবার সময় হিসেব করে সে বের হত। ওদের বাড়ীর পাশের পুকুরপাড়ে এসে চোরাচোখে মনীষার ঘরটার দিকে তাকাত। জানালা বন্ধ থাকলে বুঝত সে বেরিয়ে গেছে। জোরে জোরে হেঁটে বাস ধরত। খোলা থাকলে আস্তে আস্তে হাঁটত। মনীষা বেরিয়ে এলে একসঙ্গে হাঁটত। পাঁচটা কথা জিজ্ঞেস করলে মনীষা একটার উত্তর দিত। নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করত না। মুকুল যে তাকে ভালবাসে একথাটা বলার কিছুতেই সুযোগ হত না। স্কুলের মধ্যে তার কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ হত না। বন্ধুরা প্যাঁক দিত। মনীষার ক্লাস আগে শেষ হলে ও চলে যেত। মুকুলের আগে শেষ হলে রাস্তার কোথাও মনীষার জন্য নানা বাহানায় অপেক্ষা করত। কোন দোকানের সামনে খাতা কেনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। অথবা কোন বন্ধুর খোঁজখবর নিত। কিন্তু মনীষা কাছাকাছি এলে সে সবের আর কোন প্রয়োজন থাকত না। ভাল ছেলের মত মনীষার সাথে সাথে হাঁটতে থাকত। পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়ে মনীষা তাদের বাড়ীতে ঢুকে যেত। নিজের বাড়ীর দিকে মুকুলের পা সরত না। সকাল সন্ধ্যায় পড়তে বসত। বই খাতার পাশ দিয়ে মনীষার মুখটা ভেসে উঠত। রাতে ঘুমের মাঝেও তার মুখটা উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যেত। আজও দিয়ে যায়। কিন্তু সে তার জীবনে এল না। হায়ার সেকেন্ডারী পাস করে সে বকুলপুর কলেজে ভর্তি হল। কলেজে ভর্তি হয়ে যেন মনীষা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। মুকুলের স্পষ্ট মনে পড়ে, সেবার কলেজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মনীষা প্রধান অতিথিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে সাহায্য করছিল। একটা প্রদীপ জ্বালিয়েই প্রধান অতিথি বসে পড়েছিলেন। মনীষা বাকী প্রদীপগুলো জ্বালাছিল। সবকটা প্রদীপ জ্বালানো হলে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরনে সেই একই রঙের সালোয়ার কামিজ। বাঁ কাঁধ থেকে ওড়না ঝোলানো। চুলের কুঁড়ির পাশে ফুলের মত একটা মুখ। মুকুল ভাবার চেষ্টা করছিল, মনীষার চোখ, মুখ বা বুকটা যদি এতটু অন্যরকম হত তা হলে কি বেশী ভাল লাগত? না, যেমন আছে তার থেকে ভাল যেন ভাবা যায় না। আচ্ছা মনীষাকে অন্য কোন পোশাক পরলে কি আরও ভাল দেখাত? তাও না, যেমন আছে সেইটাই যেন সব থেকে ভাল। মুকুল মনের মন্দিরে মনীষাকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু দেবীর প্রসাদ পেল না। পরীক্ষার পরই

কলেজের লেকচারার শ্যামলবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল।

মুকুল ভাবল, মেয়েরা প্রতিষ্ঠা পছন্দ করে। সেও পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হবে। তা হলেই পছন্দ মত সঙ্গিনী নির্বাচিত করতে পারবে। সমস্ত শক্তি সে পড়াশোনাতে নিয়োজিত করল। বি. এস. সি. তে ফার্ষ্ট ক্লাস পেল। এম. এস. সি-তে ফার্স্ট ক্লাস পেল। পি, এইচ, ডি, করার অল্পদিনের মধ্যেই সে ফুলতলী কলেজে লেকচারার হিসেবে জয়েন করল।

সপ্তাহখানেক পরে প্রিন্সিপ্যাল মনোহরবাবু বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। বিকেল বেলা সোজা কলেজ থেকেই ধরে নিয়ে গেলেন। বাড়ীতে ঢুকেই আলাপ করিয়ে দিলেন, "আমাদের নতুন লেকচারার মুকুলবাবু। আর আমার মিসেস মায়া।" মুকুল দেখল, মায়াদেবীর বয়স মনোহরবাবুর মতই পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে। তবে এই বয়সেও তাঁকে দেখতে যথেষ্ট সুন্দরী মনে হয়। সে হাত তুলে নমস্কার করল। মায়াদেবী প্রতি নমস্কার করে বসতে বললেন। মুকুল বসেছিল। ভিতর থেকে বাইশ তেইশ বছর বয়সের শ্যামলা রঙের লম্বা মত একটা মেয়ে শান্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে এল। মনোহরবাবু বললেন, "আমার বড় মেয়ে মীনা ও আপনার সাবজেক্টেই এম. এস. সি. করছে। মীনামা মুকুল বাবুকে কলেজ থেকে ধরে এনেছি। একটু চা খাওয়াও।" মীনা ভিতরে ঢুকে গেল। মুকুলের মনে হল, মীনা বাবার রঙ এবং গঠন পেয়েছে। মায়ের মত হয়নি। চা খেতে খেতে মীনার সঙ্গে আলাপ হল। মুকুলের ভালই লাগল। পড়াশোনায় যথেষ্ট ভাল। কিন্তু তার জন্য কোন রকম অহঙ্কার নেই।

মুকুল বিদায় নিচ্ছিল। হঠাৎ দরজা ঠেলে বাড়ীতে ঢুকল ষোল সতের বছরের একটি মেয়ে। মুকুল থমকে দাঁড়াল। এ যে একদম মনীষা। সেই একই রকম গায়ের রঙ। একই রকম চোখ-মুখ। একই রকম চুলের কাট। এমনকি সালোয়ার-কামিজের রঙটা পর্যন্ত এক। মনোহরবাবু বললেন, "আমার ছোট মেয়ে রিকু। ও এবার হায়ার সেকেন্ডারী দেবে।" মুকুলের মনে হল, রিকু মায়ের রঙ এবং গঠনটা পেয়েছে। সে বিদায় নিল। কিন্তু রিকুর মুখটাকে মনের মধ্যে থেকে বিদায় দিতে পারল না।

খুব যে সে বিদায় করতে চাইছিল তাও নয়। তার ধারণা ছিল, এখন সে প্রতিষ্ঠিত। অতএব যাকে পছন্দ, তাকে সে চাইতেই পারে। বাদ সাধছে শুধু বয়সটা। পি-এইচ. ডি. করতেই পাঁচ বছর কেটে গেল। এখন তার বয়স আঠাশ। রিকুর ষোল। বার বছর অর্থাৎ একটা যুগের ফারাক। তাছাড়া রিকুর বিয়ের বয়সও হয়নি। সে কি করে প্রস্তাব দেবে? আজ মনীষা অবিবাহিত থাকলে সে নিঃসঙ্কোচে প্রস্তাব দিতে পারত। মনীষার কথা মনে পড়তেই সে ভরসা পেল। আঠার বছরের মনীষা যদি আঠাশ বছরের শ্যামলবাবুকে বিয়ে করতে পারে, তাহলে ষোল বছরের রিকু কেন তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, মনীষার বড় দিদি ছিল না। রিকুর বিবাহযোগ্যা দিদি আছে। দিদিকে বাদ দিয়ে কি করে ছোট বোনের জন্য প্রস্তাব দেওয়া যায়? বিশেষ করে সে বোন যখন বিবাহযোগ্যা হয়নি? মীনার অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে গেলে খুব ভাল হত। সে সেই চেষ্টাই করতে লাগল।

চেষ্টা সফল হওয়ার আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগপত্র এসে গেল। এখানে আসার আগেই দরখাস্ত করেছিল। সাক্ষাৎকারও হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হওয়ায় রিকুর জন্য প্রস্তাব দিতে সে আরও বেশী সাহস পেল। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে রিকুর চিঠি তার আশা বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। রিকু লিখেছে,

'অধ্যাপক মহাশয়,

কথা ছিল পৌঁছে চিঠি লিখবেন। কিন্তু এখন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

কলকাতায় থাকেন। বিরাট ব্যাপার। আমাদের মত তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণী, যারা ফুলতলীর মত একটা জায়গায় থাকে তাদের কথা আপনার মনে না থাকারই কথা। কিন্তু আমরা আপনার কথা ভুলতে পারিনি। মা প্রায়ই আপনার কথা বলেন। বাবা চিঠি এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করেন। আর দিদি তো রেগে কাঁই হয়ে আছে। দেখা হলে নির্ঘাত ঝাড় খাবেন।

আমরা মোটামুটি ভালই আছি। আপনি কেমন থাকেন জানাবেন। চিঠি দেবেন। আর যত শীঘ্র সম্ভব একবার বেড়াতে আসবেন। ইতি,

রিকু।'

মুকুল চিঠিটা কয়েকবার পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর লিখতে বসে গেল। কিন্তু উত্তর পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না। শনিবারই ফুলতলী এক্সপ্রেসে চেপে পড়ল মনোহরবাবু তাকে দেখে খুবই খুশী হলেন। মায়াদেবী তো জামাই আদর করতে লাগলেন আর রিকু তার সারাটা সময় ভরিয়ে রাখল। রিকুর দিদি তেমন ধারে কাছে এল না। শুধু ফেরার সময় বলল, "আবার আসবেন।"

ফিরেই মুকুল রিকুকে চিঠি লিখল। পরের সপ্তাহেই উত্তর পেল। তারপরের সপ্তাহেই মনোহরবাবু এসে অনুযোগ করলেন, "আমার বয়স হয়েছে, এটা জান তো ? আর প্রিন্সিপ্যালের কাজটা কি রকম বাজে তুমি তো বোঝ ! তারপরেও আমি আসতে পারিনি বলে তুমি যাবে না, এটা কি রকম কথা হল ? মীনার মা বারবার করে বলেছেন। তুমি অবশ্যই যাবে।"

মুকুল মনোহরবাবুর অনুযোগ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিল এবং রিকুর ফুলের মত মুখখানি ভাবতে ভাবতে শনিবার আবার ফুলতলী এসে পৌঁছল। রিকু স্কুলে চলে গেলে সে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল। বিকেলবেলায় উঠে বাথরুমে যাচ্ছিল। বাইরের বারান্দা থেকে মা-মেয়ের কথা কানে এল।

"...কিন্তু যদি মুকুল বলে, আমার বিকুকেই পছন্দ। আমি রিকুকেই বিয়ে করব ! তা হলে কি করবি ?"

"মা, তুমি ভাবলে কি করে যে, আমি ওই কালো ভূতটাকে বিয়ে করতে রাজী হব ?"

এরপরে আর কোন কথা তার কানে ঢুকল না। সে বাথরুম যাওয়ার কথাও ভুলে গেল। সমস্ত অনুভূতিটা তিত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে সে আবার শুয়ে পড়ল। ঘণ্টাখানেক পরে মায়াদেবী এসে তাড়া লাগাল, "সন্ধ্যাবেলা শুয়ে আছ কেন গো ? ওরা সব বসে আছে চল, চা খাবে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুকুল উঠে গেল। চা খেল। কথাবার্তা বলল। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল। মীনা এসে মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। রিকুর তুলনায় মীনাকে অনেক ভাল বলে মনে হল। সকালবেলায় মনোহরবাবু মীনার সঙ্গে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিল। মুকুল কিছু না ভেবেই রাজী হয়ে গেল।

হয়ত বা রিকুর ওপরে রাগ করেই। কিন্তু বিয়ের পর রিকু অত্যন্ত আন্তরিকভাবে মেলামেশা করতে লাগল। পরীক্ষার পর যাদবপুরের বাসাতেও এল।

রিকু সাজগোজ করে বারান্দায় বসে ছিল। মুকুল ক্লাস থেকে ফিরে হাল্কাভাবে জিজ্ঞেস করল, "সেই সৌভাগ্যবানটি কে ? যার জন্য এই অভিসার সজ্জা ! আমি নই নিশ্চয় ?"

"আপনি কি করে হবেন। আপনি তো দিদিকে বিয়ে করে নিলেন ?"

"কি করব ? তুমি তো রাজী হলে না !"

"বাজে কথা বলবেন না। আমার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হয়নি।"

'অন্তত একদিন হয়েছিল। মা জিজ্ঞেস করছিলেন। তুমি বললে, ঐ কালো ভূতটাকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।"

রিকু হেসে উঠল। "আপনি আচ্ছা বোকা তো ! দিদির সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হচ্ছে। আমি আগ বাড়িয়ে বলব, 'আমি বিয়ে করব !'

"কিন্তু আমি যদি বলতাম, 'আমি রিকুকেই বিয়ে কবব !' তাহলে রাজী হতে ?"

"হতাম। এবার খুশী তো ?"

না মুকুল খুশী হতে পারেনি। বরং তার দুঃখই হয়েছিল। মনে হযেছিল, রাগের মাথায় মীনাকে বিয়ে করে না বসলে সে রিকুকেই পেতে পারত।

সারা সন্ধ্যাটা ধরে মনের আকাশে এরকম আফসোসের মেঘ জমছিল। বিছানায় গিয়ে বজ্রপাত হল। মীনা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমাকে তো তোমার পছন্দ নয়, কি বল ?"

"এসব কি বলছ ?"

"দেখ, ন্যাকামী কোরো না। আমি নিজে কানে শুনেছি তুমি তো রিকুকে পছন্দ কর। তাহলে আমাকে বিয়ে করলে কেন ? রিকুর সঙ্গে মেলামেশাটা বজায় রাখার জন্যে ?"

মুকুল অনেক করে বোঝাতে চাইল। কিন্তু পারল না। মীনা গুম হয়ে থাকল। সকালে বোনকে নিয়ে ফুলতলী চলে গেল। তিন দিন পরে খবর এল, পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। মুকুল মর্মান্তিক দুঃখ পেল।

মুকুলের সঙ্গে মীনার মনোমালিন্যের কথা কেউ জানত না। এমন কি রিকুও না। তারা কিছুতেই বুঝতে পারল না, মীনা কেন আত্মহত্যা করতে গেল। অনেকে গবেষণা করে বের করল, সহপাঠী স্বপনের সঙ্গে তার হৃদ্যতা ছিল। সে স্বপনকেই বিয়ে করতে চাইত। মুকুলের সঙ্গে বিয়ে সে মেনে নিতে পারেনি। তাই আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু মুকুল জানত যে মীনার মৃত্যুর জন্য সেই-ই দায়ী। মুকুলের ওপর অভিমান করেই সে চলে গেল। চিতার ওপর শোয়ানো তার মুখখানি দেখে মনে হয়, সে এখনও অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। পাশাপাশি তার আগের দিনের মুখগুলি মনে পড়ল। মুকুল আর সহ্য করতে পারেনি। শ্মশান থেকে সোজা এসে ট্রেনে চেপেছিল। তারপর আর কখনও ফুলতলী যায়নি।

বছর দুয়েক পরে মনোহরবাবু এসে বললেন, "মীনা যা করল তার পর তোমাকে বলার কিছু নাই। তবে আমাদের খবরও তো এক-আধবার নিতে হয়। তোমার মা বারবার তোমার জন্যে দুঃখ করে। রিকু এবার থার্ড ইয়ারে উঠেছে। ও-ও তোমার কথা খুব বলে। তুমি একবার যেও। একদিনের জন্য হলেও একবার বেড়িয়ে এস।"

অনেকদিন পরে রিকুর সুন্দর মুখখানি আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এখন তো মীনা নেই। আর রিকুরও বিয়ের বয়স হয়েছে। তাহলে এখন তো সে রিকুকে পেতেই পারে। রিকুকে পাবার আশায় সে আবাব ফুলতলী গেল। শ্বশুর খুশী হলেন। শাশুড়ি আগের মতন আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু রিকু পাত্তা দিল না।

বিকেলে চা খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। রিকু হাল্কাভাবে বলল, অনেকদিন তো হল। এবার একটা বিয়ে করে ফেলুন।"

"তুমি রাজী হলে করতে পারি।"

রিকু গায়েই মাখল না। হাসতে হাসতে বলল, "ঠাট্টার সম্পর্ক। ঠাট্টা আপনি করতেই পারেন। তার মানে এই নয় যে, আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান।" এরপরে মুকুল আর

কিছুতেই বলতে পারল না "না রিকু, সত্যিই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

সন্ধ্যাবেলায় রিকু ছাদে উঠে দাঁড়িয়েছিল। উদাস রিকুকে যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। মুকুল গিয়ে পাশে দাঁড়াল। তার বুকের মধ্যেটা আবেগে ওটা নামা করছে। আস্তে করে সে রিকুর হাতটা ধরল। রিকু কায়দা করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আমি দিদি নই!" মুকুল হোঁচট খেল। রিকু কি বলতে চাইছে? 'আমি দিদির মত অত শস্তা নই!' না, "আমি দিদির মত আপনার বিবাহিত স্ত্রী নই!" দ্বিতীয়টা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

রিকু ছাদ থেকে নেমে মেঝের ওপর পড়তে বসল। মুকুল গিয়ে তার গা ঘেঁষে বসল। রিকু মুখে কোনরকম ভাবান্তর না দেখিয়ে একটুখানি সরে বসে পড়তে লাগল। মুকুল দূরে বসেই দেখতে লাগল। ইচ্ছে থাকলেও সঙ্কোচে আর কাছে যেতে পারল না। অপমানিত বোধ কবল। উঠে এসে শুয়ে পড়ল। ঠিক করল, সকালেই চলে যাবে। কিন্তু শাশুড়ি ছাড়লেন না। রিকুর কলেজে বেরনোর সময় বললেন, "তোর তো আজ একটায় ক্লাস শেষ। মুকুলকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখে আসবি। মুকুল তুমি একটার সময় কলেজের সামনে অপেক্ষা করবে।"

রিকু 'হ্যাঁ-না' কিছু না বলেই কলেজ চলে গেল। মুকুল ধরে নিল, মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। সে দুহাতে সময়কে ঠেলতে লাগল। পৌনে একটা বাজল, একটা বাজল, সওয়া একটা বাজল, দেড়টা বাজল। রিকুর দেখা নেই। অবশেষে তিনটের সময় কয়েকজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করতে—করতে রিকু বের হল। মুকুলের কাছে এগিয়ে এসে বলল, "আমার বন্ধু অমল। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।" মুকুল অনেক কষ্টে হাত তুলে নমস্কার করল। রিকু বলে চলল, "ওরা বলছে, সবাই মিলে আজ নদীর ধারে বেড়াতে যাবে। আপনি তাহলে বাড়ীতে খবরটা দিয়ে দেবেন, কেমন। অমল চল্।"

রিকু অমলের সঙ্গে চলে গেল। মুকুল খানিকক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল। তার ভিতরের বিবেকটা বেত্রাহত কুকুরের মত ক্যাঁও ক্যাঁও ধিক্কার দিল। ওখান থেকেই ট্রেন ধরে বাড়ীতে ফিরে এল। ঠিক করল, মনে যাই হোক রিকুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে সে আর অপমানিত হবে না। আর কোনদিন ফুলতলীতেও যাবে না। যায়ও নি। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে রিকুই বেড়াতে এল। ভদ্রতার জন্য যতটা কথা না বললে নয় মুকুল তার বেশী কিছু বলল না। রাতে খাবার পর ওদের জন্য বিছানায় কাচা চাদর বিছিয়ে দিল।

মুকুল বসার ঘরে বসে ছিল। রাতের কাপড় পরে রিকু এসে বলল, "দাদা তাহলে শুতে চললাম।" মুকুল চোখ তুলে চাইল। আর চোখ ফেরাতে পারল না। বিয়ের পর রিকু যেন আরও সুন্দর হয়েছে। লোভনীয় ঠোঁট, নিরেট গাল, সুডৌল হাত,উন্নত বুক—সব মিলিয়ে....। শরীরের মধ্যে কামড় দেয়, রক্ত কথা বলে, স্নায়ু টান টান হয়ে ওঠে। দু হাতে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিতে ইচ্ছে করে। তার তো কোন উপায় নেই, তাই শুধু দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে। অমলকে সৌভাগ্যবান মনে হয়। অথচ অমল যে তার থেকে ভাল কাজ করে তাও নয়। তার থেকে দেখতে সুন্দর তাও নয়, তবুও সে রিকুকে পেয়েছে। কিন্তু সে পেল না।

সমস্ত জীবন ধরে সে শুধু একজন পছন্দমত জীবনসঙ্গিনী চেয়েছে। ধন-দৌলত, মান-সম্মান কিছু চায় নি। না, মান-সম্মান সে কিছুটা চেয়েছিল তবে তাও সুন্দরীদের মন টানবার জন্য। তার ধারণা ছিল, ভালভাবে পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে সে পছন্দমত সঙ্গিনী নির্বাচন করতে পারবে। সেইজন্য সমস্ত শক্তি পড়াশোনাতে দিয়েছিল। ভাল রেজাল্ট করেছিল। তারপরে ভাল গবেষণাও করেছে। পার-অক্সাইডের ওপর এখন সে একজন

অথরিটি। কিন্তু তাতেও কোন সুন্দরীর মন টলল না। সুন্দরীদের মন যে কিসে টলে, তা সে আজও বুঝে উঠতে পারল না। হতাশ কণ্ঠে বলল, "যাও।"

সকালে ওরা চলে গেল। মুকুল থাকল তার পড়ানো আর পার-অক্সাইড নিয়ে। কিন্তু অবসর নেওয়ার পর আজ তিন চার বছর সে পড়ানো বা পার অক্সাইডও নেই। শুধু পড়ে আছে কতকগুলো বই। আর পড়তেও ভাল লাগে না। পড়ে কি হবে ? এত পড়ে কি হল ? এই যে পাঁচ সাত দিন সে জ্বর নিয়ে পড়ে আছে কেউ খোঁজ নিচ্ছে !' কাজের মেয়েটা ঘর ঝাঁট দিয়ে চলে গেছে সেই সকালে। কাল সকালের আগে আর আসবে না। এত বড় বাড়ীটায় সে একান্ত একা। জ্বরের ঘোরে মরে থাকলেও কাল সকালের আগে কেউ জানতে পারবে না। মাথার মধ্যেটা টন টন করে উঠল। মাথায় হাত দিয়ে দেখল বেদম জ্বর আসছে। তা হলে কি সন্ধ্যা হয়ে গেল ? মুকুল বোঝার চেষ্টা করল। বুঝতে পারল না। সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

আচ্ছন্নতার মধ্যে মনে হল, কে যেন বেল বাজাল। কে যেন বিছানার ওপর এসে বসল ! মনীষা বলে মনে হল। না তো, মুখটা রিকুর মত। মুকুলের ইচ্ছে হল, রিকু যদি তার হাতটা কপালের ওপর রাখত। সে দুহাতে দিয়ে হাতটা চেপে ধরত। কিন্তু সঙ্কোচে রিকুকে বলতে পারল না। মীনার মুখটা ভেসে উঠল। সে বলল, "আমি কপালে হাত দিতে পারতাম। কিন্তু তুমি তো আমাকে পছন্দ কর না।"

বন্ধ দরজা

দরজাটা বন্ধ করে লক্ষ্মী বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিল। অনেকদিন পর তার খুব ভাল লাগছে। নিখিল কথা দিয়েছে, তাকে বিয়ে করবে। জীবনটা এভাবে ব্যারাকেই শেষ হবে না। তারও একটা বাড়ি হবে। সেখানে সে থাকবে, তার স্বামী থাকবে, আর একটা বাচ্চা। এ চাকরি করে কি আর ছাই বাচ্চা নেওয়া যাবে ? দরকার হলে সে চাকরিটা ছেড়ে দেবে। নিখিল যা পাবে, কষ্ট করে তাতেই চালিয়ে নেবে। তবুও সে বাচ্চা নেবে। ঘর-সংসার করবে। এই বিরস ব্যারাক-জীবন আর ভালো লাগে না।

২

লক্ষ্মীর সম্মতি পেয়ে নিখিলের মনটাও খুশিতে ডগমগ করছিল। আর কটা দিন পরেই লক্ষ্মী শুধু তার হবে। শুধু তার, আর কারও নয়। খুশির আমেজে তার চোখ বুজে আসছিল।

বিমান এসে বলল, 'শুনলাম তুই লক্ষ্মীকে বিয়ে করছিস। সব কিছু জেনে করছিস তো ?'

নিখিল খাটের ওপর উঠে বসল। লোহার খাট ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করল। স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে সে জিজ্ঞেস করল, 'সব কিছু মানে ?'

'সব কিছু মানে লক্ষ্মী কোথায় কী করেছে সেসব কথা।'

'কোথায় কী করেছে ?'

'সত্যিই জানিস নে বলছিস ? তাহলে শোন্ লক্ষ্মীর বয়স যখন পনের-ষোল তখন থেকেই হাতেখড়ি। হাটখোলায় একটা টালি কারখানা আছে জানিস নিশ্চয়। লক্ষ্মী ঐ কারখানার মালিকের বাড়িতে কাজ করত। দিনের বেলায় ঘর-দোর ঝাড় দিত, থালা-বাসন মাজত, ভাত রাঁধত। রাত্রিবেলায় কী করত কেউ দেখেনি। তবে সবাই বলে মালিক নরেন পালের সাথে তার মাখামাখি ছিল। বিয়ে হতেই নরেনের বউ ওকে ছাড়িয়ে দেয়। লক্ষ্মী কাজ নেয় পাড়ার সরকার বাড়িতে। কিন্তু সরকার বাড়ির মেজ ছেলের সঙ্গে এমন লটোঘটো পাকায় যে ছমাসও থাকতে পারে না। তারপর থানায় হোমগার্ড। অনেক ভক্ত জুটে যায়। ছোটবাবু তো দিনরাত লক্ষ্মীদের বাড়িতেই পড়ে থাকত। তাই দেখে বড়বাবু অ্যাডিশনাল সাহেবকে ধরে ওকে সদরে পাঠিয়ে দিল। তা ছুঁড়ির এলেম আছে বলতে হবে। মাসখানেকের মধ্যেই অ্যাডিশনাল কাৎ। বলে কিনা,-আমার বাড়িতে ডিউটি লাগাও।

যাই বলে আসি। না হলে আবার আমাকেই কৈফিয়ত দিতে হবে।'

বিমান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৩

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। লক্ষ্মী দরজা খুলে দেখল, হোমগার্ড অফিসের বিমান দাঁড়িয়ে আছে। বিমান বলল, 'কাল থেকে তোর ডিউটি হবে অ্যাডিশনাল সাহেবের বাসায়।'

বাসায় ডিউটি মানে কী, তা লক্ষ্মী জানে। তাই বিমানের খবরে সে খুশি হতে পারল না। খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোকে কে বলল,'

'হাবিলদার সাহেব।'

হাবিলদার বিমানকে বলেছিল বটে। তবে এরকমটা বলেনি। অ্যাডিশনাল এস পি র ইচ্ছে, লক্ষ্মীকে তাঁর বাসায় দেওয়া হোক। তাই সে বিমানকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল, লক্ষ্মী অ্যাডিশনাল সাহেবের বাসায় কাজ করতে চায় কি না। বিমানের মনে হল, হাবিলদার সাহেবের এটা বাড়াবাড়ি। লক্ষ্মীর মত একটা হোমগার্ড মেয়ের অত মতামত নেওয়ার কী আছে ? অ্যাডিশনাল সাহেব যখন চাচ্ছেন, ও ডিউটি করবে। লক্ষ্মীকে এসে সে সেরকমই বলল।

লক্ষ্মী এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'হাবিলদার সাহেবকে বলিস, কারও বাসায় ডিউটি আমি করতে পারব না।'

'ইচ্ছে হলে তুই বলিস। আমার ডিউটি শোনানোর আদেশ ছিল, আমি শুনিয়ে দিয়েছি। বাস্।'

বিমান লক্ষ্মীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলে গেল।

৪

লক্ষ্মী অ্যাডিশনালের বাড়িতে ডিউটি করতে চায় না। লোকের বাড়িতে কাজ করাই তাকে এই নিঃসঙ্গ, দুঃখময় জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তখন নরেন পালের টালি কারখানাটা সবে শুরু হয়েছে। নরেন পাল ছিল। কিন্তু ওর মামা শম্ভু পালই দেখাশোনা করত। আলাপী মানুষ। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করতে আসত। লক্ষ্মীর তখন কাঁচা বয়স। ষোল কি সতের হবে। বাবা পড়ার খরচ চালাতে পারল না। তাই পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে আছে। শুধু বসে নেই, রান্নাবান্না করে, ঘর ঝাড় দেয়। ছোট্ট বাড়িটাকে ঝকঝকে, তকতকে করে রাখে। কেউ এলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আসন পেতে বসতে দেয়। নিজেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। তাছাড়া সে দেখতে-শুনতেও মন্দ ছিল না।

শম্ভু পালের লক্ষ্মীকে খুব পছন্দ হয়ে থাকবে। একদিন সে লক্ষ্মীর বাবাকে বলল, 'রথীনদা, আমার খুব ইচ্ছে মা-লক্ষ্মীকে আমার ভাগ্নে-বৌ করি।' লক্ষ্মীর বাবা কী বলবে ভেবে পেল না। এ তো তার কাছে হাতে আকাশের চাঁদ পাওয়া। যদিও তাদের একই সমাজ, তবুও কোথায় টালি কারখানার মালিক শম্ভু পাল আর কোথায় দেড়শ টাকা মাইনের চৌকিদার রথীন পাল ! শম্ভু পাল বলে চলল, 'কিন্তু, এখনকার ছেলেমেয়ে বোঝেন তো ! যদি হঠাৎ করে বলতে যাই, হয়ত রাজিই হবে না। তাই বলছি কি, মা যদি আমাদের ঘরের কাজটাজ টুকটাক করে দিয়ে আসে, তা হলে হয়তো নরেন নিজে থেকেই রাজি হয়ে যাবে। মা আমাদের দেখতে-শুনতে তো খারাপ না !'

লক্ষ্মী সেদিন সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। নরেনের যৌবনদীপ্ত মুখটা বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ভেসে উঠছিল টালি কারখানা আর নরেনদের দোতলা বাড়িটাও। সে ঐ বাড়ির বউ হবে। ঐ কারখানার মালিক হবে। তখন তার খাওয়া-পরার আর কোনও অভাব থাকবে না। কিন্তু মা-বাবা আর দাদাটা তখনও গরিব থেকে যাবে। এই একটা চালাঘরেই তাদের জীবন কাটাতে হবে। কোনওদিন খাবার জুটবে। কোনওদিন জুটবে না। তাদের জন্য লক্ষ্মীর ভারি কষ্ট হতে লাগল। সকালবেলায় বাবা লক্ষ্মীকে সাথে করে কারখানায় নিয়ে গেল। অনেকগুলি মুনিষ টালি তৈরি করছিল। নরেন পাল তাদের কাজ তদারক করছিল। শম্ভু পাল একটা টুলের ওপর বসে সকালের মৃদু রোদ উপভোগ করছিল। তাদের দেখে উঠে দাঁড়াল, 'আসুন আসুন রথীনদা। এসো মা-লক্ষ্মী।' সে তাদের কারখানার লাগোয়া

তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

শম্ভু পালের বাড়িটা হাউস—হোম নয়। তার কোনও ছেলেমেয়ে নেই। বছর খানেক আগে স্ত্রীও মারা গেছে। এত বড় বাড়িটায় শম্ভু পাল একেবারে একা। সেই একাকিত্বের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে ভাগ্নেকে নিজের কাছে এনেছে। তাতেও বাড়ির হাল ফেরেনি। কী করে ফিরবে ? পুরুষরা শুধু হাউস বানাতে পারে ; নারীই তাকে হোম করে তোলে। শম্ভু পাল ভেবেছিল লক্ষ্মী হবে সেই নারী।

তা লক্ষ্মী চেষ্টার কসুর করেনি। সকালবেলায় এসেই সে ঘরদোর ঝাড় দিত। রান্না-বান্না করত। তারপর ঘর গুছোতে লাগত। যে জিনিসটা যেখানে থাকার কথা সেখানে গুছিয়ে রাখত। কিছু আনানোর দরকার হলে মামাকে বলত। হ্যাঁ, শম্ভু পালকে লক্ষ্মী মামা-ই বলত। নরেন যখন মামা বলে, তাকেও বলতে হবে। শম্ভু পাল খুশি হত। দুপুরবেলা খাটের ওপর বসে বলত, 'লক্ষ্মী মা, একটু ধর্মের কথা পড়ে শোনাও তো।' লক্ষ্মী তাকে থেকে কৃত্তিবাসের রামায়ণখানা পেড়ে পড়তে শুরু করত—

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥

শম্ভু পালের চোখ ছলছল করে উঠত। এক সময় রামাযণ বন্ধ করে লক্ষ্মী শাসনের সুরে বলত, 'মামা, আপন'র কিন্তু একটু গড়িয়ে নেওয়ার সময় চলে যাচ্ছে। বিকেল না হতেই তো আবার মুনিষগুলোর হিসেব-নিকেশ নিয়ে বসে পড়বেন। শুয়ে পড়ুন এক্ষুনি।' বৃদ্ধ শম্ভু পাল বাধ্য শিশুর মত সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ত। লক্ষ্মী একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকত। অল্প সময়ের মধ্যেই শম্ভু পাল ঘুমিয়ে পড়ত। লক্ষ্মী তখন অন্য কাজে মন দিত।

রাত্রিবেলা বাবা নিতে আসত। ফেরার পথে নানারকম কথা জিজ্ঞেস করত। একেক দিন চুপিচুপি জানতে চাইত, 'কী রে নরেনের সাথে কোনও কথা হল ? সে কী বলে ?' লক্ষ্মীর লজ্জা করত। কিছু বলতে পারত না। আর বলার মত কিছু ছিলও না। নরেন সব সময় তার থেকে দূরে-দূরে থাকত। লক্ষ্মী যখন বাড়িতে একা থাকত তখন ভুল করেও বাড়িতে আসত না। কোনও কিছুর দরকার হলে নিজেই নিয়ে নিত। লক্ষ্মীকে কিছু বলত না। মামা-ভাগ্নে একসঙ্গে খেতে বসত বটে। কিন্তু লক্ষ্মী যা দিত তাই খেয়ে উঠে যেত। ভাল হলে প্রশংসা করত না, খারাপ হলেও কোনও অনুযোগ করত না। কম দিলে চাইত না, আবার বেশি দিলেও ফেলে রাখত না। কোনও কথা বলত না। মা শুনে রেগে যেত, 'তা তুইও তো বলতে পারিস, নরেনদা, আর দুমুঠো ভাত দেব ? কি আর একটু ঝোল দেব ?'

'ধুস, ওরকম গায়ে পড়ে কথা বলতে আমার ভাল লাগে না।'

'তা লাগবে কেন ? রাজার ঝি কি না ! বাবার রাজপাট নিয়ে বসে থাক ! তাও যদি বাবার চালচুলো কিছু থাকত। পড়বে আমার মত হাড়-হাভাতের ঘরে। হাড়-মাস কালি হবে ; তখন কথা বলতে ভাল লাগবে।'

আবার কখনও মনটা ভাল থাকলে লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, তা প্রথম-প্রথম ওরকম লজ্জা সকলেরই করে। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। শম্ভু পালও সেরকমই মনে করত। হাজার হলেও তার ভাগ্নে তো। তার কথা নিশ্চয় ফেলতে পারবে না।

কিন্তু সে ভাগ্নেকে কোনও কথা বলারই সুযোগ পেল না। সলিমের মুখে শুনল, নরেন পাশের গ্রামের গণেশ পালের মেয়ের সঙ্গে 'লাভ ম্যারেজ' করেছে। মেয়েটা হাই স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ে। ভাগ্নেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল। নরেন এতদিন সঙ্কোচে মামাকে বলতে পারছিল না। মামার প্রশ্নের মুখে সব স্বীকার করল। মামা বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকল।

পরের দিন সকালে হেড মিস্ত্রি হামিদ এসে বলল, "মামা, বৌ আনতে যাব। টাকা দেন।' শম্ভু পাল অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকা বের করে দিল। নতুন বউকে লক্ষ্মীই বরণ করে ঘরে তুলল। বউয়ের গায়ের রং লক্ষ্মীর থেকে ভাল নয়। তবে বেশ সুশ্রী। আর দেখলেই বোঝা যায়, অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। লক্ষ্মীর মনে হল, মামাও যেন বউ দেখে খুশি হয়েছে। আর তার যে অখুশি হওয়ার মত কারণ থাকতে পারে সেকথাও কেউ ভাবছে না। সে বউকে ঘর-দোর বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

ফেরার পথে বাবা কোনও কথা জিজ্ঞেস করল না। বাড়িতে এসে দেখল, মা বাক্‌শূন্য। পরের দিন সকালে আর সে কাজে গেল না।

সপ্তাহখানেক পরে মা মুখ খুলল। মুখ খুলেই সে বলল, 'নরেন পাল বিয়ে করেনি তো কী হয়েছে। মেয়ের বিয়ে আমি ওর থেকে ভাল জাগায় দিব। সে স্বামীকে তাড়া লাগাল। রথীন মেয়ের জন্য উপযুক্ত ছেলে খুঁজতে লেগে গেল। কয়েকটি সম্বন্ধও এল। লক্ষ্মীকে দেখে সকলেরই পছন্দ হয়। কিন্তু দেনা-পাওনার কথা উঠলেই সম্বন্ধ ভেঙে যায়। আজকাল মেয়ের বিয়ে দিতে হলে হাটে গরু-ছাগল কেনার মত দর-দাম করে ছেলে কিনতে হয়। লক্ষ্মীর বাবার টাকা ছিল না। লক্ষ্মীর বিয়ে হল না।

সমর সরকার ডেকে বলল, 'এমনি এমনি তো বিয়ে হবে না। মিহিরের মেয়েটা আবার কাজ করবে না বলছে। তা লক্ষ্মীকে লাগিয়ে দে। দুবেলা খাওয়া ছাড়াও মাসে মাসে একশ টাকা মাইনা দিব। তাও বছরে এক হাজার 'দেড় হাজার টাকা জমবে। কাল থেকেই পাঠিয়ে দে।'

সমর সরকার গ্রামের সব থেকে অবস্থাপন্ন লোক। তার ওপর পঞ্চায়েতের প্রধান। বলতে গেলে থানার বড়বাবুর পরেই সে রথীন চৌকিদারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তার কথা কি ফেলা যায়? লক্ষ্মী সরকার বাড়িতে কাজ করতে এল।

প্রথম দিনেই বুঝল, শম্ভু পালের বাড়ি আর সমর সরকারের বাড়িতে আকাশ-পাতাল ফারাক। সেখানে সে নিজের খুশিমত কাজ করত। তাকে বকাবকি করার কেউ ছিল না। বরং শম্ভু পাল খুশি হয়ে তার কাজের প্রশংসাই করত। এখানে সরকার গিন্নি পদে পদে তার কাজের খুঁত ধরে। এক কাজ বারবার করতে হয়। তার পরেও বকাবকি শুনতে হয়। আর এক মুহূর্ত ফুরসত নেই। সকালে এসেই চায়ের জল বসাও। চা করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দাও। এরপরে ঘর-দোর ঝাড় দিয়ে থালা-বাসন মাজতে বসো। হাঁড়ি-কুড়ি ধোও। গিন্নির ততক্ষণে রান্না চড়াবার সময় হয়েছে। উনুনে আঁচ ধরাও। রান্নার জিনিসপত্রের জোগান দাও। বড় ছেলে এবং তার বউ ততক্ষণে স্নানের ঘরের কাছে হাজির। তাদের স্নানের জল দাও। স্নান শেষ হওয়ার আগেই খাবার সাজিয়ে রাখ। খেয়ে তারা হাই স্কুলে পড়াতে যাবে। কিন্তু ততক্ষণে বড় মেয়ে স্নানের ঘরে ঢুকেছে। তারও স্নানের জল চাই। না হলে প্রাইমারি স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাবে। এরপরে কর্তা-গিন্নি। তাদের স্নান-খাওয়া হতে হতে দুপুর গড়িয়ে যায়। কিন্তু লক্ষ্মীর কাজ তখনও শেষ হয় না। সে সকলের ছেড়ে-যাওয়া কাপড়গুলো কাচতে বসে। সেগুলো শুকোতে দিয়ে খেতে বসতে বসতে তার বিকেল হয়ে যায়। তখন হয়ত মেজছেলে শ্যামল ফিরে এসেছে।

শ্যামল বেশি পড়াশোনা করেনি। মাধ্যমিকে বার তিনেক ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। জমিজমা দেখাশোনা করে। মাসখানেক হল ডিপ-টিউবওয়েলের কাছে গম পেষাইয়ের কল করেছে। সকালে-বিকালে ওখানেই থাকে। দুপুরে বাড়িতে খেতে আসে। কর্তা ততক্ষণে পঞ্চায়েতে আর গিন্নি দিবানিদ্রায় মগ্ন। শ্যামল তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে লক্ষ্মীর কাছে বসে। গল্প করে। মাঝে মাঝে বাড়ির লোকদের লুকিয়ে লক্ষ্মীকে সাবান-ফুল-তেল-পাউডার

এনে দেয়। একদিন একটা শাড়িও দিয়েছিল। লক্ষ্মী নিতে চায়নি। কিন্তু শ্যামল জোর করে দিয়েছিল। আরেকদিন কথায় কথায় বলেছিল, আমার ইচ্ছে করে তোকে বিয়ে করি।'

'আপনার বাবা-মা রাজি হবে কেন ?'

'না হলে দেখিস, তোকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাব।'

লক্ষ্মী বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু তার ভাল লেগেছিল। শ্যামল যদি তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়, তাহলে বেশ হয়। বাবা তো তার বিয়ে দিতে পারবে না। আর কতদিন সে লোকের বাড়ি দাসীবৃত্তি করবে ? তার থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। সে শ্যামলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। সেইজন্যই শ্যামল যখন সেদিন দুপুরে তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিল, সে আপত্তি করতে পারেনি। আপত্তি করতে পারেনি তখনও, শ্যামল যখন তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল। সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শ্যামলের হাতে সঁপে দিয়েছিল। শ্যামল তাকে দস্যুর মত নিঃশেষে লুট করে নিয়েছিল। তার খারাপ লাগেনি। কিন্তু শ্যামল চলে যেতেই তার ভয় করছিল। তাই বিকেলে গিন্নির জেরার মুখে সব বলে ফেলেছিল। গিন্নি দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'যা করেছিস, করেছিস। এখন কাউকে কিছু বলিস নে। পাঁচকান হলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে। দুর্নাম রটবে। বিয়েটা হয়ে যাক। তাহলে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। কৃতজ্ঞতায় লক্ষ্মীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে গিন্নির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। একদম ফুরফুরে মন নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

পরের দিন বড় মেয়ে বলল, মা শনি-রবিবারে আমি তো শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। আমি একা মিঠুকে সামলাতে পারব না। লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলল, 'নিয়ে যাবি যা। আমি ওর বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দেব। লক্ষ্মী না বলতে পারল না। মিঠুকে নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ি বহরমপুর চলে গেল। সোমবারে ফেরার কথা ছিল। ফেরা হল না। মিঠুর মা কী কাজে আটকে গেল। তার কাজ শেষ হতে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। লক্ষ্মীরা হাটখোলা ফিরল মাসখানেক পরে। ফিরে দেখল বাড়িতে নতুন বউ। গঞ্জের হাতুড়ে ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে শ্যামলের বিয়ে হয়ে গেছে। লক্ষ্মী স্তম্ভিত হয়ে গেল। কী করবে, কাকে কী বলবে, কিছু ঠিক করতে পারল না। মনে মনে শ্যামলকে খোঁজ করল। পেল না। রাতে আরও একবার ভগ্নচিত্তে বাড়ি ফিরল। মা জিজ্ঞেস করল, 'মিঠুর মার কী অসুখ হয়েছিল রে ? শ্যামলের বিয়েতেও এল না ?' লক্ষ্মী চমকে উঠল। সব বুঝতে পারল। কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারল না।

৬

মাসখানেক আগে লক্ষ্মীর বাবার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছিল। বাবার আশা ছিল, বাবুদের বলে-কয়ে ছেলেটাকে নিজের জায়গায় ঢুকিয়ে দেবে। অনেক করে বলেও ছিল। কিন্তু সবার এক কথা। সরকার নাকি আইন পাস করেছে। রিটায়ার করলে তার জায়গায় নতুন করে কোনও চৌকিদার দফাদার নেওয়া হবে না। বি ডি ও সাহেব বলেছিলেন, বরং বড়বাবুকে ধরো গে, যদি হোমগার্ডে ভর্তি করে নিতে পারে। বড়বাবু বললেন, 'ছেলেদের হোমগার্ডে ভর্তি করা এখন বন্ধ আছে। শুধু দু-একজন মেয়েকে নেওয়া হতে পারে।'

লক্ষ্মী বলল, 'বাবা, বড়বাবুকে বল না, আমাকে নিয়ে নিক।'

'ও-কাজ ভাল না মা। থানার তো চোর-বদমাশদের নিয়ে কারবার। তাছাড়া কখন কোথায় যেতে হয় তারও ঠিক নেই। হয়ত রাত বিরেতেও অ-জায়গায় কু-জায়গায় যেতে হবে। খুব খারাপ কাজ মা।'

'তোমার শম্ভু পাল আর সমর সরকারের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করার থেকেও ?'

সেকথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বাবা বলল, 'খুব খারাপ কাজ মা। তুই পারবি নে।'

লক্ষ্মী বলল, 'তুমি যাও বাবা। বড়বাবুকে বল, আমি পারব।'

রথীনের ইচ্ছে ছিল না, মেয়েকে হোমগার্ডে ভর্তি করে। কিন্তু না করে উপায়ও ছিল না। তার চাকরি শেষ হয়েছে। ছেলেটা বেকার। মেয়েটা সরকার বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত। কদিন থেকে তাও যাচ্ছে না। এরকম চলতে থাকলে তাদের না-খেয়েই মরতে হবে। তার থেকে হোমগার্ড হওয়াও ভাল। লক্ষ্মী হোমগার্ড হল। স্থানীয় থানাতেই থাকল।

বিমান তখন ঐ থানায় ছিল। সে খুব তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীর ভক্ত হয়ে গেল। একদিন চুপিচুপি এসে বিয়েরও প্রস্তাব দিল। কিন্তু লক্ষ্মী তখন আর বিয়ের কথায় ভোলে না। সে বিমানকে পাত্তা দিল না। কিন্তু বিমান তাকে ছাড়ল না। ছায়ার মত তার পিছেপিছে ঘুরতে লাগল। ততদিনে থানার ছোটবাবু রমেনও লক্ষ্মীর ভক্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি কলকাঠি নেড়ে বিমানকে বদলি করলেন। তারপর সব সময় লক্ষ্মীকে আগলে থাকতে লাগলেন। বিভিন্ন ছুতোনাতা করে বাসায়ও ডাকা শুরু করলেন। বড়বাবুকে বলায় বাসায় ডাকা বন্ধ হল। কিন্তু তিনি লক্ষ্মীদের বাড়িতে আসতে শুরু করলেন। লক্ষ্মীর ব্যাপাবটা পছন্দ ছিল না। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে এত খাতির-যত্ন করত যে তাঁর প্রতিদিন আসাটাই যেন স্বাভাবিক ছিল। তিনি প্রতিদিনই আসতেন। কোনও কোনও দিন রাতে থেকেও যেতেন।

সেদিনও ছিলেন। তাঁর কাছে লক্ষ্মীকে একা রেখে বাবা-মা কীর্তন শুনতে চলে গেল। বাবা-মার উদ্দেশ্য বুঝতে লক্ষ্মীর অসুবিধে হল না। চোখ দেখে মনে হল, ছোটবাবুর উদ্দেশ্যও খুব পরিস্কার। সে মানসিক দিক থেকে তৈরি হয়ে থাকল। কথা বলতে বলতে ছোটবাবু তার গায়ে হাত দিতে যেতেই সে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ছোটবাবু থমকে তার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর অনুনয়ের সুরে বললেন, 'ওরকম করছ কেন ? তোমার বাবাকে তো বলেছি, আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

'বিয়ে করবেন ?' লক্ষ্মী ব্যঙ্গ করে উঠল, 'তাহলে আর দেরি করে লাভ কী ? আমি লোকজন ডাকি। বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর আর এখানে আসতেও হবে না। আমি আপনার বাড়িতে গিয়েই থাকব।' সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে সত্যি সত্যি জোরে হাঁক দিল, 'হরেনদা ! এদিকে আয় তো।'

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে সাইকেলে চাপলেন। কিন্তু লক্ষ্মীরও আর ও থানায় থাকা হল না। সদরে চলে আসতে হল।

৭

থানায় থাকতেই নিখিলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নিখিল ডি এ পি-র কনস্টেবল। পুজোর সময় ঐ থানায় ডিউটি পড়েছিল। সেই ডিউটির সময়ই আলাপ। সদরে এসে ঘনিষ্ঠতা হল। এখন দুজনেরই পুলিস অফিসে ডিউটি। নিখিল এস পি সাহেবের আর্দালি। লক্ষ্মী অফিসের। ফাইলপত্র এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে যায়। অফিসের লোকদের জলটল এনে দেয়। আর একটু অবসর পেলেই নিখিলের কাছে হাজির হয়। নিখিল লক্ষ্মীর মতই এক সাধারণ ঘরের ছেলে। কান্দির একটা গ্রামে তার বাড়ি। লক্ষ্মীর মনে হয় নিখিল তার সমস্যাগুলো বোঝে। তাই নিখিলকে তার ভাল লাগে। নিখিলকে একবার তাদের বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিল। নিখিলও তাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিল। লক্ষ্মী যায়নি। পরে যাবে বলেছিল। তারপর থেকে নিখিল প্রায়ই ওদের বাড়ি যাওয়ার জন্য বলে। আজও

বলছিল, 'চল্ না। রবিবার গিয়ে সোমবারই ফিরে আসব।'

'আমাকে নিয়ে গিয়ে মাকে কী বলবি ?'

'বলব, তোমার ভাবী বধূমাতাকে নিয়ে এসেছি, দেখ।'

লক্ষ্মী প্রথমটা তার কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু তার চমক ভেঙে দিয়ে নিখিল আবার বলল, 'আমি মাকে তোর কথা বলেছিলাম। মা রাজি হয়েছে। তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। একদিন চল্।' লক্ষ্মী আর কিছু বলতে পারেনি। নিখিলের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েছিল।

এমন সময়ে অ্যাডিশনালের বাসায় ডিউটিটা না দিলেই কি চলছিল না। প্রথম দেখেই লোকটাকে লক্ষ্মীর ভাল লাগেনি। এমন করে তাকায় যেন চোখ দুটো কাপড় ভেদ করে শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ও লোকের বাসায় সে ডিউটি করবে না। দরকার হলে সে, চাকরি ছেড়ে দেবে। কিন্তু নিখিলকে হারাতে পারবে না। নিখিলের সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে হবে। আর তাছাড়া তার জীবনের সব কথাও নিখিলকে খুলে বলা দরকার। সে অনেকবার বলতে গেছে। কিন্তু নিখিল প্রতিবারই তাকে থামিয়ে দিয়েছে, 'আর বলতে হবে না। তোমার সব কথাই আমি জানি।' নিখিল সত্যিই কতটুকু জানে তা লক্ষ্মী জানে না। তার মনে হয়, একবার খোলাখুলি আলোচনা হওয়া দরকার। সে নীল শাড়িটা পরে বেরিয়ে পড়ল।

৮

নিখিল ব্যারাকের সামনে একটা রিকশ থেকে নামছিল। লক্ষ্মী গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল। নিখিল তার দিকে ফিরেও তাকাল না। লক্ষ্মী আত্মীয়তার সুরে বলল, 'বাবুর খুব যে দেমাক হয়েছে দেখছি!' নিখিল কোনও উত্তর দিল না। শুধু বিরক্তি ভরে একবার লক্ষ্মীর দিকে তাকাল।

লক্ষ্মী বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাডিশনালের বাসায় আমাকে ডিউটি করতে বলছে। করব ?'

'করবি কি না সেটা তোর ব্যাপার। আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন ?'

'আমার ব্যাপার মানেই তোর ব্যাপার। আমরা দুজন তো এখন আলাদা নই।'

'না, তোর সঙ্গে আমার কোনওরকম সম্পর্ক নেই। বিমানের কাছে তোর সম্পর্কে যা শুনলাম তাতে কোনওরকম সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়।'

লক্ষ্মীর মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। সে সব কিছু বলতেই চেয়েছিল। নিখিলই শোনেনি। আর আজ উল্টো অপবাদ। বিমান কী বলেছে তার সত্যাসত্যও তার কাছে যাচাই করতেও চায় না। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তবুও ভাল যে তোর সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়ে যায়নি। আর কোনওদিন যেন নাও হয়। সে নিজের ব্যারাকের দিকে চলতে লাগল।

গেটের কাছে হাবিলদারের সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'অ্যাডিশনাল সাহেব আপনাকে তাঁর বাসায় ডিউটি দিতে বলছিলেন।'

'কবে থেকে যেতে হবে ?'

'বিমান যে বলছিল, আপনি যেতে চান না।'

'বিমানকে তাই বলেছিলাম। তবে এখন আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'তাহলে কাল থেকেই শুরু করুন।'

'ঠিক আছে।'

হাবিলদার চলে গেল। দরজাটা বন্ধ করে লক্ষ্মী লোহার খাটের ওপর গা এলিয়ে দিল।

শূন্য নীড়ে

১

ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুল-ভ্যান চলে গেলে মিনতি ঘরে এল। কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ অনুভব করল। গায়ের চাদরটা টেনে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী হয়েছে? এ রকম ঝিম মেরে পড়ে আছ কেন?'

আমি চুপ করে পড়ে থাকলাম।

মিনতি চেয়ারে বসে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল। সে দৃষ্টিতে আশঙ্কা আর ভালবাসা ভিড় করে এল।

আমার মায়া হল। যেমন আগের দিনে হত।

২

তখন আমার বাইশ বছর। বি. এ. পাস করে বেকার বসে আছি। বাবা ডেকে বললেন, 'নরেন এসেছিল। ওর বড় মেয়েকে পড়ানোর কথা বলছে।'

ইংরেজি পড়াতে হবে শুনে ঘাবড়ে গেলাম। বড় বেয়াড়া ভাষা। পড়া তবুও যায়। লিখতে গেলেই ভুল হয়।

কী করা যায়?

ইলেভেনের বই যোগাড় করে পড়তে লাগলাম।

নরেনকাকার বড় মেয়ে ইলেভেনে পড়ে। এ অঞ্চলে তার রূপের খ্যাতি আছে। হালকা গড়ন। কাঁচা সোনার বরণ। বয়সটাও কাঁচা। ষোলো কি সতের। যাকে বলে 'সুইট সিক্সটিন'। শুধুমাত্র ইংরেজির ভয়ে এ রকম একটি মেয়েকে পড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না।

রবিবার বিকেলে পরিপাটি করে জামা-কাপড় পরলাম। চুল আঁচড়ালাম। পকেটের রুমালে একটু সেন্টও মাখিয়ে নিলাম। লাজুক-লাজুক মুখ করে ওদের বৈঠকখানায় হাজির হলাম।

নরেনকাকা পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমার বড় মেয়ে, মিনতি'।

দেখলাম, মিনতি টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে। পরনে লালপাড় সিল্কের সাদা শাড়ি। কপালে লাল টুকটুকে টিপ। দুই গালের পাশে রেশমি কালো চুল।

মিনতি পেন সমেত ডান হাতটা টেবিলের ওপর দিয়ে বসে আছে। যেন কেউ সৌন্দর্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। ও সৌন্দর্যের পায়ে নিজেকে ফুলের মত ছড়িয়ে দিতে, ধূপের মত পুড়িয়ে ফুরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

'আর এ শিবপ্রসাদ! তোর ভবকাকার ছেলে। তোকে আজ থেকে পড়াবে।'

আমি হাসি-হাসি মুখ করে বোকার মত দাঁড়িয়ে ছিলাম। মিনতি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। বলল, 'বসুন।'

আমি বসলে সেও বসল। নরেনকাকা চলে গেলেন। পড়াতে লাগলাম।

যত দিন যেতে লাগল মিনতি আমার মনটা দখল করে নিতে লাগল।

সারাদিন পড়াতে যাওয়ার কথা ভাবি আর পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ওকে চেয়ে দেখি।

সেদিন চিঠি-লেখা অভ্যাস করাচ্ছি। ও লিখছে। আমি নিবিষ্ট মনে ওকে দেখছি। মনে হচ্ছে,

পৃথিবীতে কত সুন্দর জিনিস আছে। কিন্তু সব থেকে সুন্দর, যাকে ভালবাসি তার রক্তমাংসের মুখ।

আচ্ছা মিনতিরও কি আমাকে ভাল লাগে ?

মিনতি মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'কী দেখছেন ?'

'না, কিচ্ছুনা তো !'

'দেখছেন, আবার অস্বীকার করছেন।'

'কী করব ? তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে যে !'

'তাতে অত লজ্জা পাবার কী আছে ? আপনাকেও আমার ভাল লাগে ?'

আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

পরের দিন আমার পায়ের ওপর ওর পায়ের স্পর্শ অনুভব করলাম। ইচ্ছে হল, একটু চাপ দিয়ে দিই। কিন্তু ও যদি রাগ করে ? সাহস হল না। পা-টা সরিয়েও নিতে পারলাম না। সমস্ত অনুভূতি সে স্পর্শ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে বসে থাকলাম। মিনতিই একটা চাপ দিয়ে ওর পা-টা সরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে একটা দুষ্টুমিভরা হাসির রেশ খেলে গেল।

আমি সাহস পেয়ে বললাম, মিনতি তোমাকে একটা কথা বলছিলাম।'

'এখানে নয়—স্কুল থেকে ফেরার পথে আসুন।'

বিকেলে ফুলবাড়ি গিয়ে জনকল্যাণ ক্লাবের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিনতি স্কুল থেকে বের হলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকলাম। নদীর ধারের ফাঁকা রাস্তায় পড়তেই মিনতি বলল, 'কী বলবেন বলছিলেন। এবার বলুন।'

'মিনতি, আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না।'

'তা আমি কী করব ?'

'আমাকে বিয়ে কর।'

'তারপর ?'

'তারপর আবার কী ?'

'শুধু হাওয়া খেয়ে চলবে ? না রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে ? আগে সেটার কথা ভাবুন।'

৩

ভাবতে লাগলাম।

কী করা যায় ! এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছি। কয়েকটা ইণ্টারভিউও দিয়েছি। চাকরি হয়নি। বেকার-লোনের দরখাস্ত করেছি মঞ্জুর হয়নি। বাবার হাঁড়ি গড়ার ব্যবসা ছিল। সস্তায় অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি বাজারে আসায় মাটির হাঁড়ি আর কেউ কেনে না।

তবে টালি কেনে।

আগে খড় দিয়ে লোকে ঘর ছাওয়াত। বন কেটে আবাদ করার ফলে খড় আর মেলে না। ঘাসের অভাব হওয়ায় ধানের বিচালিতেও টান পড়েছে। অথচ ঘরের চাল তো খালি থাকতে পারে না। তাই টালি বিক্রি হচ্ছে।

কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসে অচিনতলায় টালির কারখানা করেছে। হুড় হুড় করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক করলাম, টালির কারখানা করব।

বাবাকে বললাম। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল, আমি চাকরি করি। তাই জমি বিক্রি করেও পড়িয়েছিলেন।

চাকরি হয়নি। বেকার বসে আছি।

তবুও তো কিছু করব। বাবা রাজি হয়ে গেলেন। মার গয়নাগুলো ব্যাঙ্কে বন্ধক রেখে টাকা এনে দিলেন।

জামতলায় পাকা রাস্তার ধারের জমিটাতে একটা চালাঘর তুলে কলকাতায় গেলাম। দাসপুর থেকে টালির মেশিন এবং ডাইস কিনে ট্রান্সপোর্টে তুলে দিলাম।

অচিনতলার কারখানা থেকে একজন মিস্ত্রি চলে এল। কয়েক জন মুনিশ যোগাড় করলাম। কারখানা চালু হয়ে গেল।

মুনিশের দল গর্ত থেকে মাটি তোলে। মিস্ত্রি সে মাটি ভিজিয়ে কাদা করে। কাঠের ফ্রেমে চেপে বসায়। তার দিয়ে কেটে ডাইসে ঢোকায়। মেশিনের মধ্যে দিয়ে পাক দেয়। ডাইস থেকে টালি বের করে রোদে দেয়। মুনিশের দল তা শোকায়, রং করে ভাটাতে সাজায়। আগুন দিয়ে পোড়ায়। ভাটা ভেঙে পাঁজা করে রাখে।

সারাদিন ওদের সঙ্গে কাজ করি। খাটি, খাটাই। দ্বিগুণ কাজ হয়। গরুর গাড়ি নিয়ে টালি কিনতে আসে। মুনিশরা তুলে দেয়। আমি গুনে সাজিয়ে দিই। টাকা গুনে নিই।

সব খরচ বাদ দিয়েও লাভ থাকে। বাপ-ঠাকুরদার কুমোরের পেশাটা এখনও লাভজনক আছে দেখে বাবা খুশি হলেন।

মিনতিও খুশি হয়েছিল। কিন্তু ক'দিন থেকে যেন কীরকম গুম মেরে আছে। পড়াতে যেতে দেরি হয় বলে কি রাগ করেছে ? কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি গেলাম। কিন্তু ও এখনও পড়ার টেবিলেই আসেনি।

অপেক্ষা করছিলাম।

মিনতির ছোট বোন ছায়া এসে চুপি চুপি বলল, 'জান শিবুদা ? দিদির বিয়ে !'

আমি মজা পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই নাকি ? কার সঙ্গে ?'

'গোপাল পালের সঙ্গে।'

'গোপালটা কে ?'

'ওমা তুমি জান না ? আমাদের স্কুলের নতুন মাস্টার।'

মুহূর্তে মজা উড়ে গেল। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। মিনতি আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'মিনতি, তুমি নাকি গোপাল মাস্টারকে বিয়ে করছ ?'

'হ্যাঁ আপনার দ্বারা কিছু না হলে তা-ই করতে হবে !'

'আমি কী করব ? তোমার বাবার কাছে প্রস্তাব দেব ?'

'তাতে কোন লাভ হবে না। আমি নিজেই বলেছিলাম, বাবা রাজি হননি। তাঁর কাছে গোপাল অনেক বেশি যোগ্য পাত্র।'

'তাহলে কী করব ?'

'যা করবার, তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

কী করব ? মিনতির সঙ্গে বহরমপুর গেলাম। কারখানার মিস্ত্রি শমসেরকে বাবা সাজিয়ে মিনতির সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়ে করলাম।

খুব ইচ্ছে ছিল অনুষ্ঠান করে বিয়ে করব। মুকুট মাথায় বেনারসী পরা মিনতির হাতে হাত দিয়ে মন্ত্র পড়ব 'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।' তা আর হল না। শুধু রেজিস্ট্রারের সামনে বললাম 'মিনতি পালকে আমার স্ত্রী রূপে গ্রহণ করলাম।'

৪

আমি গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কী করে রটে গেল। বাবা এত দুঃখ পেলেন যে

অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর উঠলেন না। মা আগেই চলে গিয়েছিলেন। এবার বাবাও গেলেন।

শ্রাদ্ধের সময় মিনতি বাড়িতে এল। আর গেল না। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষাটাও দিল না। আমার ইচ্ছে ছিল, ও পরীক্ষাটা দিক। কিন্তু মিনতি যখন দিতে চাইল না, আমি আর জোর করিনি। তার সঙ্গে কিছুদিন থাকার পর তাকে ছেড়ে থাকার কথা আর ভাবতেই পারছিলাম না।

তখন আমার তেইশ-চব্বিশ। মিনতির সতের-আঠার। শরীর-মন কানায় কানায় পূর্ণ। সে মদির সুধায় আমি আকণ্ঠ ডুবে আছি। জীবনটা মধুময় মনে হচ্ছে।

সারাদিন কাজ করি। দিনের শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যখন দেখি, মিনতি আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তখন সেটাকে সুখের নীড় মনে হয়। মিনতিকে বুকের মধ্যে নিয়ে মনে হয়, আমি পৃথিবীর সব থেকে সুখী লোক।

বছর খানেকের মধ্যেই মিনতির কোলে আসে আমাদের প্রথম সন্তান, নীতা।

আমি বাড়িটার দিকে নজর দিই। টালির ঘরখানা ভেঙে দু-কামরার একটা দোতলা ঘর করি। প্রাচীরের পাশে সুপারি আর নারিকেলের গাছ লাগাই। মাঝে ফুলের বাগান।

হাতের জমা টাকা ফুরিয়ে যায়। সেটাকে পুষিয়ে নেওয়ার জন্য বেশি করে কাজ করি। যাতে মুনিশ কম লাগে আর লাভও বেশি হয়।

লাভ বেশি হল। শরীরে সহ্য হল না। সব সময় ম্যাজম্যাজ করতে লাগল। একদিন গাড়িতে টালি সাজানোর সময় ডানদিকের তলপেটটা ব্যথা করে উঠল।

মিনতি বলল, 'ডাক্তার দেখাও।'

ফুলবাড়ির মোমিন ডাক্তার দেখে বলল, অ্যাপেন্ডিসাইটিস। অপারেশন করতে হবে।

পাত্তা দিলাম না। ভাবলাম, ঠিক মত খাওয়া-দাওয়া করলেই সেরে যাবে। কিন্তু সারল না। শরীরটা দুর্বল হয়ে গেল। সেদিন তলপেটটা এমন টনটন করতে লাগল যে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। মিনতি কেঁদে কেটে একাকার করল।

শঙ্কর এসে বলল, 'শিবুদা, অপারেশনটা করিয়ে নিন।'

শঙ্কর পাড়ার বিনয় পালের ছেলে। মাধ্যমিক পাস। মোড়ের মাথায় একটা মনিহারি দোকান করেছে। বড় পরোপকারী ছেলে। বিপদে-আপদে এক ডাকে হাজির।

শঙ্করের কথা আমি ফেলতে পারলাম না।

'কিন্তু এদের কী হবে শঙ্কর ? আমি না থাকলে যে এরা একদম একা।'

'ওসব আপনাকে ভাবতে হবে না। আমরা আছি, দেখব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ভর্তি হন।'

আর কথা চলে না। বহরমপুর এসে নিরাময় নার্সিংহোমে ভর্তি হলাম।

কোন দেখাশোনা নেই।

কষাইরা যেমন ছাগল-ভেড়া কাটে ডাক্তার কুণ্ডু তেমনি করে আমার পেটটা কেটে দিল। ঘা শুকায় না। নতুন পেশেন্ট আসতে গুচ্ছের ওষুধ লিখে দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিল।

বাড়িতে এসে পেটটা ফুলে ঢাকের মত হয়ে গেল। নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না। গাড়ি ভাড়া করে নার্সিং হোমে এলাম। দুদিন দেখে ডাক্তার কুণ্ডু বলল, 'এখানে হবে না। কলকাতায় পি জি-তে যেতে হবে।'

কলকাতায় কী করে যাই ?

মিনতির সঙ্গে শঙ্কর এল। রিক্সায় করে এনে ট্রেনে তুলল। শিয়ালদায় নেমে ট্যাক্সি করে পি জি-তে নিয়ে গেল।

সিট পাওয়া গেল না।

আউটডোরের ডাক্তার বলল, 'নিউল্যান্ড নার্সিং হোমে নিয়ে যান।'

আবার ট্যাক্সিতে তুলল। নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিল।

ডাক্তার সেন গুচ্ছের টেস্ট করে কুণ্ডুব মুণ্ডুপাত করতে লাগল। 'ব্লাড সুগার আছে কিনা পরীক্ষা না করেই অপারেশান করে দিলি! ডাক্তার না ফাক্তার?'

কে উত্তর দেবে? আমি চুপ করে থাকলাম। বুঝলাম, অপারেশান করা আগে কতকগুলো টেস্ট করা উচিত ছিল। ডাক্তার কুণ্ডু তা করেনি। তার জন্য এ ভোগান্তি।

ভোগান্তি মিনতিদেরও কম হল না। নার্সিং হোম থেকে বের হতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন এসে মিনতি বলল, 'ভোগান্তির কথা আর বোলো না। কোথাও রুম পাওয়া যায় না। অনেক ঘোরাঘুরি করে শিয়ালদার কাছে একটা হোটেলে একটা সিঙ্গল বেড রুম পাওয়া গেল। শঙ্করকে মেঝেতেই শুতে হল।'

আমার মন কৃতজ্ঞতায ভবে গেল। মনে হল, শঙ্করের ঋণ শোধ করা যায় না।

৫

মাসখানেক পবে ছাড়া পেলাম।

পেটের ফোলা কমে গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হলাম না। কাজ করার ক্ষমতা রইল না। রাতে মিনতির আহ্বানেও সাড়া দিতে পারি নে।

কারখানায় যাই। কাজকর্ম দেখাশোনা করি। নিজে কিছু করতে পারি নে। তাড়াও লাগাতে পারি নে। একটু চলাফেরা করলেই হাঁসফাঁস করি।

মাঝে মাঝে শঙ্কর এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যায।

আজকাল একটু বেশিই আসে। চা খায়। আমার স্বাস্থ্যের খবর নেয়। নীতাকে আদর করে। তবে মিনতির সঙ্গে গল্পেই যেন তার বেশি রুচি। একবার শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না।

মিনতিরও শঙ্কর আসলে আর কোন দিকে খেয়াল থাকে না। খুশিতে গলে পড়ে। হাসি আর ধরে না।

শঙ্করের সঙ্গে এতটা মাখামাখি আমার ভাল লাগে না। একদিন বলেছিলাম। মিনতি তো শুনে একদম গুম। খানিকক্ষণ পরে বোমার মত ফেটে পড়ল, 'যে ছেলেটা তার কাজকর্ম কামাই করে তোমাকে যমের মুখ থেকে টেনে আনল, তার সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা? তোমার মন এত ছোট?

আমি কোন উত্তর দিতে পারিনি।

তবে শঙ্কর কিছুদিন আর আসত না। মিনতি-গুম হয়ে থাকত। পাম্প করা বলের মত একটু ছোঁয়া লাগলেই লাফিয়ে উঠত। মেয়েকে নিয়ে আলাদা বিছানায় শুত।

আমি আপত্তি করিনি।

সপ্তাহখানেক পরে শঙ্কর আবার আসতে লাগল। মিনতিও স্বাভাবিক হল। আমার মনে হল, মিনতি শঙ্করের সাহচর্যেই ভাল থাকছে।

মিনতি সুস্থ-সবল আছে। সে একজন সুস্থ-সবল মানুষের সঙ্গ চাইছে। তাকে আগলে থাকার আমার কী অধিকার আছে?

অস্বস্তি এড়াতে আমি অধিকাংশ সময় কারখানাতে কাটাতে লাগলাম।

টুলের ওপব বসে ছিলাম। টালি রোদে দিয়ে শমসের এসে সামনে দাঁড়াল। বিড়িতে কষে একটা টান দিয়ে বলল, 'শিবুদা, কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বুলি!'

'তোমার কথায় মনে করার কী আছে? বল!'

চকিতে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে শমসের বলল, 'শঙ্করডা যখুন-তখুন বাড়িতে আসে;

লোকে ভাল বুলেনা !'

বুকের মধ্যেকার চাপা আগুনটা ধিক ধিক করে জ্বলে উঠল। আমি উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালাম। শমসের অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকল। মনে হল, শমসের আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই বলেছে। আরও অনেকেই নিশ্চয় বলছে। নিজেকে অত্যন্ত হতভাগ্য মনে হল। কারখানায় থাকতে সঙ্কোচ হল। বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

কয়েকবার কড়া নাড়াতে শঙ্কর এসে দরজা খুলল। তার সুন্দর, সুস্থ, সতেজ শরীরটা দেখে আমার বুকের ভিতরটা জ্বলতে লাগল। মনে হল, শঙ্কর আমার থেকে কত সুন্দর। মিনতি সেই জন্যই ওর দিকে ঝুঁকছে।

দুয়েকটা মামুলি কথা বলে শঙ্কর চলে গেল। আমি কোন মতে দরজাটা বন্ধ করে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। উৎকণ্ঠিত মিনতি এসে কপালে হাত দিল, 'কী হয়েছে তোমার ? শরীর খারাপ করছে ? শুয়ে পড়লে কেন ?' কোন উত্তর না পেয়ে তার প্রশ্নবাণ বেড়েই চলল, 'কথা বলছ না কেন ?'—

'কথা বলার কিছু নেই। আমাকে বিরক্ত কোরো না।'

'কী করেছি তোমার ? অমন শত্রুর মত ব্যবহার কর ?'

'তুমি কিচ্ছু করনি। এখন দয়া করে একটু একা থাকতে দাও।'

'যা খুশি তাই কর। আমার কী ?'

মিনতি গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

৬

এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। ফুলবাড়িও খুব কাছে। বহরমপুরে বাড়ি খুঁজতে লাগলাম। বাগানপাড়ায় বাড়িটা ঠিক হতেই মিনতিকে বললাম, 'এখানে থাকলে নীতার পড়াশোনা হবে না। আমরা বহরমপুর চলে যাব।'

'কেন এখানে থেকে তোমার পড়াশোনা হয়নি ? নীতার পড়াশোনার জন্য বহরমপুর যেতে হবে ?'

'এখানে থেকে আমার টালি তৈরি করার মত পড়াশোনা হয়েছে। তাছাড়া আমি ছেলে। আর নীতা মেয়ে। এখানে থাকলে ওর পড়াশোনা হবে না।'

'তোমার কারখানার কী হবে ?'

'রাতে কাউকে পাহারা রাখব। বাসে যাতায়াত করে কারখানা চালাব।'

তাই করছিলাম।

একটু শান্তিতে ছিলাম। সেদিন পাঁজার ওপার থেকে একটা ফিসফাস কানে এসে সব গণ্ডগোল করে দিল। দুজন মুনিশ কথা বলছে।

'শিবুদারা বহরমপুর ক্যানে গ্যালো জানিস ?'

'তা আর জানব না ? যার লাগ্যা গ্যালো তা আর হল না। শিবুদা এখ্যানে আসে। শঙ্কর ওখ্যানে যায়। উয়ার সুবিদ্যায় হযেচে।'

কী বুলছিস ?

'খোজ লিয়ে দ্যাক।'

খোঁজ নেওয়ার জন্য তখনই বাসে উঠলাম। বাস থেকে নেমে রিক্সা। রিক্সা থেকে নেমে দেখলাম, শঙ্কর আমার বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। বুঝলাম, মিনতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ছাড়া কোন উপায় নেই। আমি মনস্থির করে ফেললাম।

বাড়িতে ঢুকতে নীতা এসে গলা জড়িয়ে ধরল। তাকে কোলে নিয়ে চোখে জল এসে গেল। কত কোমল-নিরপরাধ এই মেয়েটা। বিচ্ছেদ হলে এ হয় তার মাকে হারাবে—নয়ত বাবাকে। সব হিসাব গোলমাল হয়ে গেল।

শ্বশুর বাড়িতে খবর পাঠালাম। যদি ওরা এসে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিনতিকে নিরস্ত করতে পারে।

পরের দিন শাশুড়ি এলেন। মিনতিকে কী বোঝালেন জানি না। ও ঘর থেকে তার ঝঙ্কার কানে এল, 'ভাত-কাপড়ই সব ? আর কিছু লাগে না ? তার সে ক্ষমতা আছে ? তুমি পার, একটা লাশ নিয়ে থাক। আমি পারব না। বেশি ভ্যানতারা কষলে বেরিয়ে চলে যাব।'

আচ্ছা যাকে ভালবাসা যায় তার সম্বন্ধে এ রকম কথা বলা যায় ? মিনতি কী কোনদিনও আমাকে ভালবাসত ? না হলে গোপাল মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে না করে আমার সঙ্গে রেজিস্ট্রি করল কেন ?

মিনতির দিকে তাকালাম। এখনও চেযারে বসে আছে। বিকেলের সোনা রোদ খোলা জানালা-পথে এসে তাকে জড়িয়ে আছে। পরনে সেই লালপাড় সাদা সিল্কের শাড়ি। সেই ট্রেসকো মোজাইক সেন্টের সুগন্ধ। শুধু কপালে টিপের বদলে সিথিতে সিঁদূর। শাড়ির নীচে নগ্ন দুটি পা। ইচ্ছে করে, ও দুটি সুন্দর পায়ে গিয়ে মুখ ঘষি।

আমাকে চমকে দিয়ে বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতে ছেলেমেয়েরা ঢুকল। নীতা এসে আমার কপালে হাত দিল। রাজীবটা মিনতির কোল ঘেঁষে দাঁড়াল।

রাজীবের বয়স প্রায় তিন। ওর মুখটা শঙ্করের মত হওয়ায় আমি একদম সহ্য করতে পারি নে। ও কি আমার আক্রোশটা বুঝতে পারে ? না হলে আমার কাছে ঘেঁষতে চায় না কেন ? বেচারা ! মুখটা কী করুণ।

ওর তো কোন দোষ নেই। আমি হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকলাম। ও এল না।

৭

সারা রাত আমার ঘুম এল না।

সকালে উঠে মনে হল, এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। মিনতি যা খুশি করুক। আমি আমার কাজ নিয়ে থাকব। কাজের মধ্যে সব কিছু ভুলে থাকব।

কারখানায় এলাম।

শমসের মেশিনে পাক দিয়ে টালি তৈরি করছে। আব সবাই ভাটা সাজাচ্ছে। অনেক দিন পর ভাটা সাজাতে গেলাম। কয়েকখানা টালি বসাতেই হাঁফ ধরে গেল। উঠে দাঁড়াতে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। ওরা ভ্যানে-করে আমাকে বাড়িতে নিয়ে এল। দোতলার একটা ঘর ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করল।

একটা পাটি বিছিয়ে মেঝের ওপরই শুয়ে পড়লাম।

সালাম বহরমপুরে খবর দিতে গেল। সমীরকে নিয়ে শমসের এখানেই থেকে গেল।

সুপারি গাছের ফাঁক দিয়ে শুক্লা চর্তুদশীর চাঁদ উঠল।

চাঁদের রূপালি আলোয় সারা বাড়ি ভেসে যাচ্ছে। মনে পড়ল, এ রকম রাতে আমরা ছাদে উঠতাম। চাঁদের আলো গায়ে মাখতাম। নীচের বাগান থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসত।

সে বাগান আজ শ্রী-হীন। কী একটা পাখি সেখানে পাখা ঝটপট করছে। বুঝি মিনতি শঙ্করের সঙ্গে গল্প করছে।

এখানে আমি একা—শূন্য নীড়ে—বিবর্ণ জোছনার মাঝে।

বিচ্ছেদ

ঢং-ঢং করে দুটো ঘণ্টা পড়ল। মৌখালি হাই স্কুলের ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ হল। হুদা ক্লাস থেকে বের হয়ে হেড মাস্টারের ঘরের সামনে আসতেই স্কুলের পিয়ন আনন্দ একটা চিঠি বাড়িয়ে ধরে বলল, "মাস্টারমশাই, আপনার চিঠি।"

ঠিকানার লেখাটা হুদার খুব চেনা মনে হল। কিন্তু ঠিক কার তা ধরতে পারল না। পরিচিত গানের সুর শুনে যখন কিছুতেই মনে পড়ে না কোন গানটা বাজছে তখন বুকের ভিতরটা যেমন আঁকু-পাঁকু করে হুদারবুকের ভিতরটা তেমনি আঁকু-পাকু করতে লাগল। রোল-কলের খাতাটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে ধরে সে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল।

কে পাঠিয়েছে তা খামের ওপরে লেখা নেই। খাতাটা বগলদাবা করে সে খামটা ছিঁড়ে ফেলল। চিঠির নিচে নামটার ওপর চোখ পড়তেই তার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

স্টাফ রুমে না গিয়ে হুদা তাড়াতাড়ি হেড মাস্টারের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হেড মাস্টার ডি আই অফিসে গেছেন বলে ঘরটা ফাঁকা ছিল। সেই ফাঁকা ঘরে বসে হুদা চুপিসারে চিঠিটা পড়তে শুরু করল ; 'শামসুল,

অভিমান করে চলে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি নিশ্চয় আমাকে নিতে আসবে। কিন্তু সে আশা বৃথা। তুমি একা একা বোধহয় সুখেই আছ। কিন্তু আমার একা একা একদম ভাল লাগছে না। তাই ঠিক করেছি তোমার কাছে চলে যাব। আগামী চৌদ্দ তারিখ আমি আসছি। পারলে ঐদিন তুমি বাড়িতে থেকো। ইতি

আলেয়া।"

আলেয়া হুদা ওরফে শামসুল হুদার স্ত্রী। বছর খানেক হল হুদার সঙ্গে ঝগড়া করে বর্ধমানে বাবার বাড়ি চলে গেছে। তারপর থেকে তাদের কোনরকম যোগাযোগ নেই। তিক্ত-বিরক্ত হুদা আর তার কোনরকম খোঁজখবর নেয়নি। তবুও আলেয়া নিজে থেকে আবার তার কাছে আসছে। হুদার মনে হয়, সে আলেয়াকে ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেনি।

আলেয়া চৌদ্দ তারিখে আসবে। হুদা দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল। আজ তের তারিখ। অর্থাৎ আলেয়া আগামিকালই আসছে। কতদিন পরে সে আলেয়াকে কাছে পাবে! হুদার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল। চিঠিটা বারবার পড়ল। তারিখের জায়গাটা অনেকবার দেখল। হ্যাঁ, আগামীকাল চৌদ্দ তারিখই বটে। সে চিঠিটা পকেটে পুরে স্টাফ রুমের দিকে রওনা হল।

মৌচাকে ঢিল পড়লে যেমন মৌমাছিদের মধ্যে তাৎক্ষণিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়, হুদাকে ঢুকতে দেখে মাস্টারদের মধ্যে সেইরকম তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। কে কিভাবে শুরু করবে সেই কথাই ভাবছিল। এমন সময় ঘোষালবাবু ঘরে ঢুকল। টেবিলের ওপর ডাস্টারটা রেখে, হুদার পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন, হাজিসাহেব ?" নীরেনবাবু সুযোগ বুঝে একটা বাণ ছুড়ে দিল, "আহা, ওকে আবার জ্বালাতন করছিস কেন ? এমনিতেই বেচারা বিরহ-যন্ত্রণায়...।" ঘোষালবাবু তার স্বভাবসুলভ ফিক করে হেসে জিজ্ঞেস করল, "কেন, কেন ?" হুদা জানে, এক্ষুণি ঝাঁক ঝাঁক মন্তব্য তীরের ফলার মত এসে তার ওপর পড়তে থাকবে। সে নীরেনবাবুর কথার খোঁচা গায়ে না মেখে, খবরের কাগজটা তুলে পড়ার

ভান করতে লাগল।

হুদা এই স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক, কিন্তু বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুনের থেকে ধর্মের আচার-আচরণের প্রতিই তার আসক্তি বেশি। সে নামাজ পড়ে। রোজা করে। গত বছর হজ করেছে। কিছুদিন হল দাড়ি রেখেছে। সম্প্রতি স্কুলেও টুপি পরে আসছে। তারপর আছে তবলিক জামাত। মুসলমান দেখলেই বলছে, "নামাজ পড়ো, রোজা করো।" বন্ধুদের মতে এটা বাড়াবাড়ি। কেউ কেউ বলে, "বৌ পালিয়েছে, তাই ভেকধারী।" যারা একটু বেশি বিরক্ত তারা বলে, "নিজের বৌকে বাগ মানাতে পারে না, অন্যকে যায় ধর্ম শেখাতে।" ঘুটু ভাই আবার আরও এক ধাপ এগিয়ে। সে বলে, "হাজি না পাজি। যত সব পাজি মক্কা গিয়ে হাজি। ভাল মানুষ হজে যাবে কোন্ দুঃখে ? বৌ না পালালে হুদা হজে যেত ?"

শুনে হুদার গা জ্বালা করে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। সে জানে সবাই ঘুটু ভাইয়ের দিকে। তার পক্ষে সবেধন নীলমণি, নামাবলী পরা নারানবাবু। সে একা ক'জনের সঙ্গে তর্ক করবে ?

একথা ঠিক যে, আলেয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পর ক্ষত-বিক্ষত মনটাকে একটু শান্ত করার জন্যই সে ধর্মকর্মে প্রাণমন সঁপে দিয়েছিল। কিন্তু শান্তি সে পাচ্ছে কৈ ? সবসময় মনটা মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করছে। সেখানে সুখ-শান্তির লেশমাত্র নেই। এই যে আলেয়ার চিঠিটা পেয়ে বুকের মধ্যে একটা সুখের অনুভূতি বয়ে গেল, ধর্মকর্ম এক মুহূর্তের তরেও তা দিতে পেরেছে ? পারেনি। অর্থাৎ শান্তি পেতে হলে তাকে আলেয়ার সঙ্গে ভাব করেই পেতে হবে। ভাব করে থাকতে হবে। সে তো ভাব করেই থাকতে চায়। কিন্তু পারে না। আলেয়ার সঙ্গে তার এত বেশি ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে যে, বারবার তাল কেটে যায়।

হুদা জানত, আলেয়া অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস। কিন্তু প্রথম রাতেই জানতে পারল, সে কোনরকমে অনার্স পাস করেছে। অভিযোগ করতে গিয়ে উল্টো বিপত্তি ! আলেয়া ঘাড় বাঁকা করে বলে উঠল, "মিথ্যা কথা বলতে আমাদের বয়েই গেছে। বরং তোমরাই ঘটককে মিথ্যা করে বলেছ, তুমি এম এস-সি-তে ফার্স্ট ক্লাস। কলেজে চাকরি পেতে যে ক'দিন দেরি সে ক'দিনই স্কুলে আছ। কিন্তু তুমি ভাল করেই জান যে, তোমার যা রেজাল্ট তাতে কলেজের চাকরি কোনদিনই পাবে না।" হুদা বুঝতে পারল, ঘটকের অতি উৎসাহের ফলেই এমনটা হয়েছে। কিন্তু আলেয়াকে বোঝাতে পারল না। প্রথম রাতেই একে অপরের কাছে ছোট হয়ে গেল।

ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করে চারটে ঘণ্টা পড়ল। হুদা তাড়াতাড়ি করে নাইনের ক্লাসটা নিতে গেল। নমো নমো করে ক্লাসটা শেষ করেই স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ল। হেড মাস্টার নেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারের কাছে ছুটি চাইতে গেলে সাত-সতের ধানাই-পানাই করবে। দেরি হয়ে যাবে। সে আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়। কাল সে কামাই-ই করবে। সে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল।

গোলোকের দোকানের কাছে আসতেই চোখে পডল, কেয়া বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে। কেয়া তার প্রাক্তন ছাত্র পলকের দিদি, পলক তার কাছে প্রাইভেটে পড়তে আসত। কেয়া আসত ভাইয়ের খোঁজ নিতে। ক্রমে সে হুদারও খোঁজ নিতে শুরু করল। তখন হুদাদের বহরমপুরের বাড়িটা সবে শেষ হয়েছে। হুদা সে বাড়িতে একাই থাকত। কেয়া সেখানেও যেত। হুদাও তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। শেষে এমন হল যে উভয়ে উভয়কে বিয়ে করবে ঠিক করল। কিন্তু বাদ সাধল ধর্ম আর বংশ মর্যাদা। কেয়ার বাবারা এ অঞ্চলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বনেদি পরিবার। এ বিয়ে হওয়া মানে তাদের মুখে চুনকালি পড়া। তারা কেয়াকে

ঘরে পুরে ঘোষণা করল হুদাকে পাড়ায় দেখতে পেলেই গুলি করে মারা হবে।

এক সময় তারা এ অঞ্চলের জমিদার ছিল। এখন জমিদারি নেই। কিন্তু অনেক জমি আছে। আর সে জমি রক্ষার জন্য অনেক পোষা গুণ্ডাও আছে। তারা পারে না এমন কাজ নেই। হুদা প্রাণের মায়ায় কেয়ার আশা ত্যাগ করল। কিন্তু কেয়া তাকে অত সহজে ছাড়ল না। বিয়ের পর একদিন হুদার বহরমপুরের বাড়িতে হাজির হল। কথায় কথায় আলেয়া তার পরিচয় জানতে চাইলে ভুরুর ধনু বাঁকিয়ে বলল, "কেন, হুদা তোমাকে আমার কথা কিছু বলেনি ?" যেন না বলাটা খুব অন্যায় হয়েছে। আলেয়ার চোখের ভুরু কুঁচকে উঠল। কেয়া বিজয়িনীর হাসি হেসে বিদায় নিল। তারপর থেকে কেয়া প্রসঙ্গ নিয়ে আলেয়ার সঙ্গে প্রায়ই অশান্তি হতে লাগল। সেই কেয়া বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে। হুদার ভারি অস্বস্তি হল। অস্বস্তিতে আনমনে গোলোকের দোকানে ঢুকে পড়ল।

গোলোক চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "মাস্টারমশায়কে কি দেব বলুন ?" হুদা কি বলবে ? সে কিছু খাবার জন্য ঢোকেনি। কিন্তু মিষ্টির দোকানে ঢোকার আর কি কারণ থাকতে পারে ? আমতা আমতা করে বলল, "দুটো রাজভোগ দিন।"

ততক্ষণে একটা বাস এসে গেছে। রাজভোগ গলাধঃকরণ করে বাইরে এসে হুদা দেখল, কেয়া চলে গেছে। সে স্বস্তি পেল। বাস স্টপে খালেকের চায়ের দোকানের বেঞ্চিটার ওপর বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরের বাস এসে গেল। পিছনের দিকে একটা সিটও পেল।

বাস চলতে লাগল। ঝিরঝিরে বাতাসের ঝাপ্টা এসে চোখেমুখে লাগতে থাকল। বিকেলের সোনা রোদ পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে থাকল। মানসচক্ষে আলেয়ার মায়াবী মুখটা ভেসে উঠল। কাল আলেয়া আসবে। হুদার বুকটা ভাল লাগায় ভরে উঠল।

বহরমপুরে বাস থেকে নেমেই সোজা কাপড়ের দোকানে গেল। আলেয়া ফুল আর লতাপাতা আঁকা কাপড় খুব পছন্দ করে। ফুলকাটা বিছানার চাদর আব লতাপাতা আঁকা জানালা-দরজার পর্দা কিনল। 'রানী' রঙের একটা সিল্কের শাড়ি এবং ম্যাচিং ব্লাউজও নিল। ফেরার পথে লন্ড্রি থেকে ধোয়া জামা কাপড়গুলো নিয়ে নিল। বাড়িতে এসে তার প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনতে লাগল।

রাতটা কিছুতেই কাটতে চায় না। সকালে উঠেই ঘরদোর পরিস্কার করার জন্য কাজের লোকটিকে তটস্থ করে তুলল। নিজে বিছানায় নতুন চাদর বিছাল। দরজা জানালায় নতুন পর্দা লাগাল। স্নান করে ধোয়া পাজামা-পাঞ্জাবি পরল। আগরবাতি জ্বালাল। তারপর পথ চেয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হল, ঘড়ির কাঁটা অত্যন্ত আস্তে আস্তে চলছে। তাই তার আসার সময় এখনও হচ্ছে না।

হুদা মানসচক্ষে দেখতে পেল, আলেয়া চামড়ার ব্যাগটা হাতে করে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। দরজা-জানালার পর্দা আর বিছানার চাদর তার খুব পছন্দ হয়েছে, সিল্কের শাড়িটা পেয়ে তো খুশি আর ধরে না। সে হুদাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা দিয়েছে। হঠাৎ করে দরজার বেলটা বেজে উঠল। বোধহয় আলেয়া সত্যি সত্যি এসে গেল। ছুটে এসে হুদা দরজা খুলল। খবরের কাগজের হকারটা কাগজের দাম নিতে এসেছে। হুদা ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে এগারটা বাজে। বর্ধমান থেকে প্রথম বাস সাতটায়। সেটা বারোটার আগে পৌঁছায় না। অর্থাৎ এখনও আলেয়ার আসার সময় হয়নি। কাগজের দাম দিয়ে সে দরজা বন্ধ করল। ভাবতে লাগল, এবার এলে সে কিছুতেই আলেয়ার সঙ্গে ঝগড়া করবে না। বলবে, "আমি তোমাকে ছেড়ে আর থাকতে পারব না।" আবেগে তার বুকটা বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তক্ষুণি বেলটা বেজে উঠল। এবার নিশ্চয় আলেয়া এসেছে। হুদা তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলল। দুই মেয়েকে

নিয়ে তার মা দাঁড়িয়ে আছে।

মা এবং বোনেদের দেখে হুদার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আলেয়ার সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের জন্য দাযী তারাও। শহরের বাড়িতে হুদা থাকলেও তাদের আসল বাড়ি গ্রামে। সেখানে তার মা-বাবা, ভাই-বোন সকলেই থাকে। মামা-কাকাদের বাড়িও গ্রামে। তাদের কেউ না কেউ সব সময় হুদাদের শহরের বাড়িতে থাকে। কখনও কখনও দল বেঁধে এসেও ওঠে। শহরের বাড়িতে আসলেও তাদের স্বভাব শহরের মত নয়। তারা গ্রাম্য টানে কথা বলে, যেখানে সেখানে নোংরা করে, ঘর-দোর অগোছালো করে এবং সব সময় কর্তৃত্ব চালায়। আলেয়া এসব একদম সহ্য করতে পারে না। তার বাবার বাড়ি শহরে। বাবা হাই স্কুলের হেড ক্লার্ক, দাদা কলেজের লেকচারার। সে বরাবর একটা ছোট-খাট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো, মার্জিত পরিবারে বড় হযেছে। হুদাকে নিয়ে তার সেরকমই একটা সংসারের স্বপ্ন ছিল। এই এলোমেলো, অগোছালো, হট্টমেলার সংসার তার একদম ভাল লাগে না। যখন দল বেঁধে গ্রামের লোকেরা এসে হাট বসায়, তার অসহ্য মনে হয়। এদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য হুদাকে ভিন্ন হতে বলে। হুদার বাবা তাতেও রাজি, কিন্তু মায়ের মত নেই। মায়ের মতের বিরুদ্ধে হুদা ভিন্ন হতে পারল না। আলেয়ারও মেজাজ বিগড়ে গেল। শেষে একদিন তাকে ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে গেল। বছরখানেক পরে আবার আসছে। আজকের দিনটাতেই তাদের না এলে কি চলছিল না ?

হুদার অসহ্য মনে হল। মা কাপড়ের পুঁটলিটা বারান্দায় রেখে বাথরুমে ঢুকল। বোনেরা নতুন চাদর বিছানো বিছানার ওপর বসে দরজা-জানালার পর্দার প্রশংসা করতে লাগল। হুদার আর সহ্য হল না। শার্ট-প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়ল। আলেয়ার সঙ্গে বাস স্ট্যান্ডেই দেখা করবে। আলেয়া রাজি হলে আজ আর বাড়িতে আসবে না। দুজনে কোনো হোটেলেই থেকে যাবে।

একটা রিক্সা নিয়ে সে লাল সড়ক ধরে বাস স্ট্যান্ডে রওনা হল। লালদীঘির পাড়ে এসে শঙ্কা হল, আলেয়া আবার স্কয়ার ফিল্ডের ওদিক দিয়ে চলে গেল না তো ? কিন্তু তার বাড়ি তো এদিক দিয়েই কাছে হয়। তাহলে ওদিক দিয়ে যাবে কেন ? সে আশ্বস্ত হল।

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছুতে সওয়া তিনটে বেজে গেল। বর্ধমানের আড়াইটের বাসটা ইতিমধ্যে চলে এসেছে। পরের বাস সেই চারটেয়। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটার পর একটা বাস আসে। আর হুদার ভিতরটা ধক করে ওঠে। এই বোধ হয় আলেযা এসে গেল। সে এগিয়ে যায়। দেখে, কোনো বাস কান্দি, কোনোটা রঘুনাথগঞ্জ, কোনোটা সাঁইথিয়া আবার কোনোটা কৃষ্ণনগর থেকে আসছে। কিন্তু বর্ধমানের বাস আর আসছে না। চারটে বাজল, সওয়া চারটে বাজল। বর্ধমানের বাস এল না। চাতক যেমন জলের জন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকে হুদা তেমনি বর্ধমানের বাসের জন্য পথের দিকে বারবার চাইতে লাগল। অবশেষে সাড়ে চারটের সময় বর্ধমানের বাস এল। হুদা তাড়াতাড়ি এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। কোনো মেয়েকে নামতে দেখলেই এগিয়ে গিযে ভাল করে দেখল। কিন্তু আলেয়াকে দেখতে পেল না। একে একে সবাই নেমে গেল। হতাশ হুদা তবুও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। খোঁজ নিয়ে জানল বর্ধমান থেকে পরের বাস সেই রাত আটটায়। সে ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ির দিকে রওনা হল।

দরজায় ঠেলা দিয়ে বাড়িতে ঢুকেই সে চমকে উঠল। দেখল, আলেয়া এসে গেছে। বাংলা পাঁচের মত মুখ করে বিছানায় বসে আছে। পাশেই বসে আছে ছোট বোনটা। আলেয়ার মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। হুদাও নিজের ওপর বিরক্ত না হয়ে পারল না। তার শুধু হয়রানিই

সার হল। তার সব ঐকান্তিকতা মাঠে মারা গেল।

হুদা ঘরে ঢুকতে আলেয়া জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি আমার চিঠি পাওনি ?" বোন বেরিয়ে গেল। হুদা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, পেয়েছে। আলেয়ার মুখে চোখে রাগ ফুটে উঠল। ব্যঙ্গভরে জিজ্ঞেস করল, "তারপরেও বাড়িতে থাকার প্রয়োজন মনে করনি। মা-বোনকে আমার জন্যে রেখে বেড়াতে বেরিয়েছ !" হুদার মাথায় চড়াৎ করে রক্ত চড়ে গেল। সে আলেয়ার জন্য কত কি করল। আর আলেয়া তার কোনো কথা না শুনেই উল্টো ধারণা করে বসে থাকল। এরকম মেয়ের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক সম্ভব নয়। সে ঘর থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানায় বসল। বসে যত ভাবতে লাগল ততই রাগ বেড়ে গেল।

ক্ষুব্ধ অভিমানে দিন কেটে গেল। রাতে শোবার ঘরে গেল। কিন্তু আলেয়া মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে না কাঁপ মেরে পড়ে আছে হুদা বুঝতে পারল না। একবার ভাবল ডাকে। কিন্তু মানে বাধল। সেও মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম এল না। বারবার ইচ্ছে করল, আলেয়াকে কাছে টানে। তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে। কিন্তু অভিমান বাধা হয়ে দাঁড়াল। "তুমি যদি থাকতে পার, আমি পারব না"। কোন কথা হল না !

সকালে উঠে স্নান-খাওয়া করে হুদা স্কুলে রওনা হল। কিন্তু পড়ানোতে মন বসাতে পারল না। মনে হল, সত্যি তো, সে আলেয়ার জন্য কি কি করেছে তাতো আলেয়া জানে না। তাকে বলতে হবে। তার সঙ্গে ভাব করতে হবে। হেড মাস্টারকে বলে সে বাস ধরল। ঠিক করল, আলেয়াকে নিয়ে গঙ্গার ধারে যাবে। সেখানে মন খুলে সব কথা বলবে। একটু বেড়ানোও হবে। বাস থেকে নেমেই রিক্সা নিল। বাড়ির সামনে রিক্সা থেকে নেমে দেখল, বসার ঘরে বসে আলেয়া হাশেমের সঙ্গে কথা বলছে। হুদার মাথায় আবার আগুন জ্বলে উঠল।

হাশেম আলেয়ার বন্ধু। একই সঙ্গে পড়ত। বি এ পাস করে স্টেট ব্যাঙ্কে প্রবেশনারী অফিসার হয়েছে। আলেয়ার সঙ্গে বিয়ের কথাও হয়েছিল। কিন্তু তখন আলেয়া জানত, হুদা এম এস সি তে ফার্স্ট ক্লাস। কদিন বাদেই কলেজে লেকচারার হবে। আলেয়া প্রবেশনারী অফিসার থেকে লেকচারারকে বেশি পছন্দ করেছিল। তাই হুদার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। হুদা ফার্স্ট ক্লাস না, তা জানলে আলেয়া এই হাশেমকেই বিয়ে করত। হুদার মাথায় কে যেন পেরেক ঠুকে পুঁততে লাগল।

হুদার একবার মনে হল যে, ভদ্রতার খাতিরে তার হাশেমের সঙ্গে কথা বলা উচিত। কিন্তু কিছুতেই মনকে মানাতে পারল না। অগত্যা যেন তাদের দেখেইনি, এমনি ভাব করে সোজা বাড়ির ভিতরে চলে গেল। শোয়ার ঘরে ঢুকে জামা খুলছিল। আলেয়া এসে বলল, "হাশেম বসে আছে। তুমি ওর সঙ্গে কোনো কথা না বলেই চলে এলে ?"

"যার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল, সে তো কথা বলছিল। আবার আমাকে কেন ?"

"ওসব কথা পরে হবে। ও এক্ষণি চলে যাবে। তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে।"

"কিন্তু আমার তো এখন স্কুলে থাকার কথা ছিল।"

"কি বলতে চাইছ ?"

"বলার কিছু নেই। তুমি ভাল করেই জান হাশেম কিসের টানে এখানে এসেছে ?"

আলেয়া সর্পিনীর মত ফুঁসে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখ দিয়ে ঘৃণা ঝরে পড়ল। কিন্তু মুখে কোনো কথা বলল না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বৈঠকখানায় চলে গেল। ফিরে এসে গুম হয়ে বসে থাকল।

সে কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র। তারপর সে উঠে তাক থেকে চামড়ার ব্যাগটা নামাল। জামা কাপড়গুলো তাতে ঢুকিয়ে চেন আঁটল। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বাড়ির বাইরে পা দিল।

হুদার খুবই খারাপ লাগল। একবার ভাবল, গিয়ে আটকায়। কিন্তু পরক্ষণেই অভিমান জয়ী হল! "সে যদি তাকে কিছু না বলেই চলে যেতে পারে, তাহলে আমারই বা কি দায় পড়েছে আটকানোর। তুমি থাকতে পারলে আমি পারব না?" হুদা আটকাতে পারল না। অসহায়ের মত শুধু পথের দিকে চেয়ে থাকল। আলেয়া লম্বা লম্বা পা ফেলে দূর থেকে আরও দূরে চলে গেল। এক সময় পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। হুদার তখনও একবার মনে হল, ছুটে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু পারল না।

দেওয়াল

নীলিমার ভূতটা তাকে কিছুতেই ছাড়ছে না।

পলক শুনেছে, কাউকে ভালোবাসলে মরেও নাকি ভুলতে পারা যায় না। নীলিমা তাকে খুবই ভালোবাসত। নীলিমা কি তাহলে তাকে কাছে টেনে নিতে চায়? পলক ভয়ে কেঁপে ওঠে। সে এখনই যেতে চায় না। দিবাকর লিফটের দরজা খুলে বলে, "সাততলা আইসে গেইছে বাবু। আপনি তো র‍্যাকে যাবেন!" পলক লিফট থেকে বেরিয়ে সামনের দরজা দিয়ে র‍্যাকে ঢুকে যায়।

এই র‍্যাকেই নীলিমার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ হয়েছিল। পলকের এখনও স্পষ্ট মনে আছে। নীলিমা কোমরে কাপড় জড়িয়ে চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে র‍্যাকের প্রতিটি বই তুলে তুলে দেখছে। পলক পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আবার ভয়ও আছে। নীলিমা যদি তার কথা ভালোভাবে না নেয়। এর আগে অনেকবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু কোনো কথা হয়নি। পলক দেখেছে, নীলিমা তার কাজের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক। পলকের ভালো লাগে। আলাপ করতে ইচ্ছে হয়। সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করে ফেলে, "কি বই খুঁজছেন?" নীলিমা পলকের দিকে মুখ ফিরিয়ে, হেসে উত্তর দিল, "তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা। হ্যাঁ, আপনি তো তারাশঙ্করের ওপর কাজ করছেন। বলুন তো ওঁর আর কোন্ কোন্ উপন্যাস রাজনৈতিক?"

"কিন্তু আপনার গবেষণার বিষয় তো সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উপন্যাসের শিল্পরূপ। আপনি তারাশঙ্করকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন?"

"স্যার বলেছেন, রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারাটা ভূমিকায় সংক্ষেপে দিয়ে দিতে হবে।"

"তাহলে তো আর কিছু বলার নেই।"

পলকও নীলিমার সঙ্গে খুঁজতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে পলক র‍্যাকে বই খুঁজছিল। কিন্তু সে কি বই খুঁজছিল মনে করতে পারল না। র‍্যাক থেকে নেমে সে চারতলায় পি-এইচ-ডি. স্টুডেন্টদের পাঠকক্ষে ঢুকল। কয়েকটি ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে। কিন্তু প্রায় প্রতিটি টেবিলের ওপরই বই পালা দেওয়া আছে। দশ-বারো খানা থেকে একশ-দেড়শ খানা পর্যন্ত। পলক বুঝতে পারে না, এতগুলো বই একসঙ্গে কি দরকারে লাগে! তবুও লোককে দেখানোর জন্যে পাহাড় করে রেখে দেবে। দক্ষিণের দিকের কয়েকটা চেয়ার-টেবিল ফাঁকা। পলক তার একটাতে গিয়ে বসে পড়ল। কলেজ সার্ভিস কমিশনে ইন্টারভিউ দিয়ে এসে পলক নীলিমাকে নিয়ে এরকম একটা ফাঁকা জায়গায়ই বসেছিল। নীলিমা জানতে চেয়েছিল, "ইন্টারভিউ কেমন হোলো?"

"ভালোই, তবে পি-এইচ-ডি-টা অ্যাওয়ার্ড হয়ে গেল সুবিধে হত।"

"কিন্তু তুমি তো থিসিস সাবমিট করে দিয়েছ।"

"সাবমিট করলে কি হবে? অ্যাওয়ার্ড তো হয়নি। আমি থিসিস সাবমিট করেছি জানুয়ারিতে। আজ ডিসেম্বরেও অ্যাওয়ার্ড হল না। অথচ অমল যাদবপুরে সাবমিট করেছিল জুনে। নভেম্বরে অ্যাওয়ার্ড হয়ে গেছে। ওর একটা ভালো কলেজে হয়ে যাবে। আমার...." পলক নীলিমার কাছে তার ক্ষোভ প্রকাশ করে হালকা হতে চাইল। নীলিমা টেবিলের কোণায়

হাত রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতে লাগল।

পলকের মনে হল, টেবিলের কোণায় হাত দিয়ে নীলিমা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সে পলকের কাছে আজ কি জানতে চায় ? পলক তাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসত কিনা ? না হলে তার দশা আজ এমন কেন ? নীলিমা বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারল না। মুখ ফিরিয়ে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসে পড়ল। পলকের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল।

লাইব্রেরির গেটের সামনেই স্টাফরুমে যাবার গেট। কিন্তু রাখালদার ক্যান্টিনটা পলককে অলক্ষ্যে টানতে লাগল। যেদিন ইসলামপুর কলেজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পেল সেদিন সে বলতে গেল জোর করেই নীলিমাকে ক্যান্টিনে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আজ একাই গিয়ে দাঁড়াল। ক্যান্টিন প্রায় ভর্তি। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বসে নরক গুলজার করছে। পলককে দেখে গোলমালটা একটু কমে গেল। কয়েকজন ছেলেমেয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়েও গেল। কাউন্টারের ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কি খাবেন স্যার ? বলুন।"

"দুটো ডেভিল চপ আর একটা গজা।"

ছেলেটি পয়সা নিয়ে কুপন দিল। কুপনটা বয়ের হাতে দিয়ে পলক কোণের টেবিলটায় গিয়ে বসল। বয় ডেভিল চপ আর গজার প্লেটটা এনে টেবিলের ওপর রাখল।

"আচ্ছা ডিমের চপকে কেন ডেভিল চপ বলে বল তো ?" প্রশ্নটা করেছিল নীলিমা। পলক কোনো উত্তর দিতে পারেনি। বসে বসে ভাবছিল। নীলিমা বলল, "ভাবার কিছু নেই। অভিধানে দেখে নিলেই হবে। তুমি কবে ইসলামপুর যাচ্ছ ?"

"পয়লা তারিখেই জয়েন করতে বলেছে। তার মানে তিরিশ তারিখের মধ্যেই রওনা দিতে হবে।"

"তিরিশ তারিখেই রওনা দাও। তবে ওখানে গিয়ে আমাকে ভুলে যেও না কিন্তু। প্রতিদিন আমাকে চিঠি লেখা চাই।"

প্রতিদিন হয়ে উঠত না। তবে সপ্তাহে তিন-চারটে চিঠি পলক লিখত। নীলিমা অবশ্য প্রতিদিনই লিখত। প্রথম মাসের বেতন পেয়েই পলক নীলিমাকে একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিল। তার কিছুদিনের মধ্যেই তারা বিয়ে করল। বিয়ের পর আর নীলিমা কলকাতায় থাকতে চাইল না। বলল, "আর পি-এইচ-ডি. করে কি হবে ? আমি তোমার কাছে চলে যাব।" অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে পলক তাকে নিরস্ত করেছিল। তখনও সে বেহালায় তার বাবার বাড়ি থেকেই যাতায়াত করে। কখনও কখনও আমহার্স্ট স্ট্রীটে পলকদের বাড়িতেও আসে।

বছরখানেক পরে এখানে লেকচারারের একটা পোস্ট খালি হল। পলকের গাইড উৎপলবাবু তখন হেড। অনেক অ্যাপ্লিক্যান্ট ছিল। কিন্তু পলকের হয়ে গেল। ততদিন নীলিমারও পি-এইচ-ডি. হয়ে গেছে। ব্রেবোর্ন কলেজে একটা কাজও পেয়ে গেছে। এবারে তারা একসঙ্গে থাকতে লাগল।

ক্যান্টিনের বয় এসে দাঁড়াল, "স্যার, আর কিছু ?" পলকের খেয়াল হল, সে অনেকক্ষণ এখানে বসে আছে। না-সূচক মাথা নেড়ে সে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় স্টাফরুমে গিয়ে বসল।

পলকের মনে পড়ে, সেই সময়টা তাদের খুব ভালোভাবে কেটেছিল। সকালে উঠে দুজনেই একটু পড়াশোনা করত। দশটার দিকে স্নান-খাওয়া সেরে দুজনেই বেরিয়ে পড়ত। নীলিমা যেত ব্রেবোর্নে, পলক এখানে। বিকেলে দুজনেই বাড়ি ফিরত। কে আগে ফিরতে

পারে তার প্রতিযোগিতা চলত। তারপর সময়টা শুধু তাদের দুজনের নিজস্ব। যা করে খুশি, যেমন করে খুশি কাটাও। ছুটির দিনগুলোতে আরও মজা হত। ছুটির দিনে প্রায়ই তারা দেরি করে উঠত। কোনো দিন একটা সিনেমা দেখত, কোনো দিন পার্কে গিয়ে বসত, কোনো দিন আবার কোনো বন্ধু বা বান্ধবীর বাড়ীতে হানা দিত। গল্পে-গুজবে, হৈ-হুল্লোড়ে সময় কখন বয়ে যেত তারা বুঝতেই পারত না।

এরই মধ্যে নীলিমার কোলে এল অলোক। নীলিমা কলেজ থেকে মাসতিনেকের ছুটি নিয়েছিল। ছুটি শেষ হতেই কলেজ যেতে লাগল। অলোক সারাদিন বাড়ির কাজের মেয়ে মালতীর কাছে থাকত। মালতীই তাকে দুধ খাওয়াতো, মালতীই আদর করত, মালতীই ঘুম পাড়াতো। কলেজ থেকে ফিরে নীলিমা যখন ছেলেকে কোলে নিতে যেত অলোক কিছুতেই মার কাছে যেতে চাইত না। পলকের কাছেও আসত না। পলক এতে কিছু মনে করত না। কিন্তু নীলিমা ভীষণ রেগে যেত। রেগে গিয়ে ছোট্ট বাচ্চাটাকে মারধোরও করত, "বাঁদর ছেলে, নিজের মাকে চিনতে পারে না। বাবার মতো শুধু বাইরের দিকে টান।" নীলিমার মেজাজ তখন খিটখিটে হয়ে গেছে। একদিকে কলেজের ক্লাস, অন্যদিকে সংসারের হাজারো সমস্যা সামলে ছেলেকে মানুষ করতে সে নাজেহাল হয়ে পড়ছে। তাই পলক কলেজের কাজটা ছেড়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু নীলিমা রাজি হয়নি।

নীলিমার শরীর কোনোদিনই তেমন মজবুত ছিল না। বাচ্চা হওয়ার পর যেন একেবারে জবুথবু হয়ে গেল। যেন ষাট বছরের বুড়ি। নীলিমাকে দেখলেই পলকের সেই ধাঁধাটার কথা মনে পড়ত ঃ রাজার বাড়ির ছুড়ি/এক বিয়ানেই বুড়ি। তার কণ্ঠস্বর বুড়িদের থেকেও কর্কশ। পলকের হতাশ লাগত। যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলত। তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। ফিরত যতটা সম্ভব দেরি করে। কোনো কাজ না থাকলে স্টাফরুমে বসে থাকত। সেদিনও ছিল। একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। পলক মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়েই কামনা-স্পৃষ্ট হয়ে গেল। কি সুন্দর ফুটফুটে ফরসা একটা মুখ, উন্নত বুক, সুস্থ সবল শরীর। সে শরীরে যেন সর্বদাই ভোগের আবেদন। মেয়েটি বলল, "স্যার, আমি আপনার আন্ডারে পি-এইচ-ডি. করতে চাই!" কি মিষ্টি সে কথা! পলকের না বলার সাধ্য নেই। কিন্তু মেয়েটি কে? কোথার থেকে এল। ক্লাসে দেখেছে বলে তো মনে পড়ছে না। মেয়েটি আবার বলল, "স্যার বিমলবাবু পাঠালেন।" বিমলবাবু? তার মানে বর্ধমান থেকে আসছে। তাই বল! না হলে তুমি আমার চোখে পড়বে না তাই হয়? পলক এবারে মুখ খুলল, "কিন্তু বর্ধমান থেকে এসে তুমি কাজ করবে কি করে?"

"না স্যার বর্ধমান থেকে আসতে হবে না। বর্ধমানে আমার বাপের বাড়ি হলেও স্বামী থাকে কলকাতায়।"

পলক খেয়াল করেনি, সিঁথির ওপর একটুখানি সিঁদুর লাগানো আছে বটে। আরও ভালো। কোনো বাড়তি ঝামেলা নেই। পলক জিজ্ঞেস করল, "তোমার স্বামী কোথায় থাকেন?"

"সল্ট লেকে স্যার।"

'কি কাজ করেন?"

"একটা ওষুধের কোম্পানিতে কাজ করেন স্যার।"

"তাহলে তো মাঝে মাঝেই ট্যুরে ফুরে যেতে হয়?"

"মাসের বিশ দিনই বাইরে থাকে স্যার।"

পলক মনে মনে বলল, আরও ভালো। মুখে বলল, "তাহলে তো বাড়িতে তোমাকে

প্রায়ই একা থাকতে হয় ?"

"একা নয় স্যার। কাজের মেয়েটি আছে। তাছাড়া আমার শ্বশুর-শাশুড়িও প্রায় আসেন।"

কথাটা পলকের পছন্দ হল না। তা আর কি করা যাবে! সে বলল, "বিমলবাবু যখন পাঠিয়েছেন, তখন তো আর না বলতে পারি নে। তুমি কাল থেকেই কাজ শুরু করে দাও। দোতলায় ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরিতে সুশান্তর কাছ থেকে আমাদের এখানে কি কি কাজ হয়েছে তার লিস্টটা দেখে নাও। তাহলে একটা ধারণা হবে। তারপরে আমরা প্রজেক্ট ঠিক করব।"

সে সম্মতি জানিয়ে, হেলে-দুলে, কামনার ঝিলিক তুলে. পলকের বুকটা মাড়িয়ে চলে গেল। নামটা কি যেন বলছিল ? রানী ! সত্যিই রানীর মতোই। পলক তাকে কি বিষয় দেওয়া যায় তাই ভাবতে লাগল।

পরের দিন সকালে উঠে পলক পরিপাটি করে দাড়ি কাটল, মানানসই করে গোঁফ ছাঁটল। গায়ে সাবান মেখে চুলে শ্যাম্পু দিল। রুমালে একটু সেন্টও মাখিয়ে নিল। ভাঁজভাঙা জামা-কাপড় পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এল। একটু আগেই এল। রানী এলে বলল, "তোমার গবেষণার বিষয় হবে 'বাংলা উপন্যাসে বিধবা।" রানী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "সেটা কিরকম স্যার ?"

"সেটা। যেমন ধরো, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির বিনোদিনী—এরা সকলেই বিধবা। উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি এবং পরিণতি নিয়ন্ত্রণে এদের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তোমাকে এই জাতীয় চরিত্রগুলি বের করে এই ভূমিকাটি দেখাতে হবে।"

"স্যার সবগুলো চরিত্র বের করতে হবে ?"

"সব কেন ? প্রধান প্রধান উপন্যাসিকের প্রধান চরিত্রগুলি বের করতে হবে।"

"প্রধান কেমন করে বুঝব স্যার ?"

"তার জন্য তো আমি আছি। চলো তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

পলক রানীকে নিয়ে স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর থেকে পলকের দিনের অনেকটা সময়ই রানীর সঙ্গে কাটিতে লাগল। কখনও স্টাফরুমে, কখনও ম্যানুস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরিতে, কখনও সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে—যেখানে পলক সেখানেই রানী। কখনও কখনও কফিহাউস এবং কলেজ স্কোয়ারেও। দুয়েকদিন সিনেমাতেও।

কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সম্পর্ক সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। সে আলোচনা নীলিমার কানেও গিয়ে থাকবে। কিন্তু সে কোনও অনুযোগ করত না। হয়ত পলককে সে এতই ভালোবাসত যে অনুযোগের কথা ভাবতেই পারত না। পলকও নীলিমাকে খুবই ভালোবাসত। তার জন্য দুঃখ অনুভব করত। কিন্তু তার শরীরের প্রতি সে কোনো আকর্ষণ অনুভব করত না। অথচ রানীর শরীরের প্রতি সে একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করত। রানীর শরীর দেখলেই তাকে ভোগ করতে ইচ্ছে করত।

সে সুযোগও এসে গেল। সেবার পুজোর ছুটিতে নীলিমা ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। কাজের মেয়েটিকেও একটা কাপড় দিয়ে পলক ছুটি দিয়ে দিল। তার বিশ্ববিদ্যালয়ও ছুটি। সেন্ট্রাল লাইব্রেরি খোলা ছিল। রানী রোজ আসছিল। তার তথ্য সংগ্রহ শেষ হয়েছে। এবার থিসিস লিখতে হবে। পলক বলল, "এখানে তো হবে না। একদিন খাতাপত্র নিয়ে বাড়িতে এসো। সব তথ্য দেখে তবে ঠিক করতে হবে।"

পরের দিনই রানী বাড়িতে হাজির হল। পলক কৌশলে তাকে বিছানার উপর বসিয়ে পাশে বসল। তার নার্ভাস লাগছিল। সে যা করতে যাচ্ছে রানী যদি তাতে অসন্তুষ্ট হয় ?

সে যা বুঝেছে তাতে অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তার বুঝতে যদি ভুল হয়ে থাকে! রানী হাসিমুখে বলে, "কি করতে হবে বলুন ?" পলক ভয়ে ভয়ে একটু কাছে সরে এসে হাসার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করে, "শিখিয়ে দেবো ?" যেন এক্ষুনি গলে পড়বে এমন ভাব করে রানী পলকের পাশে আরও যেন ঘন হয়ে বসে। পলক দু'হাত দিয়ে তাকে আকর্ষণ করে। রানী বাধা দেয় না। পলক ভেসে যায়।

কাপড়-চোপড় ঠিক করে নিয়ে রানী বলে, "কি করে লিখতে হয়, আমি তো ঠিক জানি নে। আপনি লিখে দিলেই ভালো হয়।" পলক না করতে পারে না। রানী খাতাপত্র রেখে যায়। তারপর রোজ এসে তার থিসিস লেখার অগ্রগতি জেনে যায়। পুজোর ছুটি শেষ হওয়ার আগেই থিসিস লেখা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু রানীর আসা বন্ধ হয় না। নীলিমা বাড়িতে এলে মাঝে মাঝেই পলককে নাম ভাঁড়িয়ে হোটেলে ঘর ভাড়া করতে হয়।

ইতিমধ্যে ডিপার্টমেণ্টে লেকচারারের একটা পোস্ট খালি হল। পলকের বন্ধু অমল তখন হেড। ভি. সি.-র সঙ্গেও তার জানাশোনা। তাছাড়া রানীর রেজাল্টও ভালো ছিল। বি. এ., এম. এ. দুটোতেই ফার্স্ট ক্লাস, উপন্যাসে পি-এইচ. ডি। রানী এখানেই লেকচারার হয়ে গেল।

লেকচারার হল, কিন্তু পড়াতে পারে না। রানী পড়াশোনা করে পাশ করেনি। শরীর দেখিয়ে দশ সের ধান ভানিয়ে নেওয়ার মতো পাশ করে এসেছে। পলক বসে বসে ক্লাস নোট তৈরি করতে লাগল। এখানেই শেষ নয়। রানী গবেষণার জন্য স্কলার নেয়। পলককে তাদেরও গাইড করতে হয়। রানীর স্কলার শুভা এসে সামনে দাঁড়াল, "দিদি বলছিলেন—" পলকের অসহ্য মনে হল। সে শুভার কথার মাঝেই বলে উঠল, "আমার নিজের অনেক কাজ পড়ে আছে। তোমার দিদি কি বলছিল তা শোনার আমার সময় নেই।" পলক শুভাকে অবাক করে দিয়ে স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বাড়িতে এসে দেখল, ছেলে অলোক জামা-কাপড় পরে তৈরি হচ্ছে। একটু পরেই সে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাড়িটা পলকের কাছে খুবই ফাঁকা মনে হল। সে ও ঘরে নীলিমার বিছানাটার ওপর গিয়ে বসল। শেষের দিকে নীলিমা প্রায় সারাক্ষণ এই বিছানায় শুয়ে থাকত।

পলক যত রানীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিল তত যেন নীলিমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। আর নীলিমা তত বেশি করে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। সে কোনোরকমে কলেজে যেত। ক্লাস কটা করে বাড়ি ফিরেই আবার শুয়ে পড়ত। ডাক্তার দেখানো হল। তারা বলল, হার্টের রোগ। অপারেশন করতে হবে। অপারেশনে নীলিমার খুব ভয়। সে পলকের হাতটা ধরে বলল, "যাক না আর কিছু দিন। যদি কিছু হয়! আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না।" পলক খানিকক্ষণ অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর জামা-কাপড় পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেল।

সেদিন রানী বিশ্ববিদ্যালয়ে এল না। তারপরের দিনও না। তবে খবর এল। রানীর স্বামী উল্টাডিঙি স্টেশানে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে। কেউ বলছে দুর্ঘটনা—আনমনে দাঁড়িয়ে ছিল, কাটা পড়ে গেছে। কেউ বলছে আত্মহত্যা—ট্রেন আসছে দেখেও সে নড়েনি, ইচ্ছে করে কাটা পড়েছে। পলকের মন বলছে, সেই হত্যাকারী। লোকটাকে সে-ই হত্যা করেছে।

কয়েকদিন পর রানী এল। তখন সে ধাক্কা অনেকটা সামলে উঠেছে। ভাবখানা এমন যে দেখে মনে হয় যেন ভালোই হয়েছে। রানী অনেকক্ষণ ধরে পলকের সঙ্গে কথা বলল। কথায় কথায় একসময় বলল, "এখন আপনার স্ত্রী না থাকলেই আর আমাদের একসঙ্গে থাকতে কোনো আপত্তি ছিল না।" পলক চমকে উঠল। কথাটা তারও কয়েকবার মনে হয়েছে। নীলিমার করুণ মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বাড়ি গিয়ে বিছানার কাছে

যেতেই নীলিমা তার হাতটা চেপে ধরল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "তোমার যা খুশি কর। ইচ্ছে হলে রানীকে বাড়িতে নিয়ে এসো। কিন্তু আমাকে ত্যাগ কোরো না। আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না।" পলক আবার চমকে উঠল। নীলিমা কি সব কিছু জানতে পারে? নীলিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "কি যা-তা বলছ? আমি তোমাকে ত্যাগ করব কেন? আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।"

কিন্তু রানী ছাড়ল না। রানীর পীড়াপীড়িতে পলক নীলিমাকে হেলথল্যান্ড নার্সিং হোমে ভর্তি করল। সেখানকার হার্ট স্পেশালিস্ট মাধবন নাকি রানীর জানাশোনা। মাধবনই নীলিমার অপারেশন করল। অপারেশন সাকসেসফুল হল। কিন্তু তার আর জ্ঞান ফিরল না। সাত দিন অচেতন অবস্থায় থেকে নীলিমা ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেল। পলকের আবার মনে হল সে-ই নীলিমাকে হত্যা করেছে।

নীলিমা মোটেই নার্সিং হোমে যেতে চায়নি। বলেছিল, মরণ হলে এই বাড়িতেই হোক। পলক তাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, রানী কি সত্যিই চাইছিল, নীলিমা সুস্থ হয়ে উঠুক? না মনেপ্রাণে চাইছিল তার মৃত্যু হোক? পলক নিজেও কি চায়নি, নীলিমার মৃত্যু হোক? তাহলে রানীকে ঘরে তুলতে আর কোনো বাধাই থাকবে না! বাড়িটা জেলখানার মতো অসহ্য মনে হল। পলক বাড়ি থেকে বেরিয়ে নার্সিং হোমে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে সে চারতলায় উঠল। ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের গেটে দারোয়ান আটকাল। সিস্টার এসে বলল, "ওখানে নতুন পেশেণ্ট ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তারবাবুর পারমিশান ছাড়া আপনাকে যেতে দেওয়া যাবে না।" পলক বুঝতে পারল না, আবার কে কাকে মেরে ফেলতে চায়! সে সিঁড়ি বেয়ে পিছনের দিকে সেই দরজাটার কাছে গেল। এই দরজা দিয়েই নীলিমার মৃতদেহ গাড়িতে তোলা হয়েছিল। কি সুন্দর ব্যবস্থা! সুস্থ যদি হও তবে সামনের দরজা দিয়ে বেরুবে। সবাই দেখবে। আর যদি মারা যাও, সকলের অগোচরে পিছনের দরজা দিয়ে তোমাকে বাইরে ফেলে দেওয়া হবে। সামনের লোকেরা জানতেই পারবে না, একজন পেশেণ্ট চিরতরে চলে গেল। দরজাটা এখন বন্ধ। পলকের সামনে যেন আজ সব দরজাই বন্ধ।

শুধু শ্মশানের দরজাটা বোধ হয় এখনও বন্ধ হয়নি। সে শ্মশানেই গেল। তিন নম্বর চুল্লির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটি বাচ্চা ছেলে পুরোহিতের কথামতো এক মহিলার মুখে আগুন দিচ্ছিল। অলোকও সেদিন এমনি করে তার মায়ের মুখে আগুন ছুঁইয়ে দিয়েছিল। সেই শেষবারের মতো নীলিমার মুখটা পলক দেখেছিল। নীলিমা যেন পলককে কি বলতে চাইছিল। ওরা বলতে দিল না। ডালা তুলে তাকে চুল্লির মধ্যে পুরে দিল। ঘণ্টাখানেক বাদে অলোকের হাতে তারা একমুঠো ছাই তুলে দিল। সেই ছাই নিয়ে গিয়ে সে গঙ্গায় বিসর্জন দিল। ভারাক্রান্ত মনে পলক আদিগঙ্গার তীরে এসে দাঁড়াল।

এর পরে তার আর এগিয়ে যাওয়ার পথ নেই। পিছিয়ে আসার পরও হারিয়ে গেছে। পলক দাঁড়িয়েই থাকল।

নিরুদ্দেশ

কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের স্টাফরুমে বসে আছি। ডানপাশে বিনয়দা আর সামনে অবিনাশবাবু এবং কল্যাণবাবু। বিনয়দা এবং কল্যাণবাবু এবার আই, এফ, এ শীল্ড কে পাবে এই নিয়ে তর্ক করছিলেন। অবিনাশবাবু সেই তর্কটা মন প্রাণ দিয়ে উপভোগ করছিলেন এবং অবস্থা বুঝে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। একদিন আমি এই কলেজের ছাত্র ছিলাম—সবাই বলত ভাল ছাত্র। এক বুক আশা নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতাম। এই কলেজের প্রতি ধূলিকণায় যেন সেই স্বপ্নের রেশ আজও মিশে আছে। এই তো এই ঘরটাতে এসেও ভবিষ্যতের কত রঙিন ছবি আঁকতাম। তখন কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিলাম যে এখানে একদিন দেড়শ টাকা মাস মাইনের টেম্পুর‍্যারী ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্ট হব। হঠাৎ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল গুণেনবাবু এসে পড়ায় আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। আমরা সকলেই উঠে দাঁড়ালাম। উনি বসলে আমরাও বসলাম। কিছুক্ষণ একদম চুপচাপ। তারপর গুনেনবাবুই কথা শুরু করলেন, "বকুল, তোমাকে একটা কথা বলব।" আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমাকে আর কি বলার থাকতে পারে ? তিন দিন হল জয়েন করেছি। তার জন্য ফর্মাল অর্ডার এখনও হয় নি। তাহলে নিশ্চয় অর্ডারটা আর হচ্ছে না। একেই বলে...। না এত ভাববার সময় নেই। আস্তে করে বললাম, "বলুন স্যার" বললাম বটে তবে গলার স্বরটা একটু কেঁপে গেল। গুণেনবাবু বললেন, "কমল ওর ছেলে মেয়েকে পড়ানোর কথা বলছিলেন—তুমি না কোরো না।" আমার তিন দিনের চাকরী যাওয়ার ভয়টা আর রইল না ঠিকই। কিন্তু আমি চমকে উঠলাম। কমলবাবুর ছেলেমেয়েকে পড়াতে হবে। না, কমলবাবুর ছেলেমেয়ে কাউকেই আমি চোখে দেখিনি। তবে একদিন তাঁর মেয়ের পায়ের নূপুরের নিক্কন শুনেছিলাম। তখন আমি কলেজে। তথ্য অফিসে আসছিলাম। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই তবলার ধা ধিন ধা না তিন না তালের সাথে নূপুরের রিনি ঝিনি শব্দ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা কনকন করে উঠল। ওরা কি ভাগ্য করে এসেছে! নাচে গানে জীবনটাকে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলছে। আর আমি পায়ের তলায় একটু মাটি পাবার জন্য কোথার থেকে কোথায় ঘুরে মরছি। না সে ভাগ্যের আজও কোন পরিবর্তন হয় নি, বরং ফারাকটা বেড়েছে। কিন্তু সেই মেয়েটিকেই পড়াতে হবে যার পায়ের নূপুরের শব্দ একদিন বুকে বঞ্চনার জ্বালা ধরিয়েছিল। আমি কেমন বিহ্বল হয়ে যাচ্ছিলাম। ভেবেই পাচ্ছিলাম না কি বলব। গুণেনবাবু বলে উঠলেন, "কি ভাবছ ? তোমার কোন আপত্তি নেই তো ?" আমার কোন আপত্তি ছিল কিনা তা জানি না। তবে আপত্তি জানাবার মত অবস্থা ছিল না। তাই কোনরকমে উচ্চারণ করলাম, "আপনি যখন বলছেন তখন আমি আব কি বলব ?" সত্যই আমার কিছু বলার ছিল না।

গুণেনবাবু চলে গেলেন। আমি চুপ করে বসেছিলাম। কল্যাণবাবু আস্তে করে অবিনাশ বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কমলবাবুর ছেলে-মেয়েরা কে কোন ক্লাসে পড়ে ?" আমার হঠাৎ খেয়াল হল তাইত কোন ক্লাসে পড়ে সেটা তো জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল। অবিনাশ বললেন, "সেই তো প্রিন্সিপ্যাল তো সেটাই বললেন না, প্রিন্সিপাল না বললেও বিনয়দা বলে দিলেন, ছেলেটি পড়ে এগার এবং মেয়েটি বার ক্লাসে। বিনয়দা আরও জানালেন যে ওরা

ুজনেই পড়াশোনায় বেশ ভাল, ক্লাসে স্ট্যান্ড করে। আমি আবার ভাবতে লাগলাম, এগার ার ক্লাসের ভাল ছেলেমেয়েকে পড়ানোর জন্য কমলবাবু আমার কথা ভাবলেন কেন ! আমি নার্স সহ বি এস সি পরীক্ষা দিয়েছিলাম বটে। কিন্তু রেজাল্ট তো কমলবাবুর অজানা নয়। বে হয়ত একবার আমাকে ভাল ছেলে বলে জেনেছিলেন তা ভুলতে পারেন নি। হ্যাঁ ্যাথেমেটিকস অনার্সের অ্যাডমিশন টেস্টের খাতা কমলবাবুই দেখেছিলেন এবং তাতে আমি থম হয়েছিলাম আবার ঘটনাক্রমে জগদীশ বোস ন্যাশন্যাল ট্যালেণ্ট রিসার্চ পরীক্ষার সময়ও মলবাবুই গার্ড ছিলেন। অতীতের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়তেই আমার বুকটা অব্যক্ত বদনায় ভরে গেল। চুপ করে বসে রইলাম। বিনয়দা না থাকলে কলেজ থেকে কখন ফেরা ় কে জানে।

পরের দিন কমলবাবু এসে পড়ানোর দিনক্ষণ ঠিক করে গেলেন। দেখতে দেখতে র্ধারিত মঙ্গলবার এসে গেল। আজ সন্ধ্যা ছটায় পড়াতে যেতে হবে। এগার বার ক্লাসের ছলেমেয়েকে পড়াতে হবে। এক সময় ভাল ছাত্র ছিলাম ঠিকই। কিন্তু কলেজের রেজাল্ট ারাপ করে ঘর থেকে অনেকদিন ছন্নছাড়ার মত ঘুরেছি। পড়াশোনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নই। জানি না কি পড়াব ! তার উপর আবার পড়াতে হবে যেই মেয়েটিকে যাকে কোনদিন চাখে না দেখলেও, যার নাম না শুনলেও তার পায়ের নূপুরের রিনি ঝিনি আমাকে একদিন নেক কষ্ট দিয়েছিল। কিন্তু কি করা যাবে, যেতেই হবে। পাঁচটা হয়ে এল, অতএব এবার বরিয়ে পড়তে হয়। পোশাক বলতে বছর তিনেকের পুরানো একটা একটু ছেঁড়া টেরিলিনের ্যাণ্ট আর সূতীর একটা শার্ট, চপ্পল জোড়া পরে তৈরী হয়ে গেলাম। রাস্তায় যেতে যেতে ারবার মনে হতে লাগল এই পড়া এবার কেমন করে পড়াব। কাছাকাছি এসে আমার আরো কমন বাধো বাধো লাগতে লাগল। বাড়ীর সামনেই কমলবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে ড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর ছেলেমেয়েব সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। ছলেটি একটি চেক শার্ট পরে আছে। ওর মুখে সর্বদা একটি মিষ্টি হাসি যেন লেগেই আছে। বে চেহারাটা অত্যন্ত নিরীহ গোছের। বয়স পনের ষোল হবে। মেয়েটির বয়স সতের আঠার বে। মাথার চুল কোঁকড়ানো। একটা লালপাড় শাড়ী পরে মুখটা নীচু করে বসে আছে। জ্ঞেস করে জানলাম ছেলেটির নাম পরিমল আর মেয়েটির রীতা।

আমি ওদের স্কুল এবং কলেজের ব্যাপারে কিছু প্রাথমিক প্রশ্ন করলাম। ওরাও আমার রিচয় জানতে চাইল। কি পরিচয় দেব ? বললাম, "আমি বকুল বিশ্বাস, সোনাডাঙ্গার এক াষীর ছেলে। আমি ফার্স্ট ডিভিসন নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করেছিলাম। তারপর অনার্স নয়ে বি এস সি দিয়েছিলাম। কিন্তু অনার্স পাইনি। বর্তমানে কলেজে ল্যাবরেটরী ্যাসিস্টাণ্ট।" আমার পরিচয় শুনে পরিমল ওর দিদির মুখের দিকে চেয়ে নীরবে কি যেন লতে চাইল, খুব সম্ভবতঃ এই, যে এই যার বিদ্যে সে আবার পড়াবে কি ? আমি বুঝেও া বোঝার ভান করলাম। ওদের কাছে জানতে চাইলাম কিভাবে ওদের সাহায্য করতে পারি। থমে অ্যালজাবরার কয়েকটি অঙ্কের কথা বলল, তারপর ফিজিক্স কেমিস্ট্রী করতে করতে াত নটা হয়ে গেল। আমি ফেরার জন্য প্রস্তুত হলাম। পরিমল গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গল।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠেছিল। এখন রাস্তায় বেরিয়ে ারা পৃথিবীটাই শূন্য মনে হতে লাগল। শরীর প্রচণ্ড ক্লান্ত। মেসে সেই সাড়ে নটার সময় থয়েছি। আবার রাত নটা হয়ে গেল, স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিদেও পেয়েছে। মেসে দুবেলা াওয়ার জন্য মাসে একশ টাকার কিছু বেশী পড়বে, টাকাটা ওরা মাসের শেষেই নিতে

চেয়েছে। মাইনে দেড়শ টাকা, কাজেই সকালে বা বিকেলে টিফিন খাওয়ার কেনো প্রশ্নই ওঠে না। আজ অবশ্য এরা চা খাওয়ার জন্য বলেছিল, কিন্তু আমিতো চা খাইনে। কাজেই ঘণ্টা বারোর মধ্যে একবারেই খাওয়া হয় নি। এসব কথা ভাবতে গেলেই প্রচণ্ড খারাপ লাগে। একেক জন লোকের কত পয়সা। তা দিয়ে তারা কত নোংরামী করে। আর আমার খাবার জোটেনা। এরকম নানা কথা ভাবতে ভাবতে মেসে এসে পৌঁছুলাম। কিন্তু কিছুই খেতে পারলামনা, শরীরটা ভীষণ ম্যাজম্যাজ করতে লাগল। সিঁড়ির নীচে আবার আলো বাতাসহীন স্যাঁত স্যাঁতে ঘরটাতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘরের অবস্থার কথা চিন্তা করতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল। কিন্তু যার কাছে পয়সা নেই তার তো ভাল ঘরে থাকার কোন অধিকার নেই। অথচ....। না আর ভাবতে পারলাম না। কিন্তু ঘুমও এল না। কিছুটা রাত হতে বুঝতে পারলাম জ্বর এসেছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। সকালে ছেলেরা দেখে বলল ম্যালেরিয়ার লক্ষণ। ওরা একজন ডাক্তারও নিয়ে এল। ডাক্তারবাবুও ওদের কথায় সায় দিলেন। আমার মনে হল এখানে থাকলে নির্ঘাত মারা যাব। অতএব বাড়ী যাওয়ার দরকার। একটি ছেলে বাসে তুলে দিল, আমি চাদর মুড়ি দিয়ে বাড়ীর দিকে চললাম।

* * * *

মাস খানেক পর বাড়ী থেকে ফিরলাম। দেখলাম কলেজের চাকরিটা আছে। গতমাসের বেতনটাও পাওয়া গেল, মেসের খরচটাও বেশী হয় নি। কাজেই একটা প্যাণ্ট তৈরী করালাম। পরের দিনই কমলবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি আমার খবর জানতেন না। কাজেই তিনি জানতে চাইলেন, কোথায় গিয়েছিলাম। কিন্তু সব জানার পর জানালেন যে তিনি একটু পরেই কলকাতা রওনা হয়ে যাচ্ছেন। তবে আমি যেন কাল থেকে পড়াতে যাই। কমলবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছিল সপ্তাহে দুদিন যাব—মঙ্গল এবং শুক্রবার। সেই অনুসারে কাল শুক্রবারও বটে। ছটা বাজতে দশ মিনিটের সময় গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম বসার ঘরটা বন্ধ। কলিং বেলটা টিপলাম। কোন সাড়াশব্দ নেই। আবার টিপলাম। এবার এসে দরজা খুলল রীতা। ও আমাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল। বলল, আপনি...। এসেছেন... !" এরকম প্রশ্ন শুনে কি উত্তর দেওয়া যায় তাই ভাবছিলাম। কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঠিক করতে পারি নি। কিন্তু যে এককালে নাম করা ডিবেটার ছিল তার পক্ষে কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না এটা কি করে হয় ? কাজেই একটু সামলে নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "তাহলে কি তোমরা ভাবছিলে যে আমি আর আসব না ?" এবার ও কোন উত্তরই দিতে পারল না। বসতে বলল এবং ভাইকে ডেকে আনল। পড়াতে বসলাম। পরিমল আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, "স্যার আপনি এতদিন আসেন নি কেন ?" আমি ওদের আমার অসুখের ঘটনাটা বললাম। রীতা একবার আমার মুখের দিকে তাকাল তারপর লজ্জায় রাঙা হয়ে মুখটা নীচু করল। খুব সম্ভবতঃ ওর পূর্বের প্রশ্নের জন্যই বেশী করে লজ্জা পেয়েছে। তাই ব্যাপারটাকে হাল্কা করে নেওয়ার জন্য বললাম, "তোমরা কি ভাবছিলে ?" এবার রীতাই উত্তরটা দিল, "আমরা ভাবছিলাম আপনি আর আসবেন না। এর আগেও সামাদ্ বলে একটি মুসলমান ছেলেকে বাবা ঠিক করেছিলেন। সেও একদিন দুদিন আসার পর আসে নি। আপনিও একদিন আসার পর আর আসলেন না। আমবা মনে করলাম মুসলমান ছেলেরা এরকমই হয়।" বার ক্লাসের ছাত্রীর এরকম অযৌক্তিক অর্থহীন এবং অসংলগ্ন কথা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলাম এদের ধ্যান ধারণা কত সীমিত। প্রথমটা কোন কথাই বলতে পারলাম না। পরিমলের অবস্থাও দেখলাম খারাপ, বুঝতে পারলাম ও দিদির উপর প্রচণ্ড রাগ করেছে। এরকম কথা শুনে রাগ আমারও হচ্ছিল। তাই মাথাটাকে যথা সম্ভব ঠাণ্ডা

বাখার চেষ্টা করলাম। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, "দেখো, তোমাদের ধারণাটা শুধু ভুল নয়, অযৌক্তিকও বটে। পূর্বের ছেলেটি হিন্দু হয়েও আর না আসতে পারত। ওর আসা না। আসার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। আর আমার যে অসুখটা হয়েছিল সেটা আমি মুসলমান না হলেও হতে পারত। ধর আমি যদি হিন্দু হয়েও যাই তবে আমার স্বভাব চরিত্র কি পাল্টে যাবে ? আর তুমিই যদি কাল মুসলমান হয়ে যাও তবে ধর্মীয় কিছু আচার আচরণ ছাড়া তোমার স্বভাবটা কি আলাদা হয়ে যাবে ?" ছোটখাট একটা বক্তৃতা মত হয়ে গেল। কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা কেউ বুঝতে পারল কিনা তাও বোঝা গেল না। তখন পড়াতে শুরু করলাম।

পরের দিন পড়াতে আসতে খুব খারাপ লাগছিল রীতার ঐ কথাটা হৃদয়ে খচ খচ করে লাগছিল। সেই অবস্থাতেই ওদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখি রীতা বইখাতা নিয়ে আগে থেকেই বসে আছে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। "বসো, পরিমল কোথায় ?" ভাই আসছে, একটুখানি থামল, তারপর আস্তে করে অনুনয়ের সুরে বলল, "সেদিন আমি কি বলেছি তার জন্য কিছু মনে করবেন না। আমি তো অত সব চিন্তা করে দেখিনি। যা মনে হয়েছিল, আপনাকে তাই বলে ফেলেছি।" "আরে ওতে মনে করার কি আছে ?" আমি উত্তর দিলাম, "তুমি তো অন্যায় কিছু করনি। তোমার যা মনে হয়েছে তাই বলেছ। বরং এতে লাভই হল। তোমার একটা ভুল ধারণা ভেঙে গেল।" রীতা কিছু বলল না। অপরাধীর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। দেখলাম আজ ও একটা লালপাড় শাড়ী পরেছে। মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলি ডান কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর পড়েছে। মুখটা অত্যন্ত রকমের বিষণ্ণ। বুঝলাম ও ওর মন্তব্যের জন্য বড় অনুতপ্ত। তাই বললাম, "তুমি মন খারাপ কোরো না, আমি সত্যিই কিছু মনে করি নি।" একদিন এই মেয়েটির নূপুরের নিক্কন শুনে বুকে জ্বালা ধরেছিল, সেদিন এরই অযৌক্তিক কথা শুনে মনে ক্ষোভ হয়েছিল আর আজ ওর অকৃপণ সরলতা দেখে হৃদয়ে ওর প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হল। ওকে এভাবে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল। তাই বললাম, "পরিমলকে ডাক"। ও গিয়ে ভাইকে ডেকে আনল, আমি পড়ানো শুরু করলাম। এরপর যখন পড়াতে যেতাম প্রতিদিনই দেখতাম রীতা বই খাতা নিয়ে বসে আছে। আমি পৌঁছালে ভাইকে ডেকে আনত এবং নানা বিষয়ের পড়া দেখানো নিয়ে যতক্ষণ পারতো আমাকে আটকে রাখত। যখন পড়ার কোন কিছু আর জিজ্ঞেস করার না থাকত এমন সাধারণ কোন প্রশ্ন করত, তাতে ধর্ম বিজ্ঞান, ইতিহাস কিছুই বাদ যেত না। ফলে ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। একদিন পরিমল এসে বসতেই রীতা ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। ভাই অনুমানের ভঙ্গিতে দিদির মুখের দিকে চাইল। দিদি একটু হাসি হেসে বলল, "বলব ?" ভাই দিদির দিকে করুণ দৃষ্টি ফেরালো, দিদি কিন্তু ভাইয়ের প্রতি করুণা দেখানোর কোন প্রয়োজন মনে করল না। আমার দিকে চেয়ে বলল, "জানেন ?" ভাই এমন মৃদুস্বরে বলে উঠল, "দিদি" রীতা কিছুতেই ওর কথা শুনল না। ও হাসতে হাসতে বলল, "জানেন ভাই না কি বোকা... ! সকালে ভাইকে ডেকে তুলতে গিয়েছি। ও বলে কিনা—আমি ঘুমিয়ে আছি।" কথা শেষ হতে না হতেই রীতা হাসিতে ফেটে পড়ল। পরিমলও মুখ নীচু করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। বুঝলাম জেগে থেকেও পরিমল পড়ার ভয়ে ঘুমিয়ে আছি বলেছে। ঘুমিয়ে থাকলে যে কথা বলা যায় না এটাই সে খেয়াল করে নি, আর এই অসঙ্গতিটাই রীতার হাসির কারণ, হাসি থামিয়ে ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে কখনও হাসতে দেখি না, আপনি হাসেন না কেন ? এ প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। তবুও বললাম, "হাসার ক্ষমতা তো সকলের

সমান নয়, আমি হাসতে পারি না।" "আপনি কোনদিন হাসেন নি ?" ও জানতে চাইল। বললাম, "হেসেছি !"

"এখন হাসেন না কেন ?"

"আমি হাসতে পারি না বলে।"

"তার মানে ?"

"মানে তুমি এখন বুঝবে না।"

"কখন বুঝব ?"

"বুঝবেই তা আমি বলতে পারি না, তবে অভিজ্ঞতা বাড়লে বুঝলেও বুঝতে পার" রীতা এর অর্থ কি বুঝল জানি না। তবে ঠিক বুঝল বলে মনে হল না। কিন্তু ও চুপ করে গেল। আমিও পড়াতে লাগলাম, আরেক দিন আলোচনা শুরু হল ধর্ম এবং বিয়ে নিয়ে, "আপনি তো বলেন, যে ধর্মের ফারাকটা কোন ব্যাপারই নয়। তাহলে আপনি অন্য ধর্মাবলম্বী কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন ?" রীতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে প্রশ্নটা আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু কোন উত্তর না দিলে ওটাকে আমার দুর্বলতা ভাববে। কাজেই উত্তর দিতে হল, "আমি কোনদিন বিয়ে করব কিনা বলতে পারছি না, তবে যদি করি তবে ধর্ম আমার বিয়েতে কোন শর্ত হবে না।" ও এর কোন প্রতিবাদ করল না। আমি পড়াতে লাগলাম। পড়ানো শেষ হলে রীতা বলল, "যাবেন কি করে ? বৃষ্টি পড়ছে যে !" খেয়াল হল ছাতা আনা হয় নি, ও আবার বলল, "একটু অপেক্ষা করে যান, বৃষ্টিটা থামুক।". কিন্তু কি করে অপেক্ষা করি ? ডব্লিউ. বি. সি. এস. পরীক্ষায় বসার জন্য ফর্ম ফিলাপ করেছি। তারপরই তো অসুখে পড়লাম। শরীরটা এখনও সারেনি। তার উপর সকালে কলেজ, সন্ধ্যায় টিউটোরিয়ালে, দুদিন এখানে। কাজেই প্রস্তুতির ঘরে শূন্য। তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে তবুও একটু কিছু দেখা যাবে। বললাম, "না গো, অপেক্ষা করা যাবে না, বৃষ্টি তো তেমন হচ্ছে না। আমি ঠিক চলে যাব। "কিন্তু আপনার শরীর তো ভীষণ দুর্বল, একটু ভিজলেই আবার অসুখে পড়বেন, একটু দাঁড়ান।" এই বলে রীতা বাড়ীর ভিতর চলে গেল এবং একটা ছাতা নিয়ে এল, বলল, "এটা নিয়ে যান" "কিন্তু আমি তো মঙ্গলবারের আগে আসব না।" আমি সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম। ও বলল, 'তাতে কি হয়েছে।" আমি বললাম, "তোমাকে তো কাল সকালেই কলেজ যেতে হবে।" "সে আমি দেখব, বাড়ীতে আরও ছাতা আছে।" ও উত্তর দিল, অগত্যা আমি ছাতা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম, ও দরজার কাছে এসে অকারণেই দাঁড়িয়ে থাকল।

দেখতে দেখতে পরীক্ষার সময় এসে গেল। পরিমলের পরীক্ষা আগে শেষ হয়ে যাওয়ায় ও মামার বাড়ী বেড়াতে চলে গেল। কিন্তু রীতার কলেজে পরীক্ষার তখনও দেরী ছিল। কাজেই ও একাই পড়তে লাগল। সেদিন আমি গিয়ে পড়াতে বসেছি। কমলবাবু এসে বললেন, "রীতু আমাদের কমিটির একটা মিটিং আছে। এই নটার মধ্যে চলে আসব।" রীতা ওদিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল, "আচ্ছা" তারপর আবার পড়তে লাগল। পড়া শেষ হলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। রীতা বলল, 'বাবা এখনও ফেরেন নি। আপনি চলে গেলে আমার একা ভীষণ ভয় করবে।"

"কেন তোমার মা আছেন তো।"

"মা তো ভায়ের সাথে মামার বাড়ী গেছেন।"

"আচ্ছা কিন্তু তোমার বাবা...."

হঠাৎ বিদ্যুত চলে গেল। এরকম অবশ্য প্রায়ই হয়। কাজেই টেবিল ল্যাম্পটা হাতের

কাছেই রাখা ছিল। আমি ড্রয়ার থেকে দেশলাইটা বের করে জ্বালালাম, রীতা কাঁচটা খুলল। ল্যাম্পের আলোতে দেখলাম নটা হয়ে গেছে। এত রাতে একাকী ওর সঙ্গে বসে থাকতেও ইচ্ছে করছিল না। আবার ওকে একা রেখে আসতেও পারলাম না। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসতে হল। টেবিলের দুধারে দুটি চেয়ারে দুজনে মুখোমুখি বসে আছি। মাঝে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। রীতা আমার মা-বাবা,ভাই-বোন, অতীত জীবন ইত্যাদি নানা বিষয়ে টুকরো টুকরো প্রশ্ন করছে কখনও বা নিজের কথা বলছে। আমি একবার কমলবাবুর আশায় রাস্তার দিকে তাকাচ্ছি আর একবার এত রাত করে ফিরলে সুশীলদা কেমন চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করবেন সেই কথা ভাবছি। এমনি করে করে রাত যখন সাড়ে দশটা হল তখন কমলবাবু ফিরলেন। তিনি ফিরেই বলে উঠলেন, "বকুল তাহলে আছ" আমি কিছু বলার আগে রীতা উত্তর দিল, "তুমি না ফিরলে উনি যাবেন কি করে ?" তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "এত দেরী হয়ে যাবে আমি ভাবিনি ; নাহলে....." নাহলে কি হত তা শুনে আমার কোন লাভ ছিল না। কারণ যা হয়েছে তাতে কি হবে আমি এখন সেটাই ভাবছি। অতএব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম এবং দ্রুতগতিতে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হল না। এসে দেখি মেসের গেটের তালা বন্ধ। সঙ্কোচের মাঝেই কড়া নাড়লাম। কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। সুশীলদার নাম ধরে ডাকলাম। কোনও ফল হল না। আশেপাশে এবং নীচের তলার বাড়ীতে সকলেই ঘুমোচ্ছে, তাই চীৎকার করতেও পারছি নে। সিঁড়িতেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। অপমানে ক্ষোভে দুঃখে দিশেহারা হয়ে পড়লাম. কি করা যায়। সবে কদিন হল এ মেসে উঠেছি। কোন সীট খালি না থাকলেও নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও বলতে গেলে অনুগ্রহ করেই সুশীলদা একটু জায়গা দিয়েছেন। সেই সুযোগ নিয়ে এত রাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে সঙ্কোচ হতে লাগল। অথচ বাইরে যে কারও কাছে গিয়ে উঠব সে সুযোগও নেই। একবার ভাবলাম সিঁড়িতেই শুয়ে থাকব। কিন্তু রাতে কেউ দেখলে ভারী লজ্জাকর ব্যাপার হবে। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। হ্যাঁ স্টেশনে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় দুমাইল পথ। শরীরও ক্লান্ত। কিছুতেই পা চলতে চায় না, খিদেও পেয়েছে। কিন্তু পকেট তো গড়ের মাঠ। অতএব রাতটা না খেয়েই কাটাতে হবে। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে মাঝে মাঝে উপোস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। স্টেশনে এসে যখন পৌঁছুলাম তখন রাত একটা বেজে গেছে, রাতে কোন গাড়ী নেই বলে কাউন্টার বন্ধ। যাত্রী কাউকে প্ল্যাটফর্মে দেখলাম না, শুধু কয়েজন ভিখারী এবং কুলি ঘুমুচ্ছে। একটা বেঞ্চের উপর বসলাম। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছারপোকায় যা কামড়াতে শুরু করল তাতে বসে থাকা আর সম্ভব হল না। কাজেই উঠে পায়চারী করতে লাগলাম। ঘুমে চোখ বুজে আসে, ক্লান্তিতে অবসাদে শরীর লুটিয়ে পড়ে, ক্ষোভে গা রিরি করে। কিন্তু কিছু করার নেই। এমনি করতে করতে যখন সাড়ে চারটে বাজল তখন সকাল বেলাকার প্রথম ট্রেনের জন্য ঘণ্টা পড়ল, আমি মেসের দিকে রওনা হলাম। মেসে ঢুকতেই সুশীলদার সঙ্গে দেখা, তিনি তো আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করে বসলেন, "কি ব্যাপার ? রাতটা কাটালে কোথায় ?" আমি কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময়ে অবিনাশবাবু এসে পড়ায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। এদিকে আমার ডব্লিউ. বি. সি. এস. পরীক্ষার তারিখও নিকটবর্তী হচ্ছিল। সময়ের খুব দরকার। কাজেই কমলবাবুকে বলে দিলাম যে আমার পক্ষে আর পড়ানো সম্ভব নয়। কমলবাবু বললেন, "অন্ততঃ একদিন এসো।" আমি আমার অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিলাম। আরও জানালাম যে আমি যে পরীক্ষা দিয়েছিলাম তাতে সিলেক্টেড হয়েছি, কাজেই দুদিন পরে তো যেতেই হবে।

দুদিন না হলেও দুমাস পরে আমি রাইটার্সে জয়েন করলাম মাসখানেক পরেই ডব্লিউ. বি. সি. এস. পরীক্ষার রেজাল্ট বের হল। আমি এ. আর. সি. এস. হিসেবে জয়েন করলাম নিউ সেক্রেটারিয়েটে। ওখান থেকে কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়ী এলাম। বাড়ী থেকে একদিন কলেজ বেড়াতে গেলাম। এবং সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে সুশীলদার সঙ্গে দেখা করার জন্য কলেজ থেকে বেরুচ্ছি পেছন থেকে কে যেন ডাকল। ফিরে দেখি রীতা। জানলাম ও এই কলেজে ভর্তি হয়েছে। প্রাথমিক খবরাখবরে পর ও ওদের বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। আমি বললাম, "যেতে পারি ; তবে একটা শর্তে— !"

"বলুন কি শর্ত ?"

"গান শোনাতে হবে।"

"আমি কি কখনও বলেছি যে আপনাকে গান শোনাব না ? বরং আপনিই.... !" ও বলতে গিয়েও আর কিছু বললনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম "বরং আমি কি ?" "এখন বলব না।" আমি অনেক পীড়াপীড়ি করলাম। কিন্তু ও কিছুতেই বলল না। আমি ওকে গানের ব্যাপারে কোনদিন কিছু বলেছি বলে মনে হল না। বরং ও যে নাচ বা গান জানে একথা আমি জানি এরকম ভাবও কোনদিন কোন প্রসঙ্গে এর আগে কখনও প্রকাশ করিনি। কাজেই 'বরং আমি কি তা জানার জন্য দারুণ কৌতূহল হল। বিকেলের দিকে ওদের বাড়ী যাওয়ার কথা দিয়ে আমি সুশীলদার কাছে চললাম।

ইচ্ছে ছিল সুশীলদার সঙ্গে দেখা করে বাড়ী ফিরব। কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। তখন কমলবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘণ্টাখানেক সময় নিয়ে রীতাদের বাড়ীতে এলাম। রীতা এসে দরজা খুলে দিল। দেখি হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি রেডি হয়েই আছে। পাশে একটি তানপুরাও সেটাকে আমি একদিন গীটার বলে ভুল করেছিলাম। আমি কমলবাবুকে ডাকিয়ে নিলাম।

কমলবাবু এসে আমার যাবতীয় খবর নিয়ে পড়লেন, মাঝে নিজের এবং ছেলেমেয়েদের খবর দিলেন। সারাক্ষণ রীতা একটা চেয়ারে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের কথা শেষ হলে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল মাত্র। মুখে কিছু বলল না। আমি বললাম, "তুমি তো ভাল গাও শুনেছি, তা দুয়েকটা গান শোনাও।" ও মুখে কিছু না বলেই হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসল। কমলবাবু সঙ্গতের জন্য পরিমলকে ডাকলেন, কিন্তু রীতা কিছুতেই রাজী হল না। বলল, "একদিনও প্র্যাকটিস করবে না। উল্টো-পাল্টা বাজাবে। তার চেয়ে বাজাতে হবে না, অগত্যা পরিমলকে নিবৃত্ত হতে হল। ও একাই গান গাইতে লাগল। প্রথম গানটির কথাগুলো আজ আর আমার মনে নেই। তবে ভাবটুকু মনে আছে। ফুলে ফুলে ঢাকা বনপথে একাকী রয়েছিলাম, হঠাৎ তোমার সাথে দেখা হল—এরকম একটা ভাব। আমার বেশ ভাল লেগেছিল। দ্বিতীয় গানটি ছিল একটি নজরুল গীতি "আমি যার নূপুরের ছন্দ" তৃতীয়টি রবীন্দ্রসঙ্গীত, "আমার পরান যাহা চায়"। হিসাবে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, ভজন ইত্যাদি সব মিলিয়ে আট দশখানা গান শুনলাম। শেষ গানটি ছিল "আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।" গান শেষ হলে আমি বললাম, "তুমি তো বেশ ভালই গাও।" ও চুপ করে থাকল— কিছু বলল না। আমি কমলবাবুকে বলে চলে আসার জন্য তৈরী হলাম। রীতা দরজার কাছে এসে বলল, "আবার আসবেন" ছোট্ট করে উত্তর দিলাম, "আসবো" তারপর চলতে শুরু করলাম।

* * * *

রীতাকে 'আসবো' বলেছিলাম বটে, কিন্তু বিভিন্ন কাজের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ায়

অনেকদিন আর যাওয়া হয়নি। হঠাৎ মার অসুখের খবর পেয়ে বাড়ী গেলাম। দেখলাম অসুখটা তেমন কিছু গুরুতর নয়। আমাকে বাড়ী আনার জন্যই টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। তাই বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে নিতে পারলাম, একদিন কলেজেও গেলাম। প্রিন্সিপ্যালের ঘর থেকে বের হচ্ছি, রীতা ওর আরও দুজন বান্ধবীর সঙ্গে ওদিক থেকে আসছে। আমাকে দেখে ও এদিকে এগিয়ে এল, আমার কাছে এসে ও আমার সবরকম খবর নিল। তারপর আমি বাড়ী ফিরতে উদ্যত জেনে বলল, "খুব অসুবিধে না হলে একটু অপেক্ষা করুন, আমার এই ক্লাসটা হয়ে গেলে আর কোন ক্লাস নেই। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার আছে।" আমি বললাম, "যা বলার আছে এখনই বল না।" ও বলল, "এত তাড়াতাড়ি বলা যাবে না, একটু থাকুন," এই বলে ও ক্লাসে চলে গেল, আমি অগত্যা বিনয়দার কাছে গিয়ে বসলাম। কিন্তু মুশকিল হল ওর ক্লাস শেষ হলেও বিনয়দার কথা শেষ হল না। উঠতে গেলেই বিনয়দা জোর করে বসায়। এই করে ক্লাসের পরও মিনিট পনের গেল। এখন আর দেরী করলে যে বাড়ি ফিরতে আমার অনেক রাত হয়ে যাবে এ ব্যাপারটা বিনয়দাকে বুঝিয়ে বলতে হল। এবার ছাড়া পেলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি রীতা গেটের কাছে ইউক্যালিপটাস গাছটির নীচে একা দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছাকাছি আসতেই ও আমার সঙ্গে চলতে লাগল। কিন্তু কোন কথা বলল না। কিছুদূর এসে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বল তোমার কি কথা আছে।" ও কিছু বলতে গেল, কিন্তু বলতে পারল না। এই করে আস্তে এগিয়ে গেলাম, ও তখন আস্তে করে কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করল, "আপনাকে যদি চিঠি লিখি তাহলে কি আপনি কিছু মনে করবেন ?" আমি উত্তর দিলাম, "তুমি চিঠি লিখবে তো এতে মনে করার কি আছে ?" "উত্তর দেবেন তো ?" ও জানতে চাইল। আমি বললাম, 'আমাকে চিঠি লিখে তো এখনও পর্যন্ত কেউ উত্তর না পাওয়ার অভিযোগ করেনি, তুমি লিখেই দেখনা।' অর্থাৎ উত্তর দেব, কিন্তু তখন জানতাম না যে ওর চিঠির সত্যিই কোন উত্তর দিতে পারব না।

সোমবারে এসে অফিসে জয়েন করেছি। শুক্রবারই দেখি প্রেরকের ঠিকানাহীন, ডাকটিকিট হীন একটি চিঠি এসে উপস্থিত। খুলে দেখি চিঠিটি সম্বোধনহীনও বটে। রীতা লিখেছে,

"আজ আমার অনেক দিনের একটা আশা পূরণ হল। আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে আপনাকে কোনদিন চিঠি লিখতে পারব। তাই আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা আপনাকে বোঝাতে পারব না।

আপনি যখন আমাদের পড়ানো ছেড়ে দিলেন তখন আমার প্রচণ্ড খারাপ লাগত। বেশ কিছুদিন ধরে আমার কোন কিছু পড়াই হোত না। আপনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন জানতে খুবই ইচ্ছে করত। কিন্তু কি করে আপনার খবর পাব ? লজ্জায় কাউকে কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। জানি আর কারও সঙ্গে না হোক সুশীলবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ আছেই। তাই সুশীলবাবুর বাড়ী একদিন গিয়েছিলামও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরোক্ষভাবেও কিছু জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারি নি। কেন জানিনা ভারী লজ্জা করছিল। তারপর হঠাৎ আপনার সাথে কলেজে দেখা, তারপর আমার কথা রেখে আপনি আমাদের বাড়ীও এসেছিলেন, আপনি গান শুনে চলে গেলেন। কিন্তু আমার যে কি কষ্ট হয়েছিল তা আপনাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না। সারারাত ঘুমোতে পারি নি। শুধুই আপনার কথা মনে হয়েছে। বারবার সন্দেহ হয়েছে আমার গান আপনার ভাল লেগেছে কিনা ! মনে হয়েছে ও গানটা না গেয়ে সেই গানটা গাইলে বোধহয় ভাল হত।

আপনি জানেন কিনা জানি না যে আমি অনেক দিন থেকে আপনাকে ভালবাসি। সেই সেদিন থেকে যেদিন অবিবেচকের মত একটা মন্তব্য করে আপনার মনে আঘাত দিয়েছিলাম।

আর তাই আমার সমস্ত সত্বা দিয়ে আপনাকে আমার সারা জীবনের সাথী হিসেবে কামনা করি। জানি, মা বাবা একথা জানলে বলবেন, এমন মেয়ের মরাই ভাল। শুধু জানি না আপনি কি বলবেন ?

এই চিঠি না লিখতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু নিজের কাছে এমনভাবে ধরা পড়ে গেছি যে আমার সবকিছু নিয়ে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ না করলে আমার স্বস্তি নেই। তাই আপনাকে লিখতে বাধ্য হলাম। যদি এটাকে অন্যায় মনে করেন তবে নিজগুণে ক্ষমা করবেন। ইতি—

আপনারই
রীতা।"

অতীতে রীতার সব ব্যবহারগুলোই যেন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল—বিভিন্ন অজুহাতে যতক্ষণ সম্ভব আমাকে আটকে রাখা, আমার আসার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা, আমার পথ চেয়ে বসে থাকা, গান শোনানো, চিঠি লেখার অনুমতি চাওয়া ইত্যাদি। জীবনে এই প্রথম জানলাম একটি মেয়ে আমাকে ভালবাসে। রক্তে একটা শিহরণ অনুভব করলাম। যার নূপুরের ধ্বনি একদিন বুকে জ্বালা ধরিয়েছিল তার হৃদয়ের স্পর্শ যদি আজ সেই বুকে দোলা দেয় সে তো আমার সৌভাগ্য ! কিন্তু আমি হতভাগা সেরকম কপাল করে আসিনি। তাই ভাবের জোয়ারে ভাসতে পারলাম না। বরং ভাবতে বসলাম যে আমার যা মনোভাব তাতে ওর বাবা মার অজান্তে লুকিয়ে ওকে পাওয়ার কোন কথাই ওঠে না। আর কমলবাবুকে যতদূর জানি তিনি এতে কিছুতেই রাজী হবেন না। তাই চিন্তা হল ওর কি দশা হবে। এসব ভাবছি। দিন দুয়েক পরে আবার একটি চিঠি এল। লিখেছে,

"আপনাকে চিঠি লেখার পর থেকে আমি একদম স্থির থাকতে পারছি না। আমার চিঠি আপনি পেয়েছেন কিনা এবং পেলে আমার সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন তা জানার জন্য আমি প্রচণ্ড অস্থির হয়ে পড়েছি। ইতি—

আপনারই
রীতা।"

এবার চিঠি পেয়ে বুঝলাম ওর অবস্থা খুবই খারাপ। আর যেহেতু বর্তমান পবিস্থিতিতে ওর সঙ্গে নূতন কোন সম্পর্ক সম্ভব নয় সেইহেতু ওর ভালোর জন্যই ওর সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা করা দরকার। অফিসে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে রওনা হয়ে গেলাম।

কলেজেই গেলাম। অফিসের সামনেই রীতার সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু ও আমার দিকে তাকালই না। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। আমিও আগের মত অত সহজভাবে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না। শুধু বললাম, "তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

"কিন্তু আমার যে এক্ষুনি ক্লাস শুরু হবে।"

"তোমার ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করছি। তুমি ক্লাস করে নাও।" ও ক্লাসে গেল। আমি বিনয়দার কাছে এসে বসলাম। ওদের ক্লাস শেষ হলে কলেজ থেকে বেরুলাম। রীতা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কিন্তু কোন কথা নেই। আমারও কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল এই ভেবে যে ও আমাকে ভালবাসে। কেমন অন্যরকম মনে হচ্ছিল। তাই যা বলব বলে ভেবে রেখেছিলাম তা বলা হল না। অনেক যত্ন করে কথাগুলো এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছিলাম যে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা বলা হবে। অথচ শুনতেও খারাপ লাগবে না। কিন্তু কিছুই রেখে ঢেকে বলা হল না। শুধু এইটুকু বললাম, "তুমি আমাকে নিয়ে আর ভেবো না। কারণ তুমি যা ভাবছ তা সম্ভব নয়, তুমি এরপর আমাকে চিঠি লিখলে লিখবে

যে ভালভাবে পড়াশোনা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছ। আর কিছুই বললাম না। নীরবেই চলতে লাগল। বুকভরা ব্যথা নিয়ে ও নীরবেই বিদায় নিল। আমি আমার কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলাম। দিন সাতেক পরে ওর কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত চিঠি পেলাম—"ভালভাবে পড়াশোনা করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু আপনাকে ভুলে যাব এ প্রতিজ্ঞা করতে পারলাম না।" এরপর থেকে মাঝে মাঝেই রীতার চিঠি পেতাম, আর প্রতিবারই নিজেকে বড় বিপন্ন মনে করতাম। আমার জন্য একটি সরল সুন্দর নির্দোষ মেয়ে কষ্ট পাচ্ছে এটা ভেবে নিজেকে দোষী মনে হত। আবার কমলবাবু অনেক বিশ্বাস করেই তাঁর ছেলে মেয়েকে পড়াতে নিযুক্ত করেছিলেন। রীতা যখন একাই পড়ত তখনও তিনি কোন খোঁজ খবর নিতেন না—এমন কি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময়ও না, সেই বিশ্বাসের সুযোগে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে তাঁর মতের বিরুদ্ধে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করার কথাও ভাবতে পারি না। কাজেই 'ভালভাবে পড়াশোনা কর' বা এই জাতীয় দুয়েকটা উপদেশমূলক বাক্য দিয়ে কোন চিঠির উত্তর দিতাম আবার কোনটার উত্তর দেওয়াই হত না।

এমনি করে বছর তিনেক গেল ! আমি সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে আই. পি. এস.-এ জয়েন করলাম। নাগপুর, হায়দ্রাবাদ, মুসৌরী থানে ট্রেনিং শেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ফিরলাম, এখন ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজে আছি। জেলায় জয়েন করার আগে একবার বাড়ী গেলাম। মা একটা খোলা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "বুঝতে পারিনি। ভুল করে খুলে ফেলেছি।" দেখলাম রীতার চিঠি। লিখেছে,

"জানি এ চিঠি পেয়ে আপনি আমাকে কিরকম নির্লজ্জ ভাববেন। তবুও লিখছি। বাবা আমার বিয়ে মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছেন। আমার আপত্তি শোনাব কোন প্রয়োজন মনে করেননি। আমি বিয়ে করব না। কাজেই বাবার বাড়ীতে থাকা আমার শেষ। আচ্ছা, আমি যদি আপনার বাড়ীতেই গিয়ে উঠি তাহলে কি ফিরিয়ে দেবেন ? আপনি কোথায় আছেন না জানায় বাড়ীর ঠিকানায় লিখলাম। ইতি—

রীতা।"

আমি অনেক আগেই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কাজেই কিছু কষ্ট হলেও ফিরে এসে লিখলাম।

"রীতা,—

তোমার চিঠি খোলা অবস্থায় মার হাত থেকে পেলাম। তোমার মা বাবার অমতে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। কাজেই যে বিয়ে ঠিক হয়েছে তাতে তুমি রাজী হয়ে যেতে পার। তুমি আমাকে ভুলে যেও। পার তো ঘৃণা কোরো, তাতে খানিকটা স্বস্তি পাবে। ইতি—

বকুল।"

তারপর মাসখানেক কেটে গেছে। আমি জেলায় চলে এসেছি। হঠাৎ বাবার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম—"আর্জেন্ট নেসেসিটি, কাম সার্প।" আমি তো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। কিছুদিন মার শরীর খারাপ চলছিল। কিছু হয়ে গেল নাকি ? না গ্রামে দুই দলে গণ্ডগোল হল ? যাই হোক যেতেই হবে। একদিনের 'পি. এল.' নিয়ে বাড়ী রওনা হয়ে গেলাম। বাসের থেকে নেমে সোজা বাড়ী রওনা হলাম। বাড়ী পৌঁছতেই রীতা এসে প্রণাম করল এবং কিছু না বলেই মার কাছে চলে গেল। জানলাম ওর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। আজ আশীর্বাদের দিন ছিল। কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ী চলে এসেছে। খবর পেয়ে কমলবাবু সুশীলদাকে সঙ্গে করে এসেছিলেন। কিন্তু রীতা যায়নি। বাবা কি করবেন কিছু ঠিক না করতে পেরে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি পৌঁছানোর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কমলবাবু আবার এসে

পড়লেন। আমি রীতাকে ওর বাবার সঙ্গে যাবার জন্য বোঝালাম। কিন্তু কোন কাজ হল না। ও অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলল, "আপনার বাড়ীতে রয়েছি, তাড়িয়ে দিতে চান, দিন। তারপর কি করব সেটা আমিই ঠিক করব। কমলবাবু আসার পর থেকে কোন কথাই বলেননি। আমিই বললাম, "স্যার আমাকে কয়েক ঘণ্টা সময় দিন ; রীতাকে আমি আপনার বাড়ী পৌঁছে দেব।" কমলবাবু চোখের জল মুছে চলে গেলেন। আমি অনেক কষ্টে রীতাকে বাড়ী যেতে রাজী করলাম। কিন্তু মার কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে ও কেঁদে ফেলল। তারপর সারাটা রাস্তা শুধু আমাকে অনুসরণ করল, একটি কথাও বলল না। সন্ধ্যার সময় ওদের বাড়ী পৌঁছুলাম। দেখি ওর মামাতো দাদা ইত্যাদি অনেক আত্মীয়স্বজন বৈঠকখানায় বসে আছেন। আমাদের দেখে কেউ কোন কথা বলল না। শুধু দেখলাম রীতার মুখটা অসম্ভব রকমের ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সেও কিছু বলল না। আমিও ওকে কিছু বলতে পারলাম না। শুধু কমলবাবুকে আস্তে করে বললাম, "রীতা রইল, আমি চললাম।" কমলবাবুর চোখে আবার জল এসে গেল।

আমি বাড়ী হয়ে নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলাম। কিছুদিন পর কমলবাবুর চিঠি পেলাম, "তুমি ইচ্ছে করলে রীতাকে বিয়ে করতে পার। আমার কোন আপত্তি নেই।" আমি আমার সম্মতি জানিয়ে রীতাকে চিঠি লিখলাম। কিন্তু তার কোন উত্তর পেলাম না। সপ্তাহখানেক পর ওর সঙ্গে দেখা করব ভাবছি। হঠাৎ খবর পেলাম রীতা বাড়ী থেকে কোথায় চলে গেছে। আর তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

এদিন-সেদিন

ঘুম ভাঙতেই দেখি, ভাইপো-ভাইঝিরা পড়তে বসেছে। বছব পঁচিশ আগে আমিও বসতাম। সেদিনকার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সকালে উঠেছি। শীত করছে। চাদর নেই। 'ডাঁপে ?' ঝোলানো বাবার লুঙিটা জড়িয় নিয়েছি।

'ছোট্‌বাবজি' পাটকাঠি ধরিয়ে আগুন জ্বেলেছে। 'বাবজি' গবুর নান্দে শানি মেখে দিয়ে আগুনের কাছে বসল। একটু পরেই গবুর কাঁধে জোয়াল দিয়ে 'নাঙোল' ঘাড়ে করে মাঠে রওনা হবে।

আমারও ইচ্ছে করছে, একটু আগুনের কাছে বসি। কিন্তু অনেক পড়া বাকি।

এক্ষুনি সূর্য উঠে পড়বে। উপরের দিকে উঠতেই থাকবে। ঘরের 'ছ্যামা' বেড়ার কাছ থেকে 'ছোঞ্চের' দিকে এগিয়ে আসবে। 'ধারির' ওপর আসার আগেই স্কুলে রওনা হতে হবে। তারও আগে মাঠে 'বাবজির' কাছে 'পানি-খাবার' দিয়ে গবুর জন্যে ঘাস কেটে নিয়ে আসতে হবে।

বই খুলে পড়তে বসলাম। পরমাণুর গঠন পড়ছি। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যার ওপরই পদার্থের ধর্ম নির্ভর করে। লোহার পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা সোনার পরমাণুর সমান করে দিলে লোহা সোনা হয়ে যাবে। করাটাই মুশকিল। বড় হয়ে গবেষণার দ্বারা আমি এ মুশকিলের আসান করব। তখন আর ক্ষ্যাপাকে পরশ-পাথর খুঁজে বেড়াতে হবে না।

আর দেরি করা চলে না। উঠে দাড়িতে সাবান ঘষতে লাগলাম।

বিরহি হাই স্কুলের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে হেডমাস্টার মশায় আমাকে আসতে অনুরোধ করেছেন। একদিকে কাজের চাপ, অন্যদিকে পুরনো টান। শেষ পর্যন্ত স্কুলের টানই জয়ী হয়েছে। দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে চলে এসেছি।

স্নান-খাওয়া করে রওনা হলাম।

ছাগলখালি বিলের ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমার গায়ে যেন ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড় নেই। সোডা দিয়ে সিদ্ধ করে কাচা একটা হাফশার্ট আছে। আর একটা হাফ-প্যান্ট। খালি পা। পকেটে সস্তা কালি ভরা 'রাইটার' পেন। বাঁ হাতে বই-খাতা।

পলাশতলীর মোড়টাতে আসতে স্নেহসিক্তা বই-খাতা নিয়ে বেরিয়ে এল। একই সঙ্গে পড়ি। একই সঙ্গে পলাশতলী প্রাইমারী স্কুল থেকে ফোর পাশ করেছি।

স্নেহসিক্তা পড়াশোনায় ভাল। তাই প্রাইমারী স্কুল থেকেই ভাব হয়ে গেছে।

স্নেহসিক্তা জিজ্ঞেস করল, "তুই বড় হয়ে কী করবি রে ?"

"বড় বৈজ্ঞানিক হব।"

"বৈজ্ঞানিক হয়ে কী করবি ?"

"লোহাকে সোনা করব।"

স্নেহসিক্তা হেসে উঠল।

তার হাসির দমকে আমার চমক ভাঙল। চেয়ে দেখি, সেই নদীর ধারের রাস্তা দিয়েই চলেছি বটে। কিন্তু সঙ্গে স্নেহসিক্তা নেই। হাঁটতে থাকলাম।

গেটের কাছে আসতে দেখলাম, পুরনো বন্ধুদের অনেকেই ইতিমধ্যে এসে গেছে। প্রকাশ, সুশান্ত, শমসের, অনিমা, আনন্দ, সুলতানা সেগুন গাছটার নীচে জটলা করছে। সিনিয়রদের মধ্যে আমানুল্লা, মজিদ অরা মধুমঙ্গলদা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। জুনিয়রদের মধ্যে উদয়, কল্পনা, কবির এগিয়ে এল। সিনিয়র শ্যামলদা বললেন, "তোকে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে।" আমি কিছু বলবার আগেই সুশান্ত এগিয়ে এল, "আমাদের ব্যাচের পক্ষ থেকে যা বলার তু-ই বলবি। বক্তৃতা তো তুই ভালই করতিস।"

হ্যাঁ, পলাশতলী প্রাইমারী স্কুলে অমর মাস্টার আরও অনেক কিছুর সঙ্গে বক্তৃতাটাও ভালই শিখিয়েছিলেন। তাঁর শেখাবার ধরনটাই ছিল চমৎকার। খেলার ছলে, আলাপ-আলোচনায়, কথাবার্তায় তিনি এমন সাবলীলভাবে শিখিয়ে দিতেন যে আমরা বুঝতেই পারতাম না, আমাদের কিছু শেখানো হচ্ছে।

শনিবার শনিবার সাপ্তাহিক আসর বসত। কেউ গান শোনাত, কেউ আবৃত্তি, কেউ গল্প বলত, কেউ বা বক্তৃতা।

ফলে ফাইভে ভর্তি হয়েই নেতাজীর জন্মদিনে বক্তৃতা করেছিলাম। পরবর্তী সাত-আট বছর সব অনুষ্ঠানেই করতাম। বন্ধুরা আজও সে কথা ভোলে নি। আমিও কি ভুলেছি ? না।

মনে হচ্ছে, এক্ষুনি ঘণ্টা পড়বে। আমরা সেকশান অনুসারে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ব। মেয়েরা দাঁড়াবে মাস্টার মশাইদের বাঁ পাশে। রমার মা ঘণ্টায় ঢং করে একটা 'বাড়ি' দিতেই আমরা 'জনগণমন অধিনায়ক...' গাইতে শুরু করব। তারপর 'জয় হিন্দ্' বলে ভারতবর্ষের জয়ধ্বনি দিয়ে ক্লাসে গিয়ে বসব।

ক্লাসের ছবিটা মানসপটে ফুটে উঠল।

ইন্দুবাবু কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছেন। ফার্স্ট বেঞ্চে বসে আছি। যে বেঞ্চে আরও কয়েকজন বসেছে। তবে আমার সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে। প্রথম দিকে আমার কিছু মনে হত না। এখন কষ্ট হয়।

আমার স্কুলের ড্রেস বলতে একটা হাফ-শার্ট, একটা পাজামা। রবিবার ছাড়া কাচা হয় না। কখনও কখনও বাড়িতে সোডা না থাকলে একটানা দু-তিন সপ্তাহ পরতে হয়। ঘাড়ের কাছে তেলচিটে পড়ে, গন্ধ করে। পায়ে জুতো নেই। একরাশ ধুলো। আর সকলের গায়ের জামা-কাপড় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, পায়ে জুতো বা চটি। কেউ কেউ সুগন্ধি তেলও মাখে। তারা কি করে আমার খুব কাছে বসে ?

আমি নাচ জানি না, গান জানি না, গ্যয়ঠে গ্রুস্ত বা জয়েস কে তাও জানি না। গতবার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'আধুনিক বাংলা উপন্যাস'। আমি সুকুমার সেন আর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই খুব ভালভাবে পড়ে লিখলাম। কিন্তু ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে পারলাম না। বরেন ফার্স্ট হল। আমি ওর প্রবন্ধটা চেয়ে দেখলাম। আমি যাঁদের কথা লিখেছি তাঁদের খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করে ও রমাপদ চৌধুরী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শৈবাল মিত্র প্রভৃতির কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রুস্ত জয়েসের কথাও লিখেছে। আমার আশ্চর্য লাগল, জিজ্ঞেস করলাম, "তুই কি করে জানলি রে এঁদের কথা ?"

"কেন ? আমাদের বাড়িতে যে কলকাতা থেকে পত্রিকা আসে।"

আসবেই তো। বরেনের বাবা আমাদের স্কুলেরই শিক্ষক। তাঁর বাড়িতে অনেক বইও আছে। বুঝলাম, বরেন যে প্রথম হয়েছে তার কারণ প্রবন্ধ লেখায় আমার থেকে বেশি

পারদর্শিতার জন্য নয়—যে তথ্য সে খুব সহজেই পেয়েছে তা আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা। প্রতিযোগী হিসেবে আমার অবস্থিতি অসুবিধাজনক।

অসুবিধাজনক অবস্থানের জন্যই আমি নাচ-গানও শিখতে পারিনি। স্বপন আর পরিমল গান জানে বলে সবাই সমীহ করে। ভোম্বল অবশ্য গান জানে না। বুদ্ধিতেও ভোম্বল দাসের মত নয়। কিন্তু থানার বড়বাবুর ছেলে। সবাই খাতির করে। ডলি এবারই ভর্তি হয়েছে। একে নাচ জানে তাতে আবার বি. ডি. ও. সাহেবের শালী। তাকে যে কোথায় রাখবে কেউ ভেবেই পায় না। আমি যদি নাচ বা গান জানতাম!

আমিও অবশ্য অনেক কিছু জানি যা এরা কেউ জানে না। আমি লাঙ্গল বইতে জানি, আগাছা নিড়াতে জানি, ঘাস কাটতে জানি, পাট কাটতে জানি, ধান লাগাতে জানি, ধান কাটতে জানি, ধান মাড়াতে জানি, পাট কাচতে জানি পাটকাটির জাফরি দিয়ে জমি ঘিরতে জানি। কিন্তু এখানে এগুলি জানার কোন গুরুত্ব নেই। এর জন্য আমি কৃতিত্ব দাবি করতে পারি না।

ডলিদের বাড়িতে নাচের চর্চা ছিল। সে নাচ শিখেছে। আমার বাড়িতে মাঠের কাজের চর্চা ছিল। আমি মাঠের কাজ শিখেছি। ডলি নাচ শেখার জন্য কৃতিত্ব পেলে আমি মাঠের কাজ শেখার জন্য পাবনা কেন?

টিফিনের ঘণ্টা পড়তে ভাবনার জাল ছিঁড়ল। ইন্দুবাবু বেরিয়ে গেলেন। আমরা বেরিয়ে লাইব্রেরীর সামনে জড়ো হলাম। বাৎসরিক অনুষ্ঠানের রিহার্সাল হবে।

আমি আবৃত্তি করছিলাম। দিদিমণি বললেন, "ওটা বক্ষ নয় রে, বোক্ষ।" আমি আবৃত্তি বন্ধ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। তিনি বললেন, 'ওটার উচ্চারণ ওরকমই হয়।"

আমার মনে হল, আবৃত্তির থেকে বিতর্কে বেশি জোর দিতে হবে। এবারের সভার মতে 'গ্রাম জীবন থেকে শহর জীবনই ভাল'। আমি গ্রামে থাকি, কিন্তু একটা শহরও চোখে দেখিনি। শহর জীবন কীরকম কিছুই জানিনে। একবার সনাতনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেল। ফিজিক্সের ক্লাস। আমরা এসে বেঞ্চে বসলাম। সরণ এলেন। আসল নাম অবশ্য সরন নয়। আমাদের প্রথম দিন সরণ পড়িয়েছিলেন। সেই থেকে বাসুদেব নাম দিল সরণ। সেই নামই প্রচলিত হয়ে গেল।

টেবিলের ওপর ডাস্টারটা রেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, "বলো তো, মরুভূমিতে মরীচিকার সৃষ্টি হয় কী করে? আনন্দ বল।"

আনন্দ উঠে দাঁড়াল। কোন কথা বলল না। প্রকাশের দিকে ইশারা করলেন। প্রকাশ উঠে সঙ্কট কোণ, অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন প্রভৃতি অনেক কথা বলল। সরন সন্তুষ্ট হলেন না। আমাকে ইঙ্গিত করলেন। আমি উঠে গুছিয়ে বললাম। আমাকে বসতে বললেন।

আমি খুশি মনে বসে পড়লাম। এই একটি ব্যাপারে আমার জিৎ। আমি ক্লাসের পড়া ভালভাবে করি। কোন প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর দিতে পারি। মাস্টার মশায়রা খুশি হন। সহপাঠীরা খাতির করে। একমাত্র এই জন্য আমার স্কুলে আসতে ভাল লাগে।

সাগরে কী করে মরীচিকার সৃষ্টি হয় সরন পড়াতে লাগলেন। আমি মন দিয়ে শুনছিলাম। বাংলার মাস্টার সুখময়বাবু এসে বললেন, "বকুল এসেছিস? ভাল আছিস বাবা?"

"হ্যাঁ স্যার, ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন স্যার?"

"হ্যাঁ বাবা, ভগবান ভালই রেখেছেন। তুই এখন কোথায় আছিস?"

"কলকাতায় স্যার।"

"কি হিসেবে?"

"এস. পি. হিসেবে স্যার।"

"খুব ভাল। সুখে থাক বাবা। আরও উন্নতি কর। এখন চল, ওদিকে চল।"

সুখময়বাবুর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের দিকে গেলাম। অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে। মঞ্চের কাছে হেডমাস্টার মশায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমাকে মঞ্চে নিয়ে বসালেন।

অনুষ্ঠান শুরু হল। এ অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের জন্য এ স্কুলের দানের কথা স্কুল সেক্রেটারী বর্ণনা করলেন।

আমি যে একটা মোটামুটি ভাল কাজ করছি তার পিছনেও এই স্কুলের দান অনেকখানি। এ স্কুল না থাকলে দূরে কোন স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করার ক্ষমতা আমার ছিল না। কলেজের পড়াশোনা আমার ঐ জন্যই হল না।

হায়ার সেকেন্ডারী পাস করে বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। সকালে পাঁচ কিলোমিটার পথ হেঁটে এসে বাস ধরতে হত। চল্লিশ কিলোমিটার বাসে গিয়ে বাসস্ট্যান্ড থেকে আবার দু কিলোমিটার হেঁটে কলেজ পৌঁছুতে হত। ফেরার পথে বাস ভাড়ার জন্য বিরহিতে নেমে প্রাইভেট পড়িয়ে বাড়ি ফিরতে এগারটা-বারোটা বেজে যেত।

সময় তো ছিলই না, বইও ছিল না। পয়সার অভাবে একটি বইও কিনতে পারি নি।

পড়াশোনা করার কিছু সুযোগ ছিল না। কলেজে বলতে গেলে কিছুই শিখতে পারিনি। শুধু ডিগ্রীটা পেয়েছিলাম। কোনরকমে পাস করেছিলাম। ভাল ছাত্রের সুনামটুকুও অক্ষুণ্ণ রাখতে পারিনি।

আমি জানতাম আমার স্কুলের পড়াশোনায় কোনরকম ফাঁকি ছিল না। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখলাম সেখানেও অনেক ফাঁক।

ভূগোলে আমি বরাবর ভাল নম্বর পেতাম। পঞ্চাশের মধ্যে আটচল্লিশ অনেকবার পেয়েছি। সব থেকে কম নম্বর চুয়াল্লিশ। ভাবতাম ভূগোলে আমি কী দারুণ! কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখলাম, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে কিছুই জানি না। স্কুলের সিলেবাসে ছিল, পড়ানো হয় নি।

এরকমভাবে অনেক কিছু সিলেবাসে থাকা সত্ত্বেও পড়ানো হয়নি। প্রত্যয় পড়ানো হয়নি, ণত্ব বিধান-ষত্ব বিধান পড়ানো হয়নি, বাইনোমিয়াল থিওরেম পড়ানো হয়নি, তড়িৎ চুম্বক পড়ানো হয়নি।

মাস্টার মশায়রা বলতেন, "এগুলি বাদ দিয়েও প্রশ্ন পাওয়া যায়।" হয় তো যায়। কিন্তু এগুলি থেকেও তুলনায় সহজ প্রশ্ন হতে পারে। তাছাড়া স্কুলের এই পরীক্ষার বাইরেও জীবনের নানা ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োজন আছে।

আচ্ছা এই কথাগুলি কি আজ বলব? মাস্টার মশায়দের অনেকেই উপস্থিত আছেন। আমাকে সম্মান করে মঞ্চে বসিয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধেই বলা কি ঠিক হবে? তাঁরা অনেক কিছু শিখিয়েছেনও তো! বলতে পারলাম না।

সকালের সভা শেষ হল। আমি বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি রওনা হলাম। ইতিমধ্যে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। পলাশতলী পিছনে ফেলে গ্রামের রাস্তায় পড়তেই জুতো খুলতে হল। প্যান্টও গোটাতে হল।

হাঁটুর ওপর প্যান্ট গুটিয়ে জুতো জোড়া হাতে করে কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে সন্তর্পণে হাঁটছি। ইসলাম চাচার কথায় চমক ভাঙল।

"কবে আলি রে বাপ? চাচাধের আর খবর লিস ন্যা! দ্যাখ ধিনি চাচারা কত কষ্টে আছে। একটা কলম যদি মার‍্যা দিস তাহলেই তো রাস্তাডা পাকা হয়ে যায়। তোর কলমডা

তো কেহু ফেলতে পারবে না।"

ইসলাম চাচার কথা শেষ না হতেই রসিদচাচা হাজির হল।

"তুই আস্যাছিস! তোর দিকেই তাকাছুনু রে বাপ! ইলেকটিরির আলোর লাগ্যা কার কাছেই না গেনু। কেহু কিছু কল্পনা রে বাপ। তুই এট্টু চেষ্টা কর। তুই চেষ্টা কল্লেই হবে।"

মুশকিল হচ্ছে এদের কিছুতেই বোঝাতে পারি নে যে আমি চেষ্টা করলেই সবকিছু হয়ে যায় না। হয় তো এদের বক্তব্যে কিছুটাও সত্য আছে। সেই জন্যই বোঝাতে পারি নে।

আমি আমার গ্রামের লোকদের সঙ্গে থাকলে অন্তত তাদের কথাটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারতাম। দেশভর যখন কর্মযজ্ঞ চলছে, যখন প্রতিটি গ্রামকে গমনযোগ্য রাস্তার সঙ্গে যুক্ত করার কর্মসূচী নেওয়া হযেছে, যখন প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস চলছে তখন তাদের দাবি তো কিছু অসঙ্গত নয়। তারা সেই অন্ধকারে। গ্রামে এখন পর্যন্ত একটা প্রাইমারী স্কুলও নেই। অ-আ শিখতেও ছেলেমেয়েদের যেতে হয় পাশের গ্রামে, হয পলাশতলী নয় ঝাউবোনা।

পলাশতলী প্রাইমারী স্কুলে সেই অমর মাস্টার আর নেই। এখন যারা আছে চাকরি করে। আর একবার চাকরি হয়ে গেলে বেতন পাকা। পড়ালেও চলে, না পড়ালেও চলে। পাস-ফেল উঠে গেছে। ছেলেমেযেরা কিছু না শিখেই প্রোমোশন পায়। হাইস্কুলেও যায। পরীক্ষায় ক-খ সব ছানাবড়াবৎ দেখে। ছানাবড়া নিয়ে বাড়ি ফেরে। আর স্কুলে যেতে চায় না।

যদি গ্রামের লোকের পাশে থাকতে পারতাম তা হলে বোধ হয় এতটা খারাপ হত না। ইচ্ছে করে, চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে গ্রামের কাজ করি। তা করলে কি আমার কথার কোন গুরুত্ব থাকবে? গ্রামের লোক তখনও কি আমার সহযোগিতা চাইবে?

পঁচিশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ে। গ্রামের কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেই সেখানে যেতাম। কথাও বলতাম। কিন্তু আমার কথাকে কেউ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করত না।

মিস্‌ফিট্‌

অনেকক্ষণ হল আলোকের ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। এ. ডি. আসেন নি। তাই লাস্ট পিরিয়ডে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্লাসটা হল না। সে গেটের কাছে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল। মল্লিকা বেরিয়ে আসতেই মুখ কাঁচুমাচু করে তার সাথে সাথে হাঁটতে লাগল। মল্লিকা তার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। আলোক কাকুতি-মিনতি করে বলল, মলি...., 'খবরদার যদি মলি বলবি,' মল্লিকা ফুঁসে উঠল, 'মল্লিকা বলতে পারিস নে? তুই মলি বলে ডাকবার কে?' আলোক আরও ঘাবড়ে গেল। মল্লিকা এখনও রেগে আছে। সে কোনোরকম সম্বোধন ছাড়াই অনুনয় করে বলল, "আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এবারকার মতো মাপ করে দে। আমি আর কখনও এরকম করব না। কাউকে যেন বলিস নে। বাবা শুনলে খুব কষ্ট পাবেন।"

"যার ছেলে এরকম বুদ্ধুভুতুম, মাথা-মোটা তাকে কষ্ট পেতেই হবে।" আলোককে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মল্লিকা হনহন করে হাঁটতে লাগল।

কলেজের গেট থেকেই বাস ছাড়ে। মল্লিকা বাসে উঠে লেডিস সীটে বসে পড়ল। সাধারণ সীট খালি নেই। আলোক উল্টো দিকে রড ধরে দাঁড়াল। গাদাগাদি ভিড়। তেমনি ঠেলাঠেলি। একটু স্থির হয়ে দাঁড়ানও যায় না। বাস চলতে লাগল। আলোক ভিড়ের ফাঁক দিয়েই একবার মল্লিকাকে দেখে নিল। মল্লিকা শান্তভাবে বসে আছে। তাকে দেখে মনেই হয় না যে এই মেয়েটা কাউকে বুদ্ধুভুতুম, মাথা-মোটা বলতে পারে। অথচ একটু আগেই সে বলেছে। সত্যিই সে বুদ্ধুভুতুম। না হলে এরকম হ্যাংলামি করে বসে। কিন্তু তার মাথাটা তো মোটা নয়। মাথা মোটা হলে কি এত ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করে? আর পড়াশোনাও তো সে ভালোই করে।

তাদের গ্রাম পরিহাটিতে কোনো স্কুল ছিল না। পাশের গ্রাম ভরতপুরের প্রাইমারি স্কুলে সে প্রতিবছরই প্রথম হত। রাজহাটি হাই স্কুলে গিয়েও সে প্রথম হল। তার বাবা প্রদীপ তখন প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাড়ি যেত। শুনে তার বাবার সে কি আনন্দ। মাকে গদগদ কণ্ঠে বলত, "মিতু দেখো। তুমার ছেলে বড় হয়ে দারোগা না হয়ে যায় না।" দারোগার থেকে যে বড় কিছু হতে পারে সেটা তার বাবার জানা ছিল না।

প্রদীপ চাষীর ঘরের ছেলে ছিল। তার বাবা তারক কয়েক বিঘে জমি ভাগে চাষ করত। কি যে আইন পাস হল। সবাই বলতে লাগল—লাঙ্গল যার জমি তার। রাজভাগাবুরা সব জমি কেড়ে নিল। তারক ছেলে প্রদীপকে নিয়ে দিন মজুর হলে গেল। তখন ফুলতলীতে ঝাল-মিষ্টি চানাচুরের কারখানা সবে হচ্ছে। যুবক প্রদীপ কারখানায় কাজ পেয়ে গেল। কারখানার মালিক তাকে একটা রিক্সা কিনে দিল। সে রিক্সায় করে চানাচুর নিয়ে দোকানে দোকানে দিয়ে বেড়ায়। মাঠের কাজের থেকে সহজই হয়। বেতনও বেশি পায়। প্রদীপ সারা সপ্তাহ ধরে কাজ করে। রবিবার বাজার বন্ধ। শনিবার কাজ সেরে পরিহাটি চলে যায়। আবার সোমবার সকালে এসে কাজ শুরু করে।

আলোক তখন ছোট। পরিহাটিতে মায়েব কাছে থেকে রাজহাটি হাই স্কুলে পড়ে। সবে এইট থেকে নাইনে উঠেছে। একদিন রাতে বাবা-মায়ের খুব ঝগড়া হল। রাত থাকতেই

বাবা কাজে চলে গেল। মা গুম হয়ে থাকল। বিকেলে আলোক স্কুল থেকে ফিরে দেখল, বাড়িতে অনেক লোকজন জুটে গেছে। সবাই তার মাকে ঘিরে ধরেছে। মা যন্ত্রণায় ছটফট করছে আর গরুর মত গোঙাচ্ছে। মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। সবাই বলাবলি করছে. ইঁদুর মারা বিষ খেয়েছে। আলোককে দেখেই মা পাগলের মতো তাকে জড়িয়ে ধরল।

মাকে গরুর গাড়িতে করে রাজহাটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। স্টমাক ওয়াশ করা হল, স্যালাইন দেওয়া হল। কিন্তু মা বাঁচল না। ঘণ্টাখানেক যন্ত্রণায় ছটফট করে সে আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ল। ডাক্তার নাড়ি দেখে চলে গেল। নার্স মুখের উপর কাপড় তুলে দিল। সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে আলোক কাঁদতেও ভুলে গেল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল। খবর পেয়ে তার বাবা এল। মায়ের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। আলোককেই মুখে আগুন দিতে হল। আলোক এখনও চোখের সামনে মায়ের সেই চিতা স্পষ্ট দেখতে পায়। লকলকে আগুনের শিখা মায়ের শরীরটাকে জড়িয়ে ধরছে। মা একটু একটু করে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

মায়ের মৃত্যুর পর বাবা কিরকম পাগলের মত হয়ে গেল। কাজে যেত না। কিছু খেতে চাইত না। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। আর শ্মশানে গিয়ে বসে থাকত। মাসখানেক পরে কারখানার মালিক বাপি বোস এসে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে গেল। পরের সপ্তাহে এসে বাবা আলোককেও নিয়ে গেল। ফুলতলী হাই স্কুলে ভর্তি হয়ে আলোক অসহায় বোধ করল। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলের চাল চলনই যেন কিরকম! কিন্তু কয়েক মাস যেতেই সে বুঝতে পারল যে শুধু চাল-চলনে আড়ম্বরই যা বেশী ; না হলে এখানকার ছেলেমেয়েরা তার থেকে পড়াশোনায় এমন কিছু ভালো নয়। সে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগল। ষান্মাষিক পরীক্ষায় সে তৃতীয় হল। আর বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সে ক্লাস টেনে উঠল। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফুলতলী স্কুল থেকে একমাত্র সেই প্রথম বিভাগ পেল। মাস্টারমশাইরা বললেন, সায়েন্স নিয়ে পড়লে অনেক সুযোগ। আলোক সায়েন্স নিয়েই পড়তে লাগল। উচ্চ মাধ্যমিকেও সে প্রথম বিভাগ পেল। বাবা বাপি বোসের কাছে গিয়ে বলল, "এবার ছেলেডাকে একটা কাজে ঢুকিয়ে দেন।"

"কাজ তো আছেই, পড়ুক না আরও কিছুদিন। কলেজে ভর্তি করে দাও।"

"কলেজ তো ইখানে নাই।"

"এখানে নেই, ঝাউবনীতে আছে। ঝাউবনীতেই ভর্তি করে দাও।"

"ভর্তি করে দিব ?"

"আচ্ছা তোমাকে যেতে হবে না। আমিই ভর্তি করে দেব।"

বাপি বোসই আলোককে ঝাউবনী কলেজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিল। আলোকের ইচ্ছে ছিল বি. এস-সি. পড়বে। কিন্তু ঝাউবনী কলেজে বি. এস-সি. নেই। বি. এস-সি. পড়তে হলে সেই বহরমপুরে কে. এন. কলেজে যেতে হবে। বহরমপুর অনেক দূর। বাসে যাতায়াত করে পড়া যাবে না। বহরমপুরে গিয়ে থাকার মতো আর্থিক সঙ্গতি তার নেই। বাপি বোসকে বললে কি হত জানা নেই। কিন্তু সে বলতে পারে নি। ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে ঝাউবনী কলেজেই ভর্তি হয়েছিল।

পার্ট ওয়ান পরীক্ষা হয়ে গেছে। অনার্সে সে পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। পার্ট টু পরীক্ষার আর মাস তিনেক বাকি আছে। সে বাসে যাতায়াত করেই কলেজ করে। ঝাউবনী থেকে আমতলা দশ কিলোমিটার দূর। বাসে আধ ঘণ্টা খানেক লাগে। আমতলা থেকে ফুলতলী কিলোমিটার তিনেক। মল্লিকা ম্যানেজারের মেয়ে। ওর জন্য রিক্সা থাকে।

আলোককে পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতে হয়। আলোকের অসুবিধা হয় না। সারা পথটা আম, কাঁঠাল আর তাল-নারকেল-সুপারির ছায়ায় ঢাকা। সেই ছায়া ঘেরা পথে পাখির ডাক শুনতে শুনতে হাঁটিতে তার ভালোই লাগে। শুধু একটু আগে বেরুতে হয়। আর ফিরতেও একটু দেরি হয়ে যায়। একটু বেশি রাত পর্যন্ত পড়ে সে সেটা পুষিয়ে নেয়।

আমতলা যাঁরা আছেন এগিয়ে আসুন। খালাসির হাঁকে আলোকের আচ্ছন্নতা ভাঙল। মোড়ের মাথায় এসে বাস থেমে গেল। সে তাড়াতাড়ি করে ভিড় ঠেলে নিচে নামল।

তার বাবাই আজ মল্লিকাকে নিতে এসেছে। মল্লিকা গিয়ে রিক্সার ওপর উঠে বসল। বাবা রিক্সার সীটের ওপর থেকে অসহায়ভাবে আলোকের দিকে তাকিয়ে দেখল। সে কি ভাবছে ? নিজে ম্যানেজারের মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে, আর তার ছেলেকে এতটা পথ হেঁটেই যেতে হবে ! রিক্সাটার অর্ধেক তো খালিই আছে। আলোককে তুলে নিলেই হয়। কিন্তু মল্লিকা যদি রাজি না হয় ! ম্যানেজার যদি বকাবকি করে ! আর আলোকই কি রাজি হবে ? সে আবার আলোকের দিকে ফিরে তাকাল। আলোক সে করুণ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে চোখ নামিয়ে নিল।

মল্লিকা কি এখন মনে মনে হাসছে ? আলোক বুঝতে পারল না। বাবা সীট থেকে নেমে রিক্সাটাকে হাত দিয়ে টেনে একটু গড়িয়ে নিল। তারপর সীটের ওপর বসে প্যাডেল করতে লাগল। বাবা বোধ হয় খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাত দিয়ে না টেনে আর রিক্সা চালানো শুরু করতে পারছে না। তারপরেও চালাতে কষ্ট হচ্ছে। বাবার শক্ত সমর্থ শরীরটা ক'বছরেই যেন ভেঙে চুরে জুবুথুবু হয়ে গেছে। অথচ ম্যানেজারটা তাকে দিয়েই তার মেয়েকে আনতে পাঠিয়েছে। সে একটা চাকরি পেলে আর বাবাকে এ কাজ করতে দেবে না। যে মানুষ যত নিরীহ হয়, এরা তাকে তত বেশি করে খাটিয়ে নেয়।

দেখতে দেখতে মল্লিকাকে নিয়ে বাবার রিক্সাটা চোখের আড়াল হয়ে যায়। আলোক পথের দিকে পা বাড়ায়। রাগে-দুঃখে তার পা চলতে চায় না। সকালবেলাকার মল্লিকার কথাগুলো তীরের ফলার মতো তার বুকে এসে বেঁধে। চেতনা অবশ হয়ে যায়। সে মনকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। বারবার সে মল্লিকার কাছে অপমানিত হতে গেছে। আজ বুঝি তার চূড়ান্ত অপমান হল !

মা মারা যাবার পর বাবা যখন তাকে গ্রামের বাড়ি থেকে চানাচুর কারখানার কোয়ার্টারে নিয়ে এল তখন কারখানাটাকে তার একটা জেলখানার মতোই মনে হয়েছিল। পরিহাটি গ্রামে তাদের বাড়ি ছোট থাকলেও আশেপাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা ছিল। এখানে দুপাশে গাদাগাদি কোয়ার্টার। আর সেখানে যারা থাকে তারা সকলেই অপরিচিত। আলোকের সমবয়সীও কেউ নেই। বাবা সকালে নিজে খেয়ে তাকে খাইয়ে কাজে চলে যেত। সে ঘরের মধ্যে বসে সারাক্ষণ বাবার প্রতীক্ষা করত। একেক সময় তার কান্না পেত।

সপ্তাহখানেক পরে বাবা তাকে একদিন ফুলতলী হাইস্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিল। সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব পেয়ে তার একটু ভালো লাগতে লাগল। বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান দেখে তো সে চমৎকৃত। রাজহাটি স্কুলে একটা যেমন তেমন গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হত। তারপর বড় জোর দুয়েকটা আবৃত্তি, দু'য়েকজনের বক্তৃতা। তারপরই পুরস্কার বিতরণ করে অনুষ্ঠান শেষ। এখানে রীতিমতো স্টেজ বেঁধে অভিনয় হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা অভিনীত হচ্ছিল। চিত্রাঙ্গদার মোহময়ী রূপে মুগ্ধ হয়ে অর্জুন তার কাছে ধরা দিয়েছে। দর্শকের আসনে বসে আলোকেরও ইচ্ছে করছে ওর পায়ে 'জীবন-যৌবন-ধন-মান' সব লুটিয়ে দেয়। রাতের আনন্দ শেষে অর্জুন ঘুমিয়ে গেছে। তার দিকে

চেয়ে চিত্রাঙ্গদা বলছে—

"শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলা সম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ....।"

অর্জুনের ভূমিকায় যে অভিনয় করছে তার জীবন সার্থক। কে এই সৌভাগ্যবান? পাশের বন্ধুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আলোক জিজ্ঞেস করল,

"কাজল, কে অর্জুন সেজেছে রে?"

"ক্লাস টুয়েলভের পার্থদা।"

"আর চিত্রাঙ্গদা?"

"তুই চিনিস নে? সবাই জানে, ও মল্লিকা। তোদের ম্যানেজারের মেয়ে।"

"কোন ক্লাসে পড়ে?"

"আমাদের ক্লাসে। মেয়েদের সেকশানে বসে তো তাই।"

ফুলতলী স্কুলের এই একটা ব্যাপার আলোকের ভালো লাগে না। মেয়েদের জন্য আলাদা সেকশান। ফলে মেয়েদেব সঙ্গে আলাপই হয় না। অথচ এখন তার ছেলেদেব থেকে মেয়েদের সাথেই আলাপ করতে, কথা বলতে বেশি ইচ্ছে করে। মল্লিকার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে ভালো হত! অনুষ্ঠান শেষে প্রথম পুরস্কার নিয়ে সে বাড়ি ফিরল। কিন্তু মল্লিকার কথা ভুলতে পারল না। সেই রাতে সে মল্লিকাকে স্বপ্ন দেখল। মল্লিকা একটা ফুলের মালা এনে তার গলায় পরিয়ে দিচ্ছে। তারপর কি হত কে জানে। তার আগেই বাবা তাকে ডেকে তুলল, "সকাল হয়ে গেছে। ওঠ্।" আলোক হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসল। কিন্তু মনটা খচখচ করতে লাগল। বই রেখে সে ম্যানেজারের বাড়ির পাশের আমবাগানে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

কারখানার দারোয়ান হেলারাম এসে বলল, "দিদিমনি ডাকছে।" দিদিমনিটি কে আলোক বুঝতে পারল না। হেলারাম তাকে নিয়ে ম্যানেজারের বাংলোয় ঢুকল। ম্যানেজার চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "ওটা কে?"

"আমাদের প্রদীপ রিক্সাওয়ালার ব্যাটা হুজুর।"

"এখানে কেন?"

"দিদিমনি যে ডাকতে বললেন হুজুর।"

"কোন্ দিদিমনি? মল্লিকা?"

"হ্যাঁ হুজুর।"

একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। ম্যানেজার প্রশ্ন করল, "মলি, ওকে ডাকতে বলেছিস কেন?" তাহলে এই মেয়েটিই কি মল্লিকা? মেয়েটি উত্তর দিল, "আমার একটা অঙ্ক হচ্ছে না বাবা। ওকে দিয়ে করিয়ে নেব।" অর্থাৎ মেয়েটিই মল্লিকা। মল্লিকা ইশারায় তাকে পড়ার ঘরে ডাকল। ঘরে ঢুকেই আলোক বলল, "কালকে আপনার অভিনয় দারুন ভালো হয়েছে।"

"আর আমড়াগাছি করতে হবে না—অঙ্কটা কর। আর একসঙ্গে পড়িস, আপনি কি রে? তুই করে বলতে পারিস নে।"

মল্লিকা চেয়ারে বসে টেবিলের ওপরে একটা খাতা দিয়ে অঙ্কের বইটা খুলে ধরল। আলোক দেখল চক্রবৃদ্ধি সুদের অংক। মল্লিকা সূত্রটাই ঠিক লেখেনি। অংক হবে কি করে? আলোক মিনিট পাঁচেকের মধ্যে করে ফেলল। মল্লিকা খাতাটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগল।

আলোক তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। মল্লিকা দেখতে খারাপ না। তবে কাল রাতে চিত্রাঙ্গদার সাজে যেরকম লাগছিল সেরকম সুন্দরী লাগছে না। মল্লিকা খাতা রেখে বলল, "হাঁদার মতো তাকিয়ে কি দেখছিস রে ? অঙ্ক করা হয়েছে এবার যা।" আলোক কোনো কথা না বলে বেরিয়ে এল।

এরপর থেকে আলোকের স্কুলে যাতায়াতের সময় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে না মিলে মল্লিকার যাতায়াতের সঙ্গে মিলতে লাগল। মল্লিকা কখনও ফিরে তাকায়, কখনও তাকায় না। কখনও একটা অঙ্ক করে দিতে বলে, কখনও একটা রচনা লিখে দিতে দেয়। আলোক তাতেই কৃতার্থ। নিজের কাজ ফেলে সুন্দর করে সেগুলো করে দেয়। বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আগে নাটকেও সে নাম দিল। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষা সামনে বলে মল্লিকা সেবার অভিনয় করল না। আলোকেরও সব উৎসাহ চলে গেল। সে মন দিয়ে পড়তে লাগল। মাধ্যমিকে তার রেজাল্ট ভালো হল। কিন্তু মল্লিকা আর্টস নিয়ে ভর্তি হল। আর তাকে অঙ্ক করতে হয় না। আলোকেরও ডাক পড়ে না। শুধু মাঝে মধ্যে ইংরেজির জন্য আলোক ডাক পায়। তবে যাতায়াতের পথে প্রায়ই দেখা হয়।

উচ্চ মাধ্যমিকের পর আলোক মল্লিকার সাথে একই কলেজে আর্টস নিয়ে ভর্তি হল। এখন দুজনে এক সঙ্গেই বাসে কলেজ যাতায়াত করে। এক সঙ্গে ক্লাসও করে। পড়াশোনা নিয়ে কথাবার্তা হয়। ক্লাস না থাকলে বসে গল্প করে। মল্লিকার সঙ্গে তার এখন অনেক ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। এখন তাকে একান্ত আপন করে পেতে ইচ্ছে করে। একেই কি ভালোবাসা বলে ? তাহলে সে মল্লিকাকে ভালোবাসে ! মল্লিকাও কি তাকে ভালোবাসে ? আলোকের জানতে ইচ্ছে করে। মল্লিকাকে জানাতে ইচ্ছে করে যে সে তাকে খুব ভালোবাসে। অনেক দিন থেকেই আলোক কথাটা তুলবে তুলবে করছিল। কিন্তু সুযোগ পায় নি। আজ বাস থেকে নেমে মল্লিকা প্রশ্ন করল, "কিরে ছুটি কেমন কাটল ?"

"ভালো কাটে নি। তোর জন্য খুব মন খারাপ করত।"

"কি রকম ?"

"তোকে আমি খুব ভালোবাসি। সব সময় তোকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে। তোকে ছাড়া..."

"তুই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস। ভুলে যাস কেন, আমার বাবা যেখানে ম্যানেজার, তোর বাবা সেখানে রিক্সা পুলার। তোর মাথায় এসব আসে কি করে ?"

আলোকের দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মল্লিকা ক্লাসে ঢুকে গেল। আলোক অপমানে, লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিল। ক্লাসে ঢুকতে তার সাহস হল না। ক্লাসে ঢুকলেই মল্লিকার সাথে দেখা হয়ে যাবে। শুধু মল্লিকাকে ছাড়া যে ক্লাসগুলো ছিল সেগুলিই সে আজ করেছে।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে কখন চলে এসেছে খেয়াল করে নি। কারখানার বাড়িটা দেখে আলোক চমকে উঠল। সে গেটের দিকে গেল না। গেট দিয়ে ঢুকলে ম্যানেজারের বাংলোর পাশ দিয়ে তাদের কোয়ার্টারে আসতে হয়। আলোক পুব দিকের পুকুর পাড়ের গলি দিয়ে ঢুকে পড়ল।

বাবা গুম মেরে খাটিয়ার ওপর বসে আছে। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় গ্রীষ্মের আকাশে কাল বৈশাখীর মেঘ জমেছে। ঝাড় আসতে দেরি হল না। ঝড়ের বেগে বাবা তিরস্কার করতে লাগল, 'আমি শুনেছুনু লেখাপড়হা শিকে লোক বুদ্ধিমান হয়। এখুন দেখছি, ঘুড়ার ঘাসকাটা হয়। লেখাপড়হা শিকে মাথা খারাপ হয়, বুদ্ধি মুটা হয় ! না হলে

কুন্ আক্কেলে তুই ম্যানেজারের বিটির কাছে পিরিতের কথা বলতে যাস ! বড়লোকের বিটি ঐ বাংলা বাড়ি ছেড়ে আমার ঘরের বো হয়ে আসবে ? এতদিন লেখাপড়্হা করে তোর এই বিদ্যা হল ! আজ বিশ-পঁচিশ বছর এখানে কাজ করছি। মুখের উপুর কেহু কুনু কথা বুলতে পারে নি। আর ঐ ম্যানেজার আজ কি কথাই না বলল !"

আলোকের মনে হল, এক্ষুণি তার মৃত্যু হলে সে বেঁচে যেত। লজ্জায় সে মাটির সাথে মিশে গেল। মুখে সে কোনো কথা বলতে পারল না। বাবা বলে চলল, 'বলে, কলেজে ভর্তি হয়ে তোর ব্যাটাডা কি হাতির পাঁচ পা দেখেছে ? প্যাড্‌লারের ছেলে হয়ে আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে আসার সাহস হয় কি করে ? আর যদি বেচাল দেখেছি তো পেঁদিয়ে ঠ্যাঙ ভেঙে দিব।"

বাবার দুগাল বেয়ে চোখের জল নেমে এল। বৃষ্টি নামলে যেমন ঝড়ের বেগ কমে যায় তেমনি কান্নার দমকে বাবার কথা বন্ধ হয়ে গেল। চোখের জল মুছতে মুছতে কোনোরকমে এক বাটি মুড়ি বের করে দিয়ে সে চলে গেল। আশে পাশের বাড়িতে এখন কোনো লোক নেই বলে তাও রক্ষে। না হলে সবাই শুনে ফেলত। কিন্তু শুনতে কি আর বাকি আছে ! ম্যানেজার কি লুকিয়ে লুকিয়ে তার বাবাকে এসব কথা বলেছে ! সবাই কি যে ভাববে ! আলোক আর কিছু ভাবতে পারল না। ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর দরজা বন্ধ করে গলি পথটা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

স্কুলের মাঠে ছেলেরা একটা ফুটবল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিল। অন্যান্য দিন সেও তাদের সাথে দৌড়াদৌড়ি করে, ফুটবলটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। বাগে পেলে দুয়েকটা লাথিও মারে। আজ কিছু ভালো লাগল না। মাঠের এক পাশে গিয়ে বসে পড়ল।

আলোক বসে বসে খেলা দেখছিল। হঠাৎ ওদিক থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'সুভাষ, ও সুভাষ ! সন্ধ্যা হয়ে গেল। তুই এখনও খেলা করছিস !' ওদিকে একটা রবারের বল নিয়ে কয়েকজন বাচ্চা ছেলে ছোটাছুটি করছিল। মহিলা তাদের একজনের হাত ধরে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে নিয়ে চলে গেল। তা দেখে আলোকের তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল।

আজ যদি তার মা বেঁচে থাকত, তাহলে আর তাকে এই ফুলতলীতে আসতে হত না। হয়তো সে ঝাউবনী কলেজেই পড়ত। কিন্তু দিনের শেষে পরিহাটিতে মায়ের কাছেই ফিরে আসত। মা তাকে আদর করে খাওয়াতো। তারপর তার কাছে কলেজের গল্প শুনতে চাইত, যেমন করে সে তার স্কুলের বন্ধু-বান্ধবদের কথা জানতে চাইত। গল্প বলা এবং শোনাতে মার ভারি শখ ছিল। পাশের বাড়ির বাদল কাকার তখন সবে বিয়ে হয়েছে। সরমা কাকিমা রোজ মার কাছে গল্প শুনতে চলে আসত। মা এমন মজা করে গল্প বলত যে মাঝে মাঝে আলোকও পড়া থামিয়ে গল্প শুনত।

একদিন এক মুচি দম্পতির গল্প হচ্ছিল। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে কথা বন্ধ। স্বামী গোঁজ হয়ে ঘরের মধ্যে বসে আছে। স্ত্রী বাইরে এসে দেখছে আকাশে শকুন উড়ছে। মুচির মেয়ে। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে তার অসুবিধা হল না। শকুন ওড়া মানেই কাছাকাছি কোথাও গরু বা মোষ মরেছে। চামড়াটা ছাড়ানো দরকার। সে নিজে তো ছাড়াতে যেতে পারে না, স্বামীকে বলতে হয়। বলতে গেলে মান থাকে না। আবার দেরি হলেও চামড়াটা হাতছাড়া হয়। একটু দেরি হলে ঐ শকুনগুলো কি চামড়াটা আস্ত রাখবে ? সে মেয়ে তখন স্বামী যাতে শুনতে পায় তেমনি করে নিজেকেই বলতে লাগল—

"চালের বাতায় খচ্‌মচি খান, তেই বা আমার কি ?

আর আসমান দিয়ে মানিক উড়ে, তেই বা আমার কি !"

সেই কথা মনে পড়তে এই দুঃখের দিনেও আলোকের ঠোঁটের কোণ দিয়ে একটা হাসির রেশ ঝিলিক দিয়ে গেল। তার সেই মা কেন যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল তা সে আজ পর্যন্ত জানে না। সেদিন রাতে কি নিয়ে বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল তাও সে জানে না। শুধু জানে মা নেই বলে তাকে পরিহাটি ছেড়ে এখানে চলে আসতে হয়েছে।

পরিহাটি না ছাড়লে সুধার সঙ্গেও তার ছাড়াছাড়ি হত না। সুধা দীনু কাকার মেয়ে। স্কুলে তাদের সঙ্গেই পড়ত। অঙ্কে মাথা দারুণ সাফ। কিন্তু ইংরাজিতে শুধু ভুল করত। ইংরাজি দেখিয়ে নেওয়ার জন্য সুধা মাঝে মাঝে আসত। কেমন সুন্দর কথা বলত। তার বাবা রিক্সা চালায় বলে একটুও ঘৃণা করত না। অবশ্য সুধার বাবা কোনো কারখানার ম্যানেজার ছিল না। মাঠের কৃষক ছিল। ম্যানেজার তো কি হয়েছে ? কলেজ পাস করার পর সে ইউনিভার্সিটিতে পড়বে। মল্লিকার বাবার থেকেও সে বড় চাকরি করবে। তখন কত শত মল্লিকা তার গলায় মালা দিতে আসবে।

আলোক তার ব্যথিত মনটাতে কোনরকমে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগাচ্ছিল। কাজল এসে বলল "কিরে ? তুই আজ এত দেরি করে এলি ! তারপরেও মাঠে নামলি নে। কি হয়েছে তোর ?"

"কিছু হয় নি রে। শরীরটা ভালো লাগছে না।"

"দেখি জ্বর-টর হয় নি তো ?"

কাজল বন্ধুর কপালে হাত দিল। আলোক এতক্ষণ যা সহ্য করেছিল, একটুখানি স্নেহের ছোঁয়া পেয়ে তা আর সহ্য করতে পারল না। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাজল তো অবাক। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বন্ধুর পিঠে হাত রেখে বারবার বলতে লাগল, "কি হয়েছে, বলবি তো।" আলোক কিছুই বলতে পারল না। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নিল। কাজল তাকে টেনে তুলল। বলল, "চল, আমাদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবি।" আলোক রাজি হচ্ছিল না। এরকম অবস্থায় অন্যের বাড়ি যেতে কার বা ভালো লাগে ? কিন্তু কাজল কিছুতেই ছাড়ল না। টানতে টানতে নিয়ে গেল।

স্কুলের কাছেই কাজলদের প্রকাণ্ড বাড়ি। কাজলের বাবার বাজারে হার্ডওয়ারের হোলসেল কারবার। তার বাবা বিভিন্ন কোম্পানির এজেন্ট। সেইসব কোম্পানি থেকে লোহা-লক্কড-সিমেন্ট প্রভৃতি এনে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিলি করে। মোটা অঙ্কের কমিশন পায়। লোকে বলে কমিশন এজেন্ট। কাজল উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে নামে মাত্র কলেজে পড়ে। বেশির ভাগ সময়ই বাবার কারবার সামলায়। কাজলের বোন মালা ববং পড়াশুনা করে। সে বাংলায় অনার্স নিয়ে এবার ভর্তি হয়েছে। কাজলের মা খুব স্নেহময়ী। আলোককে খুব স্নেহ করে। সে কিছুতেই ছাড়ল না, "কাঁদছিলে কেন ? কি হয়েছে বলতেই হবে।" আলোক কি বলবে ? সে বলল, "অনেকদিন পরে মায়ের কথা মনে পড়ছিল।" কথাটা কিছু পরিমাণে সত্যিও বটে।

কাজলের মা আর কিছু বলল না। মালা একটা প্লেটে কটা মিষ্টি আর এক গ্লাস জল দিয়ে গেল। আলোক বিনা বাক্য ব্যয়ে মিষ্টি কটা খেয়ে বলল, "মাসিমা দেরি হতে দেখে বাবা আবার চিন্তা করবেন। আজ যাই। আবার একদিন আসব।" মাসিমা বলল, "যাও, তবে আবার এসো কিন্তু।" কাজল বলল "চল আমি তোকে দিয়ে আসি।" আলোক অনুনয় করল, "না, আমি যেতে পারব। তোকে আর যেতে হবে না।" কাজল আর জোর করল না। আলোক কারখানার দিকে পা বাড়াল।

মাসখানেক পরের ঘটনা। আলোক কলেজ থেকে ফিরে মুড়ি খাচ্ছিল। বাবা এসে বলল, "মালিক তুমাকে দেখা করতে বুললেন।" মালিক মানে বাপি বোস। আলোক বাবার কাছে তার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছে। সত্যি কথা। তবু গল্পের মতো মনে হয়।

বছর পঁচিশেক আগের কথা। বাপি বোস তখন শহর থেকে বিস্কুট, চানাচুর এইসব এনে ফুলতলীর দোকানে দোকানে গিয়ে বিক্রি করত। একদিন কি মনে হল, সে চানাচুরের ফ্যাক্টরি দেখতে চলে গেল। দেখল, চানাচুর তৈরী করা এমন কিছু কঠিন নয়। মটর বা ছোলার ডাল ভালো ভাবে ভেজে নিয়ে তার সঙ্গে ঝুরিভাজা মিশিয়ে প্রয়োজনীয় মশলা মাখালেই চানাচুব হয়ে গেল। বাড়িতে এসে সে চানাচুর তৈরী করে ফেলল। শহর থেকে আনা চানাচুরের সঙ্গে সে বাড়িতে তৈরী চানাচুরও বিক্রি করতে লাগল। যখন সে দেখল যে তার তৈরী চানাচুর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তখন সে বাড়িতে দুজন কাজের লোক রাখল। তাদের তৈরী চানাচুরও যখন বিক্রি হয়ে যেতে লাগল তখন সে জনাদশেক লোক নিয়ে একটা কারখানা খুলে বসল। দোকানে দোকানে গিয়ে চানাচুর দিয়ে আসার জন্য একটা রিক্সা কিনল। সেই রিক্সা চালাবার জন্য তার বাবাকে চাকরি দেওয়া হল। ম্যানেজার মানিকবাবু তখন এক মুদিখানার দোকানে খাতা লিখত। বাপী বোস তাকে নিয়ে এসে ম্যানেজার করে দিল। সেদিনকার সেই ছোট্ট কারখানা কালক্রমে আজকের এই ঝাল-মিষ্টি চানাচুব কারখানায পরিণত হয়েছে।

এই কারখানার মূলধন এখন কযেক লাখ টাকা। এখন এখানে দেড়শ-লোক কাজ করে। চানাচুর বিতরণের জন্য পনের খানা রিক্সা ছাড়াও একখানা ভ্যান গাড়ি কাজ করে। কারখানায় যারা কাজ করে তাদের প্রায় জনা পঞ্চাশেক বাইরের লোক। পুকুরের পুব পাড়ে তাদের প্রত্যেকের জন্য কোয়ার্টার তৈরী হয়েছে।

কারখানার চেহারাও পাল্টে গেছে। গেট দিয়ে ঢুকেই অফিস। ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টেন্ট, টাইপিস্টদের আলাদা আলাদা বসার ঘর। প্রতিটি ঘরে সুন্দর সুন্দর চেয়ার টেবিল। পশ্চিম দিকে মালিকের বাড়ি। বাড়িতে সুন্দর আসবাব, ডাইনিং টেবিল সোফা সেট। বসার ঘর থেকে পথ নেমে চলে গেছে পশ্চিমের পুকুরে। তাতে বাঁধানো ঘাট। পুকুরের পাশে ফুলের কেয়ারি করা সবুজ ঘাসের লন। টবে নানা.জাতের ফুলেব গাছ। লনের ওপাশে তিনতলা গেস্ট হাউস। বিশিষ্ট অতিথিরা এলে এখানে থাকেন। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে অফিসের বাবুরা পিকনিক করতে আসেন। লনের উত্তরে সারি সারি সুপারিব গাছ। প্রাচীরের কোল ঘেঁসে নারকেল গাছের সারি।

গেস্ট হাউসের পুবে ম্যানেজারের বাংলো। তার পুবে আমবাগান। বাগানের দক্ষিণে পুবের পুকুর। পুকুরেব পশ্চিমের ঘাট বাঁধানো। ঘাটের ওপরে একটা ছোট ব্যালকনি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেখানে বসে মাছেদের খেলা দেখা যায়। তার জন্য সেখানে কয়েকটা গার্ডেন চেয়ার দেওয়া আছে। পুকুরের পুব দিকে কর্মচারীদের কোয়ার্টার। সব কিছু ছবির মতো সাজানো। তবুও তার জীবনটা সুখের নয়।

পরপর তিন মেয়ের পর তার একমাত্র ছেলে পলাশ। তার ইচ্ছে ছিল ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় অফিসার করবে। সে এত টাকার মালিক, তবুও অফিসের বাবুদের কাছে গিয়ে হুজুর হুজুর করতে হয়। নিজের ছেলেকে সেই অফিসার না করলে যেন তার শান্তি নেই। সে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দিল। কিন্তু ছেলে পড়াশোনার থেকে খেলাধুলা আর হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াতেই ভালোবাসে। বড়লোকের ছেলেদের পকেটে পয়সা থাকে। তাই হুল্লোড়েব বন্ধু-বান্ধব জুটতে দেরি হয না। পলাশের অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটে গেল। চার

পাঁচটা করে প্রাইভেট টিউটরের ঠেস দিয়ে স্কুলের গণ্ডিটা কোনোরকমে পার হল। কিন্তু কলেজে গিয়ে একেবার নট নড়ন-চড়ন। গ'ড়ে গরুর মতো সে একেবারে শুয়ে পড়ল। বছর দুয়েক ক্লাস করল। কিন্তু কিছুতেই পরীক্ষা দিল না।

বাবা ছেলেকে অফিসার করার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে বলল, "এখন থেকে কারবার সামলাও। যা আছে যদি দেখে রাখতে পার, সারাজীবন ভাবতে হবে না।" পলাশ কারবার দেখতে লাগল। আগে বাবার কাছে পয়সা চাইতে হত। এবার নিজের হাতেই পয়সা এসে গেল। মদ সে আগেই ধরেছিল। এবার মেয়েছেলের দিকেও চোখ গেল। সুযোগ বুঝে ম্যানেজার মেয়ে মল্লিকাকে এগিয়ে দিল। সমস্ত সম্পত্তির মালিক তো পলাশই হবে। পলাশকে হাত করতে পারলে সমস্তই তার।

হঠাৎ সেদিন বাপি বোস এসে পড়ায় একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। দুপুরবেলা সে এসে ছেলের খোঁজ করতেই ম্যানেজারের প্রতি অসন্তুষ্ট কোনো কর্মচারী গেস্ট হাউস দেখিয়ে দেয়। "তার ঘর থাকতে গেস্ট হাউসে কেন ?" এ প্রশ্নের কোনো উত্তর সেই কর্মচারী দেয় নি। সে দেখেছিল ঘরে পলাশের সঙ্গে মানিকবাবুর মেয়েও আছে।

সম্প্রতি বহরমপুরে সে একটি বাড়ি করেছে। মোটর ভ্যানে করে সেখানে চানাচুর নিয়ে যাওয়া হয়। এজেণ্টরা এসে সে চানাচুর নিয়ে যায়। বাপি বোস এখন স্ত্রী-কন্যা নিয়ে সেখানেই থাকে। ম্যানেজারবাবু এখানকার কাজ দেখে। আর কিছুদিন হল পলাশ এখানে এসেছিল। সেই ঘটনার পরই সে ছেলেকে বহরমপুর পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজেই কদিন থেকে কাজকর্ম দেখছে।

আলোক জানে না, কেন বাপি বোস তাকে দেখা করতে বলছে। কিন্তু সে জানে আর সকলের চেয়ে মালিক তাকে বেশী স্নেহ করে। বলতে গেলে তার জন্যই তার কলেজে পড়া হচ্ছে। সে মুড়ির বাটিটা রেখে বেরিয়ে পড়ল। বাপি বোস অফিসে চেয়ারে বসে ছিল। আলোক এসে নমস্কার করল। মালিক মুখ তুলে বলল, "বস।"

"ঠিক আছে। অপানি বলুন।"

আলোক বসল না। বাপি বোস বোধ হয় তার বিনয় দেখে খুশিই হল। সে জানতে চাইল, "তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে ?"

"আপনাদের আশীর্বাদে ভালোই।"

"এরপরে কি করবে ?"

"আমার তো ইচ্ছে এম. এ. পড়ব।"

"এম. এ. পড়ে কি করবে ? চাকরি বাকরি করতে হবে না। বাবা বুড়ো হয়েছে। বাবাকে দেখতে হবে না। চাকরিতে লেগে পড়। দরকার হলে প্রাইভেটে এম. এ. দিও।"

"চাকরি কে দিচ্ছে ?"

"ধর যদি আমিই দিই। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তোমাকে আমিই নিয়ে নেব। আপাতত আমার অ্যাকাউণ্টেণ্ট রিটায়ার করছে। একজন বিশ্বস্ত লোক দরকার। তুমি ঢুকে যাও। ভেবো না, তোমাকে অ্যাকাউণ্টেণ্ট হয়েই থাকতে হবে, তোমার পরীক্ষা কবে ?"

"মাস দুয়েক দেরি আছে।"

"তাহলে পরীক্ষাটা দিয়েই জয়েন কোরো। আমার ছোট মেয়েটা পড়াশোনা করতে চায়। পূজোর সময় আমার সঙ্গে এখানে এসে থাকবে বলছে। তোমার তো স্কুলে সায়েন্স ছিল। অঙ্কটা একটু দেখিয়ে দিও তো।"

"কিছু ভাববেন না কর্তাবাবু।" ম্যানেজার মানিকবাবু পাশ থেকে কথা বলে উঠল,

"আমার রমা মাকে নিয়ে আসুন। কোনো অসুবিধা হবে না। আমার মেয়ে মল্লিকা আছে। তাতে না হলে শঙ্কর মাস্টার আছে। এমন সহজ করে বুঝিয়ে দেয় যে সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। যেন গুলে খাইয়ে দেয়। না বুঝে উপায় নেই। হা-হা-হা!" মানিকবাবু হাসতে থাকল। বাপি বোস সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "সে তখন দেখা যাবে। আলোক তুমি যাও।" আলোক নমস্কার করে বেরিয়ে এল।

পার্ট টু পরীক্ষা শেষ হতেই আলোক হাজির হল ফুলতলী হাইস্কুলের হেডমাস্টার অশোক বাবুর কাছে। স্কুল জীবন থেকেই কোনো ব্যাপারে পরামর্শের দরকার হলে আলোক তাঁর কাছেই যায়। সব কথা শুনে তিনি বললেন, "তুই চাকরিটা নিয়েই নে। ইচ্ছে করলে এম. এ. টা প্রাইভেটে দিতে পারবি। কিন্তু এম. এ. পাস করে চাকরি না পেলে সে বড় যন্ত্রণার ব্যাপার হবে। চোখের সামনে দেখতে তো পাচ্ছিস, এম. এ. পাস করে কত ছেলে বেকার বসে আছে। ঐ তো প্রকাশ এখনও চাকরি পায় নি। রামরতনও পায়নি। তোর আর্থিক অবস্থা তো ভালো নয়। বাবারও বয়স হয়েছে। তুই চাকরিটা নিয়ে নে।" অশোকবাবুর পরামর্শ তার খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হল। তাঁকে প্রণাম করে সে বিদায় নিল।

আলোকের সিদ্ধান্ত শুনে বাপি বোস খুব খুশি হল। ম্যানেজারের বাংলোর পাশে সে আলোকের জন্য একটা দু'-কুঠরি ঘর তৈরী করে দিল। আগস্টের পয়লা তারিখ থেকেই আলোক ঝালমিষ্টি চানাচুর কোম্পানীর অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কাজে যোগ দিল। পুরনো অ্যাকাউন্টেন্ট সালেক সাহেব তাকে কাগজপত্র বুঝিয়ে দিল। দেখিয়ে দিল, কিভাবে জার্নাল-লেজার থেকে ব্যালান্সশিট টানতে হয়, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট কষতে হয়, কিভাবে ক্যাশ-অ্যাকাউন্ট মেণ্টেন করতে হয়।

সালেক সাহেবের বোঝানো শেষ হলে মালিক বাপি বোস বলল, "আজ থেকে তুমি এই কোম্পানীর সবরকম আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখবে। তোমার ওপর আমার ভরসা আছে। আশা করি, আয় ঠিক মতো প্রতিফলিত হচ্ছে কি না, কোনো ব্যয়ের যৌক্তিকতা আছে কি না তা তুমি খুঁটিয়ে দেখবে। আর যদি দেখ কোনো লেনদেন কোম্পানীর স্বার্থ বিরোধী, তুমি সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করবে। অসুবিধা হলে আমাকে বলবে। অনেক কষ্টে এই কোম্পানী আমি তৈরি করেছি। এটা যেন নষ্ট হয়ে না যায়।" শেষের দিকে কথাগুলো বলতে গিয়ে তার গলার স্বর কেঁপে গেল। আলোক তাকে আশ্বস্ত করে বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।" বাপি বোস আশ্বস্ত হয়ে বহরমপুর চলে গেল। গিয়ে পলাশকে পাঠিয়ে দিল। পলাশ এসে ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল।

ম্যানেজার মানিকবাবু আলোককে কোনো দিনই সুনজরে দেখতে পারে নি। প্যাড্‌লারের ছেলের আবার লেখাপড়ার বাই। আবার সাহস দেখ, তার যে মেয়ে কাল মালিকের ঘরের বৌ হবে তার দিকে চোখ। মানিকের ইচ্ছা করে, চোখ দুটো গেলে দেয়। কিন্তু মালিকটা লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে। মানিক কতবার মানা করেছিল। বলেছিল, আলোকের চেয়ে অনেক ভালো ছেলে পাওয়া যাবে। ঐ তো পলাশের বন্ধু, সোমেশ্বরটা, মন্দ কি? পলাশও বলেছিল। কিন্তু বাপি বোস শুনল না। বলে, আলোককেই চাই। চাও। তারপর যেদিন বুঝবে মজা, সেদিন টের পাবে, কি ভুলটাই না করেছ? কিন্তু আপাতত মালিক তাঁর থেকে আলোককেই বেশি পছন্দ করছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সে সব সময় পলাশের পাশে পাশে ঘুরছে। মেয়ে মল্লিকাও সাহায্য করছে। এসে কখনও লনে রঙিন ছাতার তলায় বসে, কখনও ঘরের সোফায় বসে গল্প করে। কখনও বা গাড়িতে চড়ে হাওয়া খেতে যাচ্ছে। আলোকের বুকের মধ্যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

যতই অভিমান থাক, মল্লিকাকে সে এখনও ভালোবাসে। একবার কাউকে ভালোবাসলে বোধহয় আর কোনো দিনই ভোলা যায় না। তাই মল্লিকা যখন পলাশের হাত ধরে হেঁটে যায়, আলোকের মনে হয় তার বুকের হাড়গুলোই ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই যন্ত্রণা ভোলার জন্য সে কাজের মধ্যে ডুবে থাকে।

আলোক খরচের খাতা দেখছিল। গত সপ্তাহে তিন খাতে পলাশের নামে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। আলোক ক্যাশিয়ারকে ডেকে বলল, 'এই খরচের ভাউচার কোথায় ?'

'ভাউচার তো নেই।'

'পেমেণ্ট অর্ডার কে পাস করেছে ?'

'ম্যানেজারবাবু।'

'ভাউচার নিয়ে আসুন।'

'বাবু, মালিক টাকা নিয়েছেন। কি করে ভাউচার চাই।'

'পলাশ মালিকের ছেলে, মালিক নয়। আর মালিক টাকা নিলেও ভাউচার চাইতে হবে হিসেব ঠিক রাখাব জন্যে। যান ম্যানেজার বাবুর কাছ থেকে ভাউচার চেয়ে নিন।'

ক্যাশিয়ার চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে আমতা আমতা করে বলল, 'ম্যানেজারবাবু বললেন, উনি অ্যাকাউণ্টেণ্ট। ওনার কাজ হিসেব রাখা। পেমেণ্ট অর্ডার ঠিক আছে কি না সেটা দেখা ওনার কাজ নয়। সেটা আমি বুঝব।' আলোকের মুখ চুন হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, ম্যানেজার তাকে অপমান করার জন্যই এরকম বলেছে। কিন্তু এও বুঝতে পারল, অন্যায্য হলেও ম্যানেজারের কথায় যুক্তির জোর আছে। তাহলে প্রতিটি আয়-ব্যয়ের যথার্থতা সে কিভাবে বিচার করবে ? কিভাবেই বা কোম্পানীর স্বার্থবিরোধী লেনদেন আটকাবে। মালিককে ব্যাপারটা জানানো দরকার। সে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে লাগল।

চিঠি লেখা শেষ হবার আগেই কাজল এসে তার বিয়ের কার্ড বাড়িয়ে ধরল। আলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরল। এমন একটা মুহূর্তে কাজল এসে পড়ায় তার ভালোই লাগল। কাজলকে চেয়ারে বসিয়ে আলোক কার্ড খুলল।

'মহাশয়/মহাশয়া,

আগামী ১২ই ডিসেম্বর (বাং ২৬শে অগ্রহায়ণ) শুক্রবার আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান কাজলের সহিত ঝাউবনী নিবাসী গৌতম দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা রীতার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হবে। এই উপলক্ষে আপনার/আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। ইতি—সজল সাহা।"

আলোক সূচীতে দেখল বিয়ের বাসর ঝাউবনীতে শুক্রবার, বৌভাত এখানে রবিবার। বিয়েতে আলোক যেতে পারল না। একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে বৌভাতে গেল।

গিজগিজে ভিড়। সকলেই অচেনা। আলোকের কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। সে শাড়ির প্যাকেটটা হাতে করে বাইরের বসার ঘরেই বসল। দলে দলে পুরুষ মহিলা আসতে লাগল। বাড়ির লোকেরা তাদের স্বাগত জানিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। তারা কেউই আলোককে চেনে না। একবার মালাও এদিক থেকে ঘুরে গেল। মালা আজ একটা লাল বেনারসীতে দারুণ সেজেছে। সেও আলোককে খেয়াল করল না অথবা খেয়াল করার প্রয়োজন মনে করল না। ভাগ্যিস মিনিট পনের পরে কাজল নিজে এল। সে আলোককে টানতে টানতে বৌয়ের কাছে নিয়ে গেল। গালিচার ওপর সিংহাসনের মতো চেয়ারে নতুন বৌ বসে আছে। আগতরা উপহারগুলি তার হাতে তুলে দিচ্ছে। সে সেগুলি হাতে করে

নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের হাতে দিচ্ছে।

আলোক এগিয়ে গিয়ে শাড়িটা তার হাতে দিতে গেল। অমনি নতুন বৌয়ের মুখের ওপর তার নজর পড়ল। আলোকের সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। এ যে সেই মেয়েটি, গতবছরই যে ঝাউবনী কলেজে ভর্তি হয়েছে। লম্বা গড়ন। গায়ের রং ফরসা, দুধের মতো সাদা ফরসা। সাদা সালোয়ার কামিজ পরে কলেজে আসে। আলোকের খুব ভাল লাগে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দেখার সুযোগ হয না। ক্লাস শেষ হলেই সে কমনরুমে চলে যায়। সেদিন কলেজ থেকে বেরুতে গিয়ে দেখে, মেয়েটিও বেরুচ্ছে। সে মেয়েটির পিছন পিছন চলতে লাগল। মেয়েটি রেললাইন ক্রস করে বাবু পাড়ার রাস্তা ধরল। আলোক খানিকটা দূরত্ব রেখে হাঁটতে লাগল আর তাকে দেখতে লাগল। টাউন ক্লাবটার মোড় থেকে সে ডান দিকে বাঁক নিল। আলোকের ভয় করতে লাগল! যদি পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হযে যায়। যদি কেউ এসে জিজ্ঞেস করে, এখানে কি করতে এসেছ? আলোক ফিরে এল। আলোকের খুবই ইচ্ছে ছিল, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে। কিন্তু মল্লিকার অভিজ্ঞতার পর তার সাহস হয়নি। সেই মেয়ে আজ তার সামনে—ঝলমলে বেনারসী পরে বসে আছে। কাজলদের কোনো টেস্ট নেই। সাদা শাড়ি পরালে কত ভালো লাগতো!

আলোক এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল খেয়াল নেই। মালা এসে বলল, "দাদা দেখ, কে এসেছে।" কাজলের সঙ্গে আলোকও ফিরে তাকিয়ে দেখল পলাশকে সঙ্গে করে মল্লিকা এসেছে। কাজল হৈ হৈ করে উঠল। মল্লিকা এগিয়ে গিয়ে বৌয়ের হাতে একটা সোনার আংটি পরিয়ে দিল। কাজলের বাবা ছুটে এল। সবাই মল্লিকা পলাশের আংটির প্রশংসা করতে লাগল। আলোকের শাড়ির কথা কেউ ভুল করেও বলল না।

এখানেই শেষ নয়। পলাশ মল্লিকাকে দিয়ে কাজল আর ওর বৌকে নিমন্ত্রণ করল। মালাও সঙ্গে এল। জমজমাট খানা-পিনা হল। শ্যাম্পেন উড়ল। মদিরার পাত্রে চুমুক দিয়ে মেজাজ-মহারাজ হল। পলাশ আলোককে ডেকে পাঠাল। আলোক এলে পাত্রে চুমুক দিতে দিতে সে বলল, "শুনলাম, তুমি নাকি আমার খরচেরও ভাউচার চাচ্ছ! বলি কারখানা আমার বাবার না তোমার বাবার? চাকর, চাকরের মতো থাকো। নইলে...." হাত দিয়ে সে মদের গ্লাসের একটা মাছি তাড়িয়ে দেখাল। আলোক কিছুই বলতে পারল না। ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের কল্যাণ দাঁড়িয়ে ছিল। সে আলোককে হাত ধরে নিয়ে চলে এল।

আলোকের মনে হল, তার পক্ষে এখানে কাজ করা আর সম্ভব নয। যে ডেকে এতগুলো লোকের সামনে এরকমভাবে অপমান করতে পারে সে অনেক কিছুই করতে পারে। আজ বাপি বোস আছে। ক'বছর পরে তো থাকবে না। বাপি বোসের অবর্তমানে এই পলাশই হবে কোম্পানির মালিক। সঙ্গে ম্যানেজার মানিক। এমন কোম্পানির কাজ করার থেকে না খেয়ে শুকিয়ে মরাও ভালো। সে এ চাকরি ছেড়ে দেবে। পলাশ মালিক, মানিক ম্যানেজারের অধীনে সে চাকরি করতে পারবে না। বাপি বোস তার ওপর একটা বিরাট বিশ্বাস অর্পণ করেছিল। সে তাকে চিঠি লিখে সব জানিয়ে দিয়েছে। এরপর নিশ্চয় তার আর দায়িত্ব থাকছে না।

অশোকবাবু বলছিলেন, ফুলতলী হাই স্কুলে একজন শিক্ষক নেবে। বি. এড. থাকলে হয়ে যেত। এমনিতে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবুও আলোক একটা দরখাস্ত করে রাখবে। স্টেট ব্যাঙ্ক ক্যাশিয়ার কাম ক্লার্ক নেওয়ার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। ওখানেও একটা দরখাস্ত করতে হবে। আলোক কাগজটা উল্টো-পাল্টে দেখতে লাগল। দরখাস্তের সঙ্গে

তিন কপি ফটো দিতে হবে। টিনের বাক্সটায় কয়েক কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো ছিল না ? দেখার জন্য আলোক কোয়ার্টারে রওনা হল।

কোয়ার্টারের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ কেন ? বাবা তো কাল বিকেলে পরিহাটি গেছে। প্রথম মাসের বেতন পাওয়ার পরই আলোক বাবার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এখন শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকতে নাকি তার ভালো লাগে না। আর নিজের গ্রামের প্রতি অসম্ভব টান হয়েছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সেখানে যাওয়া চাই। কালই গেছে তাহলে এরই মধ্যে কি আবার ফিরে এল। আলোক দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা খুলতেই আলোক চমকে উঠল। সুধা না ? সুধা দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। আঠার-বিশ বছরে বোধ হয় সব মেয়েরই মুখটা সুন্দর হয়। সুধার কপালে সিঁদুর। হ্যাঁ, বাবা বলছিল বটে সুধার বিয়ে হয়েছে। কতদিন পরে দেখা। প্রায় আট ন'বছর। উভয়ে উভয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। আলোকই প্রথম কথা বলল, "কখন এলি ? কেমন আছিস ? তোর বর কোথায় ?" সুধা কিছু বলার আগেই একজন বছর পঁচিশেক বয়সের ছেলে বেরিয়ে এল। বাবা এসে বলল, "এটিই হচ্ছে আমাদের জামাই। হাইস্কুল পাস। কিন্তু বেকার। তুই যদি কুনু ব্যবস্থা করতে পারিস, তাই জোর করে লিয়ে এলাম।" বাবার কথা শুনে আলোকের মন খারাপ হয়ে গেল। তার চাকরির যে কি হবে তারই তো কোনো স্থিরতা নেই। সে আর অন্যের কি ব্যবস্থা করবে ? মুখে কিছুই বলতে পারল না। কারখানার দারোয়ান এসে খবর দিল, "মালিক আসিয়েছেন। আপনাকে সালাম ভেজতে বললেন।" সুধাকে আলোক বলল, "আমি মালিকের সঙ্গে দেখা করে এক্ষুণি আসছি।"

অফিসে এসে আলোক দেখল, সেখানে কেউ নেই। কল্যাণ এগিয়ে এসে বলল, "বাড়িতে আছেন।" আলোক বাড়িতে গেল। বাপি বোস ড্রয়িংরুমে একটা সোফায় বসে ছিল। আলোক গিয়ে তাকে নমস্কার করে দাঁড়াল। বাপি বোস মুখ তুলে প্রশ্ন করল, "বল, তোমার কি সমস্যা ?" আলোক হাত জোড় করে বলল, "আপনি আমাকে দয়া করে অব্যাহতি দিন। আমি এ চাকরি আর করব না।"

"চাকরি করবে না ! খাবে কি ?"

"অন্য কোথাও চাকরির খোঁজ করব।"

"হ্যাঁ, তোমার রেজাল্ট ভালো আছে, চাকরি হয়তো একটা পেয়ে যাবে। কিন্তু আমি যে কত আশা করে তোমার ওপর একটা ভার দিলুম, তার কোনো দাম নেই।"

"তাহলে কি আপনি আমাকে এরকমভাবে অপমানিত হতে বলেন ?"

"না, আমি কাউকে অপমানিত হতে বলি না। তোমার অপমান যাতে না হয় তার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু তুমি থাকবে।"

এর কি উত্তর দেবে, আলোক তাই ভাবছিল। ম্যানেজার মানিক বাবুর সঙ্গে পলাশ ঘরে ঢুকল। বাপি বোস আলোককে ছেড়ে দিয়ে পলাশকে নিয়ে পড়ল, "তোমাকে আমি কারখানায় কাজ দেখতে পাঠিয়েছিলাম না ফূর্তি করতে ?" ম্যানেজার পলাশের হয়ে উত্তর দিল, "ছেলেমানুষ একটু আধটু ফূর্তি তো করবেই। ওদের কি আর আমাদের মতো বয়স হয়েছে ?" বাপী বোস আবার পলাশকে প্রশ্ন করল, "তোমাকে তো আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলুম, টাকার দরকার হলে আমার কাছে চাইবে। ব্যবসার টাকায় হাত দেবে না। তার পরেও তুমি মানিকের কাছে টাকা চাইতে গেলে কেন ?" এবারও ম্যানেজার পলাশের হয়ে ওকালতি করল, "আমার কাছে চেয়েছে তো কি হয়েছে ? অন্য কারোর কাছে তো চায় নি।" বাপি বোসের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে ম্যানেজারকে উদ্দেশ্য করে বলল,

"তোমাকে ফোঁপর দালালি করতে এখানে কে ডাকল ? বাপ-ব্যাটার কথার মধ্যে তুমি নাক গলাচ্ছ কেন ? তোমাকে তো আমি ডাকি নি।" ম্যানেজার এতটা আশা করেনি। তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। সোফা ছেড়ে উঠে সে বলল, "তাহলে আমি যাই।"

"এসে যখন পড়েছ, চুপ করে বস। তোমার সঙ্গেও আমার কথা আছে।" ম্যানেজার আবার সোফার ওপরে বসে পড়ল।

বাপি বোস পলাশকে জিজ্ঞেস করল, "মানিক তোমার কর্মচারী না অভিভাবক ? তুমি তার কাজ দেখবে না তার কাছে ভিক্ষে চাইবে ?" পলাশ ক্ষোভে ফেটে পড়ল, "ড্যাডি, তুমি যদি আমাকে এভাবে সকলের সামনে ইনসাল্ট করো তাহলে আমার সুইসাইড করা ছাড়া উপায় থাকবে না।"

"সেটা কিছুদিন আগে করলেই ভালো করতে। এখনও খুব বেশী দেরি হয়নি। সামান্য লজ্জা থাকলে করতে পার। তবে জেনে রেখো তাতে তোমার ছাড়া আর কারোরই কোনো ক্ষতি হবে না। আর যদি মনে করে থাকো যে সুইসাইডের ভয় দেখিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করবে, তাহলে বৃথাই তোমার অভিনয়। তুমি সুইসাইড করতে পার !"

পলাশের ছোট বোন রমা পাশের ঘরে বসে ছিল। সে এ'ঘরে এসে বলল, "বাবা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? কি যা তা বলছ ?"

"তুই বুঝবি নে মা। কত কষ্টে এই কথাগুলো আমার বুকের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে। আমার কষ্ট তুই বুঝবি নে।"

"না হয় তাই হল। কিন্তু এটা তো ঠিক যে তোমার প্রেসার আছে। ডাক্তার না তোমাকে উত্তেজিত হতে মানা করেছে ?"

বাপি বোস মেয়ের এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না। ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, "আর মানিক, তুমি কি কারখানাটা নীলামে তোলার ফন্দি করছো ? অ্যাকাউণ্টেণ্ট খরচের ভাউচার চাইল, তুমি বললে, পেমেণ্ট অর্ডার ঠিক আছে কিনা সেটা দেখা ওনার কাজ নয়। সেটা তুমি দেখবে। তুমি কি দেখেছো ? এক মাসের মধ্যেই আমার লক্ষাধিক টাকা উড়িয়ে দিয়েছ। আমি কৈফিয়ৎ চাইছি, বল কেন এরকম করেছ ?" ম্যানেজার কোন উত্তর দিল না। বাপী বোস স্টেনোকে ডাকতে বলল। স্টেনো এলে সে ডিক্টেশান দিতে লাগল, "লেখো, আপয়েন্টমেণ্ট। শ্রীআলোক মণ্ডল প্রেজেণ্টলি অ্যাকাউণ্টেণ্ট ইজ হেয়ারবাই বিয়িং অ্যাপয়েণ্টেড অ্যাজ দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ দি কোম্পানী। অল স্টাফ অফ দি কোম্পানী ইনক্লুডিং ম্যানেজার মানিক সেন উইল বি হিজ সাবোরডিনেট...." ম্যানেজার এবার কথা বলে উঠল, "তাহলে আর কেন হুজুর। আমাকে বিদায় করে দেন।" সে উত্তর দিল, "তোমাকে আমি নিজে নিয়ে এসেছিলাম। বিশ্বাসযোগ্য ভেবেই এনেছিলাম। তোমার যে দিন ইচ্ছে হবে বিদায় নিও। আমি নিজে থেকে তাড়াব না। তবে তুমি যাতে আমার কারখানাটা নীলামে না তুলতে পার তার ব্যবস্থা করলাম। লেখো, হি উইল ড্র এ মান্থলি স্যালারি অফ থ্রি থাইজেন্ড ওয়ান হানড্রেড রুপিজ। ব্যাস এখুনি টাইপ করে নিয়ে এসো।"

স্টেনো চলে গেল। ম্যানেজার এবং পলাশও বেরিয়ে গেল। বাপি বোস পাশের কামরায় চলে গেল। আলোক আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। কোথা থেকে কি হয়ে গেল সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। তার সমস্ত শরীর-মন অবশ হয়ে গেছে। রমা এগিয়ে এসে বলল "খুশি তো ? আপনাকে তো আর অপমানিত হতে হবে না !"

"বিশ্বাস করুন, আমি এরকম চাই নি।"

"কি রকম চেয়েছিলেন ?"

"আমি নিজেই চাকরি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম।"

"কিন্তু বাবা আপনাকে ছাড়তে চান না।"

"আজ বুঝলাম। আগে বুঝলে চাকরি ছাড়ার কথা বলতাম না। চাকরি আমি ছাড়ব না। ঐ ম্যানেজিং ডিরেক্টারও হব। কিন্তু আমার বেতন অত বেশি করতে মানা করবেন। আমার তো অত টাকার দরকার নেই। আর নিজের বেতন বাড়িয়ে নিলে সবাই বলবে বেতন বাড়াবার জন্যই আমি ওরকম করেছিলাম।"

"এসব কথা বাবাকে বললেন না কেন ?"

"বলতাম। কিন্তু উনি তো আমাকে কিছু বলার সুযোগই দিলেন না। আপনি দয়া করে বলবেন।"

"বলব। তবে লাভ হবে বলে মনে হয় না।" রমাও ঘরে চলে গেল।

কথাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। কাজলের কানেও গিয়ে থাকবে। সে একদিন এসে বলল, "মা তোকে যেতে বলেছে।" আলোক গেল। মাসিমা তাকে বরাবরই স্নেহ করে। এবার যেন একটু খাতিরও করল। মালা এসে বলল, "বৌদি বলছিল, পলাশের অপমানের প্রতিশোধ আপনি ভালোভাবেই নিলেন।" আলোকের ভালো লাগল না। তাহলে সবাই কি ওরকমই ভাবছে ?

আলোক অশোকবাবুর কাছে গেল। "দেখলে তো চাকরিটা নিয়ে ভালোই করেছ। এম. এ. পাশ করে তুমি চাকরী খুঁজে বেড়াতে। আর এখানে এম. ডি. হয়ে তুমিই চাকরি দেবে।"

"কিন্তু স্যার, এতে তো আমার কোনো কৃতিত্ব নেই।"

"নেই কেন ? বাপি বোস তোমাকে ছাড়তে চাইলেন না কেন ? তোমাকে দিয়ে কাজ হবে বলেই তো।"

আলোক আশ্বস্ত হল। যাক, তাহলে সকলেই মালার বৌদির মতো ভাবছে না। সে নতুন উদ্যমে কাজ করতে লাগল। কিন্তু একলাফে আলোক এম. ডি. হয়ে যাওয়াতে দুয়েক জন বাদে কারখানার কেউই প্রায় সন্তুষ্ট হয়নি। ম্যানেজার মানিক সেন তো কাজে আসাই বন্ধ করে দিয়েছে। ক্যাশিয়ারও কদিন থেকে কামাই করছে। সব সময় গুজগুজ, ফুসফুস লেগেই আছে। গুজগুজানির সব থেকে বড় কেন্দ্র হয়েছে ম্যানেজারের বাংলো। আলোককে কি করে টিট্ করা যায়, নিত্য দিন তার কলা কৌশল আঁটা হচ্ছে। ম্যানেজার বসে বসে অস্ত্রে শান দিচ্ছে। পলাশ প্রতিদিন কারখানার কাজকর্মের খবরাখবর নিচ্ছে। কল্যাণ একদিন এসে বলল, "অবস্থা ভালো নয়। আপনি একা একা কোথাও যাবেন না। আর থানায় বোধ হয় একটা খবর দিয়ে রাখা ভালো।" আলোক সাবধান হল। কিন্তু থানায় কোনো খবর দিল না।

এরই মধ্যে বাপি বোস তাকে বহরমপুরে ডেকে পাঠাল। আলোক যেতেই সে জিজ্ঞেস করল, "তোমার করখানার খবর কি ? আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো ?"

"না, কাজ ভালোই চলছে। আমি মনে করছি, চানাচুরের সাথে সাথে আমরা ওখানে চিপ্‌সও তৈরি করব। আলু ছাড়া আর সব মাল-মশলা তো প্রায় এক। বাজারও এক।"

"খুব ভালো কথা। কিন্তু তাহলে তো কিছু বাড়তি লোক নিতে হবে।"

"না, আমি কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা বাড়তি কাজ করতে চেয়েছে। তার বদলে চিপ্‌স থেকে আমাদের যে লাভ হবে তার একটা অংশ যদি ওদের মধ্যে ভাগ করে

দিই, আপনার আপত্তি আছে ? এমনিতেও বেতন তো ওদের বাড়াতেই হবে।"

"নিশ্চয় বাড়াতে হবে। আমার কোনো আপত্তি নেই। চিপ্‌স থেকে যা লাভ হবে তার সবটা ওদের দিয়ে দিলেও আমার আপত্তি নেই। তুমি শুধু দেখো, যে জিনিস আমি সারা জীবনের পরিশ্রমে গড়ে তুলেছি, তা যেন নষ্ট হয়ে না যায়।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি থাকতে আপনার কারখানাকে আমি নষ্ট হতে দেব না।"

"আমি জানি। সেই জন্যই তোমায় ছাড়ি নি। তুমি আজ রাতে থাক। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

"আচ্ছা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন।"

"বিশ্রাম ? হ্যাঁ বিশ্রামই করব। বিশ্রামই করতে হবে। শরীর জানান দিচ্ছে আমার সময় আর বেশি দিন নেই।"

রমা ঘরে ঢুকে বলল, "আহ্ বাবা, কেন ওসব বলছ ? তোমার শরীর ঠিকই আছে। মনটা খারাপ। আলোকবাবু তো বলেছেন, তোমার কারখানা শুধু চলছেই না, বাড়ছেও।"

"হ্যাঁ। ঐ আলোকই ভরসা। আমি আজ রাতে ওকে এখানে থেকে যেতে বলেছি।"

"বেশ তো থাকবেন। আমি কিন্তু বিকেলে একবার বিমানদের বাড়ি যাব।"

"আজ না গেলেই কি হত না ?"

রমা উত্তর দেওয়ার আগেই আলোক বলল, "কি দরকার ? উনি ফিরেই আসুন না ? আপনি অনুমতি দিলে আমিও একটু বেরুব। এসেছি যখন খাগড়ায় গিয়ে কয়েকটা জিনিসের অর্ডার দিয়ে যাব।" বাপি বোস আপত্তি করল না।

আলোক বহরমপুর থেকে ফিরে দেখল, ম্যানেজার কাজে যোগ দিয়েছে। তবে শুধু কাজই করছে না, ক্যাশিয়ার সমেত কয়েকজন কর্মচারীকে নিয়ে ঘোঁটও পাকাচ্ছে। পলাশও তার মধ্যে আছে। তবে সে আগের চেয়ে কাজে অনেক বেশি মনোযোগী হয়েছে। মল্লিকার সাথে হাওয়া খেতে যাওয়াও কমেছে। ইয়ার বন্ধুরাও বেশি আসে না। ব্যবসা থেকে সে আর টাকাও চায় না। আলোক দেখল ভাল লক্ষণ। সে চিপস্ তৈরির ব্যাপারে পলাশের সঙ্গেও কথা বলল। সে কোনো মতামত দিল না। আলোক কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে কাজ শুরু করে দিল। যেহেতু ঝালমিষ্টি চানাচুরের বাজারে গুডউইল ছিল, ঐ নামের চিপ্‌সও বেশ কাটতে লাগল। লাভও ভাল পাওয়া গেল। এই লাভটা কিভাবে মালিক এবং কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ করা যায়, আলোক যখন তাই নিয়ে ব্যস্ত তখন একদিন হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বাপি বোসের মৃত্যু সংবাদ এল। রাতে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়েছে।আর ওঠে নি। সকালে রমা ডাকতে গিয়ে দেখে, তার বাবার নিথর দেহটা পড়ে আছে। কারখানার লোকেরা, বিশেষ করে আলোক চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারকে নিয়ে পলাশ চলে গেল। কয়েকজন কর্মচারীকে সঙ্গে করে আলোকও গেল। সংকারের পর আলোক চলে এল। পলাশ এল শ্রাদ্ধ-শান্তির পর।

আলোক কর্মচারীদের মধ্যে চিপসের লভ্যাংশ বিতরণের ব্যাপারে পলাশের সঙ্গে কথা বলতে গেল। পলাশ সোজাসুজি বলল, "লাভ হয়েছে কোম্পানীর, তা কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করতে যাব কেন ? তারা তো বেতন পাচ্ছে। লোকসান হলে কি তারা দিত ?"

"তা দিত না। কিন্তু আপনার বাবার সঙ্গে তো সেরকমই কথা হয়েছিল ?" "তাহলে বাবাকে গিয়ে বলুন।"

"তিনি থাকলে তো...."

"আমার কাছে আসতেন না, তাই তো। কিন্তু এখন আপনার পছন্দ না হলেও আমার কাছেই আসতে হবে। আমার কথা শুনতে হবে।"

"আপনার কথা শুনতেই তো এসেছি।"

"তাহলে শুনুন। ওসব লভ্যাংশ-ফভ্যাংশের কথা ভুলে যান। লভ্যাংশ হবে না। আপনি এখন যেতে পারেন।"

আলোক ফিরে এল। কর্মচারীদের সে কিছু বলল না। কিন্তু কথাটা চাপা থাকল না। কর্মচারীদের অসন্তোষ বাড়তে লাগল। পেছন থেকে ম্যানেজার সুড়সুড়ি দিতে লাগল। আলোককে তারা নানা প্রশ্ন করতে লাগল। একদিন ক্যাশিয়ারের নেতৃত্বে জনা পঁচিশেক কর্মচারী গেটে মিটিং করল। মিটিং-এর পর স্লোগান দিতে লাগল, "ইন কিলাব জিন্দাবাদ, শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ, ধাপ্পাবাজি চলবে না ; শ্রমিকদের পাওনা দিতে হবে, টালবাহানা বন্ধ কর, মালিকের দালাল দূর হটো।" স্লোগান দিতে দিতে এসে তারা আলোককে ঘেরাও করল। অনেক রাত হয়ে গেল তবুও ঘেরাও মুক্ত হল না। রাত দশটার দিকে থানা থেকে ফোন এল, "আপনার কি আমাদের সাহায্যের দরকার আছে ?" আলোক জানিয়ে দিল, "না।" অবশেষে রাত বারোটার সময় কর্মচারীরা ঘেরাও তুলল। অবশ্য শর্ত হল এক মাসের মধ্যে ব্যবস্থা না হলে তারা আবার ঘেরাও করবে।

পরের সপ্তাহে পলাশ তাকে বাড়িতে ডেকে পাঠাল। আলোক গেল। তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই পলাশ বলল, 'বহরমপুরে একটা জমি বায়না করেছি। সোমবারের মধ্যে আমার লাখ খানেক টাকা দরকার। ব্যবস্থা করবেন।' আলোকের মেজাজ ভালো ছিল না। সে কড়া কথায় জবাব দিল, "ব্যবসার যা অবস্থা তাতে এখন টাকা তোলা যাবে না।"

"ব্যবসাটা আমার। কি অবস্থা তা আমি বুঝব। আপনাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি টাকার ব্যবস্থা করুন।"

"ব্যবসাটা যেমন আপনার, তেমনি কর্মচারীদেরও ! তাই একজন কর্মচারী হিসেবে আমাকে ভাবতেই হবে। টাকা হবে না।"

"অবাধ্য হওয়ার জন্য আজ থেকেই আপনাকে আমি বরখাস্ত করলাম। আপনি ম্যানেজার বাবুকে চার্জ বুঝিয়ে দিন।"

"মুখের কথায় বরখাস্ত করার দিন চলে গেছে। আজকাল ক্যাজুয়াল কর্মীকেও ওভাবে বরখাস্ত করা যায় না। আমার পারমানেন্ট পোষ্ট। বরখাস্ত করতে চাইলে নোটিশ পাঠাবেন। তারপর ক্ষমতা থাকলে বরখাস্ত করবেন। এখন আমি চললাম।"

আলোক ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পলাশ ফণা তোলা সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

সোজা রাস্তায় আলোককে জব্দ করতে না পেরে ম্যানেজার যে অন্য প্যাঁচ কষছিল তা আলোক ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। টের পেল বেতনের দিন। ক্যাশিয়ার এসে বলল, "ক্যাশে টাকা নেই। বেতন হবে না।" আলোক যেন আকাশ থেকে পড়ল, "কেন ? পেমেণ্ট তো পাওয়া গেছে। টাকা নেই কেন ?"

"পেমেণ্ট পাওয়া গেছে। সে টাকা ম্যানেজারবাবু নিয়েছিলেন। এখনও ফেরত দেন নি।"

"ম্যানেজারবাবুকে টাকা দিলেন কেন ?"

"ম্যানেজারবাবু চাইলে তো আমি না করতে পারি না।"

ক্যাশিয়ারের কথা যেন সন্দেহজনক মনে হল, আলোকের মনে হল সে ম্যানেজিং ডিরেক্টার হলেও ম্যানেজারের ক্ষমতা আগের মতোই রয়ে গেছে। সে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে টাকা চাইতেই পারে। কিন্তু বিপদ যে এদিক থেকে আসতে পারে তা আলোক ভাবতেই পারে নি। সে ক্যাশিয়ারকে খাতাপত্র আনতে বলল।

দেখা গেল গত সপ্তাহে ম্যানেজার মালিক পলাশের নাম করে এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছে। সই করেই নিয়েছে। আলোক ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে বলল, "আপনি টাকাটা অবিলম্বে ফেরত দিন, না হলে কর্মচারীদের বেতন হবে না।" ম্যানেজার কোনো উত্তর দিল না। চোখের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে আলোকের দিকে চেয়ে দেখে আবার নিজের কাজে মন দিল। আলোক অপমানিত বোধ করল। সে জোর দিয়ে বলল, "টাকাটা ফেরত না দিলে কিন্তু আমি আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।"

"বাধা দিচ্ছে কে ? নাও না ব্যবস্থা ! নিজে তো বরখাস্ত হয়ে বসে আছ ! তুমি নেবে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ! তোমার নিজের কি ব্যবস্থা হয় সেটা দেখ।"

"আপনি কিন্তু মহা ভুল করছেন। এর ফল ভালো হবে না। আমি শেষবারের মতো বলে যাচ্ছি। কাল বারোটার মধ্যে আপনার নেওয়া সব টাকা ফেরত না দিলে, আমি ছেড়ে কথা বলব না।"

"তোমার যা খুশি তাই কোরো। তবে মেলা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না। আর এখন যাও।"

সে আবার নিজের কাজে মন দিল। আলোকের অসহ্য মনে হল। সে স্টেনোকে ডেকে ম্যানেজারের নামে চিঠি করল। "আপনি ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে যে এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছেন, আগামীকাল বারোটার মধ্যে তা ফেরত দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। নির্দেশ অমান্য করলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" ম্যানেজার চিঠিটি নিল। কিন্তু পিওন-বুকে সই করল না। পিওনকে দিয়ে আলোক সেটা নোট করিয়ে নিল।

পরের দিন বারোটার মধ্যে টাকা না দেওয়ায় তার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হল, কেন তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। সে তারও কোনো উত্তর দিল না। তখন আলোক তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করল। তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও দায়ের করা হল। পুলিশ এল। খাতাপত্র দেখল। ম্যানেজার টাকা পয়সা নিয়েছে প্রমাণ হল। কিন্তু পলাশ বলল, ম্যানেজার টাকা তারই নির্দেশে নিয়েছে। আর আলোক এ কোম্পানীর আর কেউ নয়। তাকে পলাশ বরখাস্ত করেছে। বরখাস্তের প্রমাণ সে দেখাতে পারল না। সে অভাব খাদ্যপানীয় পূরণ করে দিল। দারোগাবাবু ম্যানেজারের বাড়িতেও গেল। সেখানে কি কথাবার্তা হল আলোক জানে না। দারোগাবাবু ফিরে গিয়ে কোর্টে রিপোর্ট দিল, কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

তাগাদা দিয়ে টাকা আদায় করে কর্মচারীদের বেতন হল। ম্যানেজার চশমার ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। আলোক পরামর্শের জন্য গেল অশোকবাবুর কাছে। অশোকবাবুর পরামর্শ মতো আলোক বনমালী উকিলের মাধ্যমে কোর্টে একটা অভিযোগ জমা দিল। কোর্ট অভিযোগটা তদন্তের জন্য পাঠাল এস. পি-র কাছে। আলোক এস. পি-র সঙ্গে দেখা করল। একজন ডি. এস. পি. দারোগাবাবুকে নিয়ে তদন্তে এলেন। আলোক তার কাছে যাবতীয় কাগজপত্র পেশ করল। পলাশ ডি. এস. পি.-কেও বলল, সে আলোককে বরখাস্ত করেছে। প্রমাণপত্র না পাওয়ায় তিনি সেকথা বিশ্বাস করলেন না। ম্যানেজারবাবু তাঁকে তার বাড়িতে আহ্বান করল। কিন্তু ডি. এস. পি. সাহেব তাতেও সাড়া দিলেন না। তদন্তে এবার ম্যানেজারের বিরুদ্ধে টাকা তছরূপের অভিযোগ প্রমাণিত হল। আরও দেখা গেল ঐ টাকা

ব্যাঙ্কে ম্যানেজারের মেয়ে মল্লিকার নামে জমা পড়েছে।

কোর্টে কেসের বিচার শুরু হল। পলাশ নিজে সাক্ষী হয়ে বলল, "বাবার মৃত্যুর পর আমি কোম্পানীর মালিক। আমিই ম্যানেজারকে ক্যাশ থেকে টাকা তুলে ব্যাঙ্কে রাখতে বলেছি।" আলোকের উকিল জেরা শুরু করল, "তাহলে কর্মচারীরা যখন বেতন পেল না আপনি কোনো ব্যবস্থা করলেন না কেন ?"

"ব্যবস্থা হয়েছে। কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়েছে।"

"টাকা আপনি তুলতে বললেন. অথচ সেটা ব্যাঙ্কে ম্যানেজারের মেয়ের নামে রাখা হল কেন ?"

"একই কথা। আমার নামে থাকাও যা আমার স্ত্রীর নামে থাকাও তাই।"

"ম্যানেজারের মেয়ে আপনার স্ত্রী ?"

"হ্যাঁ, মল্লিকা আমার স্ত্রী। এই হচ্ছে ম্যারেজ সার্টিফিকেট।"

"আপনি যে কোম্পানীর মালিক তার কোনো প্রমাণ আছে ?"

"নিশ্চয় আছে, এই আমার সাকসেশান সার্টিফিকেট।"

সার্টিফিকেট দুটো দেখে হাকিমের মুখের রেখা পাল্টে গেল। আলোক আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে তার উকিলের কাছে ছুটে গিয়ে কানে কানে কি কথা বলল। উকিল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মাই লর্ড, পলাশবাবু ম্যানেজারের মেয়েকে বিয়ে করেছেন কিনা বা তিনি ম্যানেজারকে টাকা তুলতে বলেছেন কিনা তা সম্পূর্ণ ইরেলিভ্যাণ্ট্ কারণ তিনি এই কোম্পানীর মালিকই নন।" হাকিমের সাথে কোর্টের সমস্ত লোক বনমালী উকিলের দিকে তাকাল। হাকিম জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে মালিক কে ?"

"মালিক আমার ক্লায়েণ্ট আলোক মন্ডল।"

"তার প্রমাণ কি ?"

'মাই লর্ড, আমাকে একটা দিন সময় দিন। আমি প্রমাণ পেশ করব।" হাকিম সময় মঞ্জুর করলেন। সবাই বলল, বনমালী উকিলের এটা একটা স্টাণ্ট। মামলা হেরে যাবে জেনে নতুন কৌশল বের করার জন্য সময় নিল।

পরের দিন মামলা শুরু হল। বনমালী উকিল একটা দলিল পেশ করল। দেখা গেল, ফুলতলীর কারখানা সমেত ঝালমিষ্টি চানাচুর কোম্পানী মৃত্যুর আগে বাপী বোস আলোকের নামে রেজেস্ট্রি করে দিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কোর্টের চেহারা পাল্টে গেল। টাকা তছরূপের জন্য মানিক সেনের এক বছব সশ্রম কারাদণ্ড হল। ব্যাঙ্কে মল্লিকার নামে জমা দেওয়া টাকা কোম্পানীকে ফিরিয়ে দেওয়ারও আদেশ হল। মানিক সেনকে কোর্ট থেকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পলাশ আর ফুলতলী ফিরল না। বহরমপুরে চলে গেল। মল্লিকা একাই বাংলোয় ফিরে এল।

কর্মচারীরা এসে আলোককে ঘিরে ধরল। কল্যাণ বলল, "এবার তো আর বাধা নেই। আমাদের লভ্যাংশ দিতে বলুন।" আলোক দিতে বলল। চিপ্‌সের থেকে যা লাভ হয়েছিল তার অর্ধেকটা তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। কারখানায় যেন উৎসব পড়ে গেল।

বিকেল বেলায় মালা এসে অভিযোগ জানাল, "আমাদের ওদিকে আর যান না কেন ? না হয় কারখানার মালিকই হয়েছেন। তাই বলে কি বন্ধুর সঙ্গেও দেখা করতে যেতে নেই ?"

"যাব।"

"কবে যাবেন ?"

"কাল তো হবে না, পরশু রবিবার আছে। পরশু বিকেলে যাব।"

বিকেলে যেতেই মালার বৌদির সঙ্গে দেখা। বৌদি আলোককে দেখেই মিচকি হেসে উঠল, "মহাশয়ের যে আর টিকিই দেখা যায় না। এদিকে একজন হা-পিত্যেশ করে থাকে ? তার খবর রাখা হয় ? আলোক আশ্চর্য্য হয়ে বলে, "আমার জন্য হা পিত্যেশ করে থাকে ! কে ?" বৌদি মুখ টিপে হাসে, "কে জানেন না ? তবে আমার সঙ্গে আসুন।" সে আলোকের হাত ধরে টানতে টানতে মালার ঘরে হাজির হয়। মালা তখন ড্রেসিং টেবিলে কেশ বিন্যাসে ব্যস্ত ছিল। আয়নাতে দুজনের ছবি দেখে ঘুরে দাঁড়ায়। বৌদি বলে, "নে ভাই। একদম তর সইছে না। এসেই তোর খোঁজ করছে। কি করব ? তোর কাছে নিয়ে এলুম। এখন নিজের জিনিস সামলা। আমি মার কাছে যাচ্ছি।" সে টুক করে বেরিয়ে গেল। আলোক বিব্রত বোধ করল, "আশ্চর্য ! আমি তো মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম।" মালা আদুরে গলায় ভেংচালো, "মাসিমার কাছে যাচ্ছিলাম। মাসিমার সুপুত্তুর। যাও মাসিমার কাছে গিয়ে দুধ খাওগে যাও।"

শনিবার সকালে কাজল এসে বলল, 'আজ রাতে মা তোকে খেতে বলেছে।' আলোক আঁৎকে উঠল, 'কাজল, আজ আমাকে ছেড়ে দে। সোমবার থেকে ইনকাম ট্যাক্সের চেকিং হবে। এখনও কাগজ-পত্র রেডি হয়নি।'

'সে না হয় আমি বুঝলাম। মাকে বোঝাবে কে ?'

'তুই মাসিমাকে বুঝিয়ে বলিস।'

'মাকে বোঝানো আমার কাজ নয়। আমার বলার দায়িত্ব ছিল বলে দিয়েছি। এবার যাওয়া না যাওয়া তোর ব্যাপার।'

কাজল চলে গেল। অগত্যা আলোককে যেতেই হল। খাওয়া-দাওয়ার পর মাসিমা বলল, "বাবা তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে... আমি মালার কথা বলছিলাম।" আলোক এটাই আশঙ্কা করেছিল। তাই সে প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে বলল, মাসিমা, আপত্তি আমার একটাই। আপনারা জানেন, আমি একজন সাধারণ রিক্সাওয়ালার ছেলে। এখন একটা চাকরি করছি বটে। কিন্তু জানি না সেটা কতদিন করতে পারব।'

'সবাই যে বলছিল, বাপি বোস মারা যাওয়ার আগে তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তোমাকে লিখে দিয়ে গেছে।' আলোক বলল. "ঠিকই শুনেছেন। তার ছেলে মদ খেয়ে এবং আরও অনেক খারাপ কাজ করে টাকা পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছিল। সেইজন্য তার সাধের কারখানাটা রক্ষা করার জন্য আমার নামে লিখে দিয়ে গেছে। তবে আমি তার কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ যে পলাশ শুধরে গেলে সব কিছু তাকে ফেরত দিয়ে দেব।"

'সে তো খুব ভালো কথা বাবা। নিশ্চয় ফেরত দেবে।'

মালা কি সেটা জেনেও আমাকে বিয়ে করতে চাইবে।

'নিশ্চয় চাইবে বাবা। টাকা-পয়সা ধন-দৌলতে কি আছে ? মানুষই তো আসল।'

'তবুও আমি একবার মালার সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয় বলবে বাবা। তোমার তো মালার সঙ্গে পরিচয়ও আছে। বৌমা, মালাকে ডাকো তো।'

বৌমা বলল তাকে আর ডাকতে হবে না। পর্দার আড়ালেই আছে। রীতা তাকে হাত ধরে টানতে টানতে সামনে নিয়ে এল। আলোক তার দিকে চেয়ে বলল, 'তাহলে তুমি তো সব কথাই শুনেছ। এরপরেও কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও ? কি কোনো কথা বলছ না যে ? চাও ?' রীতা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'আপনার মাথায় গোবর পোরা আছে। ওর মুখ দেখে বুঝতে পারছেন না, ও কি করতে চায়। বার বার উকিলের মতো জেরা

করছেন, আমাকে বিয়ে করতে চাও ! এটা কোর্ট নাকি ? না ও বাবা মার সামনে লজ্জার মাথা খেয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলতে থাকবে আমি বিয়ে করতে চাই, আমি বিয়ে করতে চাই ।' রীতার কথা বলার ধরন দেখে মাসিমা, কাজল এমনকি কাজলের বাবাও হেসে উঠল। আলোক এবং মালাও না হেসে পারল না। হাসির মধ্যে দিয়েই সম্মতি হয়ে গেল। আলোকের ইচ্ছে অনুসারে অনুষ্ঠান না করে রেজিস্ট্রি বিয়ে হল।

একদিন আলোক অফিসে বসেছিল। বেয়ারা এসে বলল, 'মল্লিকা দিদিমনি দেখা করতে চাইছে।' আলোক অনেক দিন ধরে এমনি একটি ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে মনে মনে তৈরি হয়ে নিল। মল্লিকাকে সে কি বলবে ? সে বলবে, 'আমি রিক্সওয়ালার ছেলে। সেকথা আজও ভুলি নি। আজ সেই রিক্সাওয়ালার ছেলের কাছে কি জন্যে এসেছেন ?' মল্লিকা নিশ্চয় সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। বলবে, 'আজ আপনারই দিন। যা ইচ্ছে বলে নিন।' আলোক সঙ্গে সঙ্গে বলবে, 'আমি কিছুই বলছি না। আপনি বলেছিলেন। আমি শুধু মনে রেখেছি।' সাহেব কিছু বলছে না দেখে বেয়ারা আবার জিজ্ঞেস করল, "সাহাব, কি বলব ?" সাহেব বলল, 'পাঠিয়ে দিন।'

বেয়ারা বেরিয়ে গেল। আলোক নড়ে চড়ে বসল। দেখল, মল্লিকার সঙ্গে তাব বাবাও ঘরে ঢুকছে। সব প্ল্যান ভেস্তে গেল। আলোক দেখেছে, ম্যানেজারের প্রতি তার বাবার কেমন একটা অন্ধ সহানুভূতি আছে। যেদিন ম্যানেজারের জেল হল সেদিন বাড়ি ফিরতেই বাবা বলেছিল, পুরনো দিনের লোক। একটা অন্যায় না হয় করেই ছেলো। তাই বুলে একেবারে জেলে পাঠানো কি ঠিক হলো ?' আলোক কোনো উত্তর দেয় নি। তবুও বাবা অনেক কথা বলেছিল। কবে তার বাড়ি যাবার পয়সা ছিল না। ম্যানেজার নিজের পকেট থেকে তাকে পয়সা দিয়েছিল। সে কথাও বলেছিল। আজও নিশ্চয় কোনো সুপারিশ নিয়ে এসেছে। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, 'কি ব্যাপার ? আপনি এখানে ? বসুন বসুন।' মল্লিকা দুঃখের সুরে বলল, 'তুই আমাকে বসুন বলছিস !' আলোক উত্তব দিল, 'না না, বাবাকে বসুন বলছি। তুই বস।'

মল্লিকা বসল। বাবাও বসল। বসেই বলল, ম্যানেজারের শরীর খুব খারাপ। মল্লিকা মা দেখতে গেছল। ম্যানেজার কান্নাকাটি করেছে। তুই যদি লড়ালড়ি না করিস উরা জজকোর্টে আপিল করবে।'

'ব্যাঙ্কের টাকাটা কোম্পানীর অ্যাকাউণ্টে ট্রান্সফাব করে দিয়ে আপিল করলে আমি আপত্তি করব না।"

'কেনে, টাকাটা ট্যানেশফাব না কল্লে হয় না ?"

'না বাবা, ওটা আমার টাকা নয়। কোম্পানীব টাকা। ওটা আমি ছাড়তে পারব না।'

মল্লিকা বলল, 'ঠিক আছে, আমি টাকাটা আজই ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। তাহলে তো তুই আপত্তি করবি না ?'

'না।'

'মালা কেমন আছে ?'

'খুব ভালো না। বড়লোকের মেয়ে। গরীবের ঘরে এসে ভালো থাকার কথা নয়। হ্যাঁ তোর স্বামীর খবর কি ?'

'আমার স্বামী আবার কে ?'

'কেন পলাশ !'

'ও হ্যাঁ। কোর্টে শুনেছিলি ! তবে বানানো কথা শুনেছিলি। পলাশের সঙ্গে আমার বিয়ে

হয় নি। পলাশ কোনো দিনই আমাকে বিয়ে করতে চায় নি। ও চেয়েছিল আমাকে ব্যবহার করতে। বাবার চোখ ছিল এই কারখানার ওপর। তিনিও চেয়েছিলেন আমাকে টোপ হিসেবে 'ব্যবহার করতে। ফল কি হয়েছে, তোর অজানা নয়। কি হবে আর ওসব কথা বলে ?' মল্লিকা উঠে পড়ল। বাবাও। ব্যথিত হৃদয়ে আলোকও বাড়ি রওনা হল। সে মল্লিকাকে কত কড়া কড়া কথা শোনাবে ভেবেছিল। অথচ এখন তার মল্লিকার জন্যই কষ্ট হচ্ছে।

আলোক বাড়িতে ঢুকেই দেখল, বরেন বসে আছে। মালা সাজ-গোজ করছে। আলোককে দেখে সে বলে উঠল, "তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"কেন ? কি ব্যাপার ?"

"নূন শো-তে একটা দারুণ ইংরেজি বই এসেছে। তুমি তো যাবে না। আমি বরেনের সঙ্গে যাচ্ছি। আমি খেয়ে নিয়েছি। তুমি ঠাকুরকে বোলো খাবার দিয়ে দেবে। হ্যাঁ আমি সিনেমা থেকে একটু মার কাছে যাব। তবে রাতে চলে আসব। ঠাকুরকে খাবার রাখতে বোলো। আর তোমার ড্রাইভারকে বলো, আমায় পৌঁছে দিয়ে আসতে।'

"সেটা হবে না। কাজ আছে। বাইরে বেরুতে হবে।"

"আমি বললেই তো তোমার কাজ থাকে। বরেন চল্।"

মালা বরেনের সাথে সিনেমা দেখতে চলে গেল। আলোকের আর খেতে ইচ্ছে করল না। সেও অফিসে ফিরে এল। কল্যাণ এসে জানাল, রমা মেমসাহেব আপনকে একবার বহরমপুর যেতে বলেছেন।"

"কেন ? এ মাসের টাকা এখনও পাঠানো হয় নি ?"

"টাকা পাঠানো হয়েছে। বলেছেন, তাঁর কিছু জরুরি কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"ঠিক আছে আমি কালই যাব।"

আলোক বাড়ি ফিরে মালার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে মালা আব্দার করল, "বাবাকে দুদিন দেশ থেকে ঘুরে আসতে বল।"

"কেন ?"

"কাল সন্ধ্যায় আমি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছি।"

"তার জন্য বাবাকে দেশে যেতে হবে কেন ?"

"বাবাকে এত বলেও ভালো জামা-কাপড় পরানো যাবে না। একখানা ধুতি আর বড়জোর একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসে থাকবেন। আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই মাঠে কাজ করা আর রিক্সা টানার গল্প জুড়ে দেবেন।"

"যা করেছেন তারই তো গল্প করবেন। উনি ওগুলিই করেছেন। ওগুলো বাদ দিয়ে তিনি কি কোর্টে গিয়ে মোক্তারি বা হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারি করার গল্প করবেন ?"

"তা জানি নে। আমার খুব খারাপ লাগে। যদি বেশি ঘর থাকে তাহলেও বন্ধুদের আলাদা করে বসানো যায়। এতবার বললাম বাড়িটা তো পড়েই আছে চলো ওখানে উঠে যাই। বলে ওটা আমাদের জন্য নয়।"

"সত্যিই মালা ওটা আমাদের জন্য নয়। ওটা মালিকের জন্যে, ওরা এখন কেউ আসে না বলে ফাঁকা পড়ে আছে। তোমার যদি খুব অসুবিধা হয় হোটেলে গিয়ে পার্টি দাও। তাও ও বাড়ির কথা বোলো না।"

"হোটেলের কথা বলছ, পারবে হোটেলের পার্টির খরচ দিতে ? এক একটা পার্টিতে পাঁচ সাত হাজার টাকা খরচ পড়বে। পারবে দিতে ?"

"কি করে পারব ? আমার বেতন মাসে তিন হাজার। একদিনের পার্টির জন্য সাত

হাজার কি করে দিতে পারব ?"

"কিছুই যদি পারবে না, তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন ? ঝাড়া হাত-পা হয়ে থাকলেই তো হত।"

আলোকের ইচ্ছে হল, ও বলে, "আমি বিয়ে করতে চাই নি। আর বিয়ের আগে সব কথাই বলেছিলাম।" কিন্তু বলে কি হবে ? তাতে আরও অশান্তি। সে কিছু না বলে শুয়ে পড়ল। সে একবার ভাবল, মালার মার সঙ্গে গিয়ে এ ব্যাপারে কথা বলবে। মাসিমা নিশ্চয় তার সমস্যাটা বুঝবে। মালাকে বুঝিয়ে বলবে। কিন্তু মালা যেমন তাদের মেয়ে এখন তারও স্ত্রী। সে যখন বোঝাতে পারছে না, তারা বোঝাবে কি করে ? গিয়ে কোন লাভ নেই। সে হতাশ হয়েই শুয়ে থাকল।

অনেক দিন পর আলোককে কাছে পেয়ে রমা বলল, "দাদার কথা বোধহয় আপনি জানেন না।"

"না, আপনি যা জানিয়েছেন, তার বাইরে আমি কিছু জানি না। উনি কেমন আছেন ?"

"ভালো নেই। কোনদিনই সংসারের খোঁজ রাখত না। ও জানত বাড়ি ভাড়া থেকে আমাদের চলছে। ও অবশ্য একটা চাকরির চেষ্টা করেছিল। পেল না। বন্ধু-বান্ধবরা তো আগেই সরে পড়েছিল। পয়সার অভাবে নেশাও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে চুল্লু খেত আর রিক্সাওয়ালাদের সাথে হল্লা করত। অন্য সময় বাড়িতে চুপচাপ শুয়ে থাকত।"

"তারপর ?"

"যেদিন ও জানল যে আমাদের বাড়িতে ফুলতলী কারখানা থেকে টাকা আসে সেদিনই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। মাসখানেক কোনো খোঁজই পাই নি। তারপর একদিন ও পাড়ার গন্‌শার কাছে জানলাম, ও ভাক্‌ড়িতে একটা মুদিখানার দোকানে কাজ নিয়েছে। সারাদিন কাজ করে। নিজে রান্না করে খায়। রাতে ওখানেই শুয়ে থাকে। আমি পরশুদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম। একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। নেশা তো দূরের কথা সিগারেট খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে।"

"নিয়ে এলেন না কেন ?"

"আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দাদা কিছুতেই এল না। বৌদি যদি বাড়িতে থাকত তাহলে হয়তো আসত।"

"বৌদি মানে কি মল্লিকার কথা বলছেন ?"

"হ্যাঁ, আর কার কথা বলব ?"

"মল্লিকা তো বলছিল, পলাশের সঙ্গে ওর বিয়েই হয় নি।"

"তার মানে বিয়েটাও অস্বীকার করতে চাইছে! দাদা ফুলতলী যেতে চাইত না। সেইজন্য কতবার বৌদিকে চিঠি লিখে আসতে বলল। বৌদি কোনো উত্তরই দিল না। মাঝে আমিও চিঠি লিখেছিলাম। সে আমাকেও উত্তর দেয় নি। এখন বুঝতে পারলাম।"

"যাক ওসব কথা। আসল কথা আপনার বাবা যেরকম চাইতেন, পলাশবাবু এখন সেই রকমই হয়ে গেছেন।"

"হ্যাঁ, নিজের কারবার তো দেখতে পারল না। এখন পরের কারবার দেখছে।"

"কারবারই যদি দেখতে চান নিজেদের কারবার দেখুন।"

"ও কারবারে তো দাদা যেতেই চান না। কি ভাবে দেখবেন ?"

"মালিক হয়ে দেখুন। আমার নামে আছে বলে অভিমান। কিন্তু আমি তো

কাস্টোডিয়ানমাত্র। নিজের নামে করে নিয়ে দেখুন।"

"দেবেন আপনি, দাদার নামে করে ?"

"না দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন ? আমি তো দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

"তবুও।"

"কোনো তবুও নয়। আপনি পলাশবাবুর সঙ্গে কথা বলুন। বোঝান যে তাঁর বাবা তাকে বঞ্চিত করার জন্য এটা করেন নি। তার উপকারের জন্যই করেছিলেন। আর আমাকে আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই দলিল করে দেব।"

"আমি কথা বলি। দরকার হলে আপনাকে খবর পাঠাব। মালাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। ও কেমন আছে ?"

"ভালোই। কিন্তু আপনার বিমান বাবুর কথা তো বললেন না। ও গেলেই জিজ্ঞেস করবে।"

"বিমানের কথা আর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।"

"কেন ?"

'ও এক ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছে।"

"কিন্তু বিমান তো ওরকম ছেলে ছিল না।"

"কে যে কিরকম তা ঠিক সময় না হলে বোঝা যায় না।"

"তাও অবশ্য ঠিক। তাহলে ঐ কথা থাকল। আপনি খবর পাঠাবেন।"

বাড়ীতে ফিরে আলোক মালাকে কথাটা বলতেই মালা ক্ষেপে উঠল, "এমন উদ্ভট কথাও কোন কালে শুনি নি বাপু। কারখানা কোম্পানী তোমার নামে আছে। তুমি পলাশকে লিখে দিতে যাবে কেন ? তা আবার কেউ দেয় নাকি ?"

"মালা আমি তাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

"বুঝলাম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু আমাদের কি হবে ?"

"আমাদের যা হবার তাই হবে। আমি যেমন চাকরি করছি তেমনি চাকরি করতে পারি। কিন্তু এত ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের পর আর এখানে থাকার আমার ইচ্ছে নেই।"

"তাহলে কোথায় থাবে ?"

"ভাবছি গ্রামেই চলে যাব। যা সামান্য টাকা আছে তা দিয়ে একখানা ছোট্ট বাড়ি তৈরী করব। আর লেখাপড়া তো জানি। একটা চাকরি যোগাড় করে নেব।"

"গাঁয়ে যেতে এত সাধ হয় তুমি যাও। আমি ঐ অজগাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারব না। আমি মায়ের কাছে চলে যাচ্ছি।"

মালা বাপের বাড়ি চলে গেল।

সপ্তাহ খানেক পরে রমা খবর পাঠাল। মালা চলে যাবার পর আলোকের মনে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। সব কিছু ছেড়ে একা সে পরিহাটিতে থাকতে পারবে তো ? তার থেকে কারখানাটা ফিরিয়ে না দিলেই তো হয়। তাহলে কারখানার সঙ্গে সঙ্গে মালাও থাকে। বন্ধু কাজল এসেও তাকে সেইরকম বুঝিয়েছিল কিন্তু অশোকবাবুর কাছে গিয়েই সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। তিনি বললেন, "প্রতিশ্রুতি না রাখলে হয়তো তুমি সুখে থাকবে। কিন্তু তোমার মানসিক শান্তি থাকবে না।" আলোক ওরকম সুখ চায় না। সে রমার কথা মতো ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রারের অফিসে হাজির হয়ে দলিল করল।

দলিল হাকিমের কাছে জমা দিয়ে আলোক যখন অপেক্ষা করছে তখন রমা এল। একটু পরে পলাশও এল। আলোক এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করল।

হাকিমের কাছে আলোকের ডাক পড়ল, "আপনি কারখানা সমেত আপনার সম্পত্তি পলাশ বোসকে বিক্রি করছেন ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"দাম পেয়েছেন ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"সই করুন।"

আলোক দলিলের ওপর সই করে আর আঙুলের টিপ ছাপ দিয়ে বেরিয়ে এল।

পলাশ প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারেনি। যখন বিশ্বাস করল তখন আলোকের সঙ্গেই ফুলতলী এল। আলোক একটা ম্যাটাডোর ভাড়া করে তার ঘরের জিনিস-পত্রগুলো বোঝাই করল। পলাশ তাকে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করল। কারখানার কর্মচারীরাও বলল। ম্যানেজার মানিক সেনকে নিয়ে মল্লিকা বেরিয়ে এল। মালা এল না। আলোক অশোকবাবুকে প্রণাম করে ম্যাটাডোরে উঠল। ম্যাটাডোর চলতে শুরু করল।

সেই অনেক দিন আগে তার মা মারা গেলে বাবার হাত ধরে সে এখানে এসেছিল। আর আজ যখন এখান থেকে চলে যাচ্ছে তখন বাবাও আর এ পৃথিবীতে নেই। স্ত্রী ছিল। সেও সঙ্গে নেই। সে এখন সম্পূর্ণ একা। ফিরে যাচ্ছে সেই পরিহাটিতেই। জানে না, তারপরে কোথায় !